মহাকাল বলছি

$$T = t \times \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

ব্রজগোপাল মজুমদার

মহাকাল বলছি

(ভারতে বিজ্ঞান চর্চা—প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

ডঃ ব্রজগোপাল মজুমদার

আগরতলা, ত্রিপুরা

MAHAKAL BALCHI

(Science in India-Ancient & Medieval Periods)

by Dr Brajagopal Majumder

প্রথম প্রকাশ	ঃ	১৪০৬
দ্বিতীয় সংস্করণ	ঃ	বইমেলা ২০০১
প্রকাশনায়	ঃ	শ্রীমতী জ্যোতি মজুমদার প্যারী বাবুর বাগান, আগরতলা ত্রিপুরা
লেখকের অন্যান্য বই	ঃ	পদক্ষেপ সাক্ষরোত্তর কর্মসূচীর উপর লিখিত পুস্তকাবলী
প্রচ্ছদ	ঃ	ফণিগোপাল মোদক ও হারাধন দে
মুদ্রণ	ঃ	ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা
বর্ণ অলংকরণ	ঃ	কম্পিউটচ, আগরতলা
মূল্য	ঃ	৭০ (সত্তর) টাকা

মুন ও ছোটনকে

— বাবা

— অভিমত —

ভারতে বিজ্ঞান চর্চা বিষয়ে
গবেষণা ও মূল্যায়নের আমাদের দেশে
খুবই সীমিত। এই দুরূহ বিষয়ের
উপর ডঃ ব্রজগোপাল মজুমদারের
গ্রন্থ 'মধ্যকালে ভারত' একটি নতুনতর
সংযোজন। আমি আশা করি পাঠক,
গবেষক ও বিজ্ঞানঅনুরাগীদের কাছে
গ্রন্থটি সমাদৃত হবে।

অনিল সরকার

২৪.৬.৯৭

রাজ্যের খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও ত্রিপুরার
মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয়ের অভিমত

দুটি কথা

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার একটি অন্যতম প্রয়াস। বিজ্ঞানের দুরূহ বা দুর্ভেদ্য তত্ত্ব ও তথ্য কখনও পাঠ্যপুস্তক বা কখনও সাধারণ পুস্তক বা পত্র পত্রিকায় সহজ সরল করে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। তাতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, তেমনি সাধারণ পাঠকবৃন্দও জ্ঞান আহরণের সুযোগ পাচ্ছেন।

এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত বিজ্ঞানের প্রায় সকল শাখা বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী বা বিজ্ঞান বিষয়ক সাংবাদিকদের লেখনীতেও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। চলছে আরও সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টাও।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে বিজ্ঞানের ইতিহাস একটি মূল্যবান শাখা। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে ইহার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কারণ বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতা। আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অগণিত পুস্তক রচনা হলেও বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে সে পরিমাণ লেখার ঘাটতি আছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় ভারতের অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে লেখার অপ্রতুলতা অস্বীকার করা যায় না। ইংরাজীতে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রণীত "Hindu Chemistry" বা ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "Histroy of Science and Technology in Ancient India" পুস্তকগুলো গবেষক বা অনুরূপ বুদ্ধিজীবীদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার রূপে বিবেচিত হলেও বিদেশী ভাষার জন্য সাধারণ পাঠকদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে আছে। বাংলা ভাষায় সমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "বিজ্ঞানের ইতিহাস" গ্রন্থটির কিছু অধ্যায় প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার একটি সমৃদ্ধ দলিল। তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার ফলে গ্রন্থটির আয়তন বৃহৎ হয়ে পড়েছে।

এহেন অবস্থায় "মহাকাল বলছি" পুস্তকটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হল। বিষয়গুলো অবশ্য আমাদের অনেকেরই জানা। এখানে শুধু সহজ সরলভাবে বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সারণীতে ভৌত ও জৈব বিবর্তন এবং বিবর্তনকে ভিত্তি করে সভ্যতা বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা নিয়ে আলোচনাগুলো অবশ্যই স্বকীয়তার দাবী রাখে।

পুস্তিকাটি রচনায় যে সকল বইয়ের প্রত্যক্ষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে সেগুলো হল ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় রচিত "Histroy of Science and Technology in Ancient India"। সমরেন্দ্র নাথ সেন প্রণীত 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' এবং রামশরণ শর্মা প্রণীত 'প্রাচীন ভারত' (ভাষান্তর—সুমন চট্টোপাধ্যায়) প্রভৃতি। তাই পুস্তকটির কোন কোন অধ্যায়ে শ্রদ্ধেয় লেখকদের উক্তি সরাসরি এসে পড়েছে। তার জন্য তাঁদের প্রতি রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রাজ্যের খ্যাতনামা কবি, সাহিত্যিক ও ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী অনিল সরকার মহোদয় উনার ব্যস্ততার মধ্যেও পুস্তকটির মুখবন্ধ লিখে আমাকে এ বিষয়ে যেভাবে আগ্রহী করে তুলেছেন তার জন্য উনার প্রতি রইল আমার দায়বদ্ধতা ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা।

পুস্তকটি রচনায় আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন বন্ধুবর শ্রী ননীগোপাল বিশ্বাস, সিনিয়র গ্রন্থাগারিক, রামঠাকুর কলেজ। তার সাথে আমার অগ্রজ শ্রীমাখনলাল মজুমদারের নামও উল্লেখ্য। আর যার অকৃত্রিম সাহায্য ছাড়া বইটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশ হওয়াই সম্ভব ছিল না উনি হলেন বন্ধুবর শ্রী চিত্তরঞ্জন আচার্য্য, সহকারী শিক্ষক, জম্পুইজলা উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। যাঁরা পরোক্ষভাবেও একাজে আমায় সহায়তা করেছেন তাদের জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

--- লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু কথা

ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক, বিজ্ঞান-অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ ও রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগের অকৃত্রিম সহযোগিতায় 'মহাকাল বলছি'র প্রথম প্রকাশনা আশাতীতভাবে সমাদৃত হয়েছে। উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের অনুপ্রেরণায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে ভারতে মধ্যযুগে বিজ্ঞানচর্চা ও তার প্রভাব নিয়ে দ্বিতীয় ভাগ সংযোজিত হয়েছে।

আশা করি প্রথম প্রকাশনার ন্যায় এই নতুন সংস্করণটিও পাঠক-সাধারণের কাছে সমভাবে সমাদৃত হবে। পুস্তকটি সংযোজনে ও পরিবর্ধনের আহ্বান রাখছি।

— লেখক

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

আমি কে

আমি মহাকাল। আমি আদি। তবে একমুখী নদী-স্রোতের মত। নদীর উৎস আছে। শেষ আছে। আমার উৎস থাকলেও আমি বিরামহীন। নদীর স্রোতের ন্যায় আমিও চলার পথে থেমে থাকি না। তবে বর্তমানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকি। তাই আমি অতীতের সাক্ষী, আর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা। বিশ্ব সৃষ্টির মুহূর্তেই আমার জন্ম। তবে নদীর মত ছোট সমুদ্রে কেন, বিশ্ব সমুদ্রেও আমার মিশে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই!

আমি মহা বিস্ফোরণের বিশেষ মুহূর্তে জন্মে বিশ্বের সমস্ত ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছি। বিশ্ব সৃষ্টি থেকে পৃথিবী সৃষ্টি এবং এ পৃথিবীর ভৌত ও জৈব বিবর্তনের একমাত্র সাক্ষী আমি। গণিতজ্ঞ দার্শনিক লাইবনিৎজ বলেছিলেন "ঘটনার পারস্পরিক বিন্যাসই সময়" অর্থাৎ ঘটনা ঘটছে বলেই সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। আবার ইমানুয়েল কান্ট নামক আর একজন দার্শনিকের বক্তব্য ছিল "মানুষের মন বহির্জগৎকে যেভাবে দেখে তারই একটি বৈশিষ্ট্য হল সময় এবং বাইরের বাস্তবতার কোন বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম বা গুণ এটা নয়"। এমনিভাবে অনেকেই আমাকে নিয়ে নানা মতামত প্রকাশ করলেও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ তার আহরিত জ্ঞানে আমায় মেনে নিল বিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তী পুরুষ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব স্বীকৃতির মাধ্যমে। আইনষ্টাইনই প্রথম জানান দিলেন আমি অনন্ত বা অনন্যগত নই! আমিও আপেক্ষিক। তাই বিশ্বের যেকোন আধারে আমার গতি এক নয়। উনিই প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করলেন আমিও ঘটনা নির্ভর। অর্থাৎ ঘটনা আছে বলেই আমি আছি। ঘটনা না থাকলে আমি অস্তিত্বহীন।

আইনষ্টাইন প্রথম উনার আপেক্ষিকাবাদ তত্ত্বে বস্তুর চেয়ে ঘটনার প্রাধান্য বেশী দিয়েছিলেন। উনি বলেছিলেন ঘটনা প্রকাশিত হয় অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা আর সময় সম্বলিত চারটি বিন্দুর দ্বারা। অর্থাৎ জাগতিক বিন্দু সমূহ চারমাত্রিক। আইনষ্টাইনের আগে নিউটন প্রকৃতি বিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হলেও ঘটনা প্রকাশের জন্য অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ আর উচ্চতা সম্বলিত তিনটি স্থানাংকের কথাই বলেছিলেন। তাই আইনষ্টাইন আমাকে প্রথম ঘটনা প্রকাশের অন্যতম আবশ্যকীয় স্থানাংক হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন। তিনিই প্রথম ব[illegible] দিলেন কোন বস্তুরই আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ থাকতে পারে না।

একটা সহজ গণনায় $T = t \times \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$

(এখানে T হল চলন্ত মাধ্যমে সময়ের মান, t হল পার্থিব ঘড়িতে সে সময়ের মান, v হল মাধ্যমের গতিবেগ, c হল আলোর গতিবেগ) তিনি দেখিয়েছেন $v = c$ হলে $T = O$ হয় অর্থাৎ কোন মাধ্যমের গতি আলোর গতির সমান হলে $t = T/O$ অনন্ত হয়। তার অর্থ কোন মাধ্যমে শূন্য সময় পৃথিবীতে অনন্ত সময়ের সমান হবে।

আর এ ভাবেই আপেক্ষিক তাবাদ সময়ের পরিচিত ধারণার পরিবর্তন ঘটাল। তাই কোন ঘটনা কখন ঘটছে বা দুটো ঘটনা ঘটার মুহূর্তেগুলো নির্ভর করে মূলতঃ পর্যবেক্ষকের বিভিন্ন বেগে

চলমান মাধ্যমের অবস্থানের উপর। আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে আমার পরিমাপ যাদের আপনারা সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন সপ্তাহ, মাস, বছর ইত্যাদির মাধ্যমে চিহ্নিত করেন। সেগুলো হল মহাকাশে সূর্য-চন্দ্র-তারকার আপেক্ষিককে পৃথিবীর অবস্থান। বন্ধু আইনষ্টাইনের মতে "সময় ও মহাকাশকে আলাদাভাবে কল্পনা করা যায় না। বলতে হবে "মহাকাশ-সময়-সন্ততি"। অর্থাৎ আমিও মহাকাশ উভয়ে দারুণভাবে সম্পর্কিত। আমাকে বাদ দিয়ে মহাকাশকে যেমন পরিমাপ করা যাবে না তেমনি মহাকাশকে বাদ দিয়ে আমাকেও পরিমাপ করা যাবে না।

অতি সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী তাঁদের গাণিতিক তত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন আলোর চেয়ে বেশী গতি সম্পন্ন কণা থাকা সম্ভব। তাদের নাম দিয়েছেন 'ট্যাকিয়ন'। তবে এখনও বাস্তবে এদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। 'ট্যাকিয়নে'র অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে 'ট্যাকিয়নে'র চতুর্থ মাত্রায় কাজের পর কারণ আসবে। অতীত হবে ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ 'ট্যাকিয়ন' পরিমণ্ডলে আপনাদের 'দূর ভবিষ্যৎ' হবে আমার 'দূর অতীত'। যদি সত্যি 'ট্যাকিয়ন' খুঁজে পাওয়া যায় তখন অঙ্কের কাল্পনিক সংখ্যা বাস্তবে অভাবনীয় এক অদ্ভুত কিছুর উদ্ভব ঘটাবে। আর তখন ট্যাকিয়ন চালিত 'কালযানে' চড়ে অতীতে গিয়ে কাজ করে আসা যাবে। কারণ ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে সময় পিছু হটতে হটতে মিশরীয় বা হরপ্পা সভ্যতার যুগে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ আমার গতি তখন উল্টো দিকে প্রবাহিত হবে। আমি তখন আইনষ্টাইনের পরিমণ্ডলে ছেড়ে ট্যাকিয়ন পরিমণ্ডলে যাব। যদি কোন দিন তা হয় তখন কিন্তু বন্ধু আইনষ্টাইনের জন্য আমি খুব দুঃখ পাব। কেননা, আইনষ্টাইনই যে আমাকে প্রথম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন চতুর্মাত্রিক স্থানাংক রূপে।

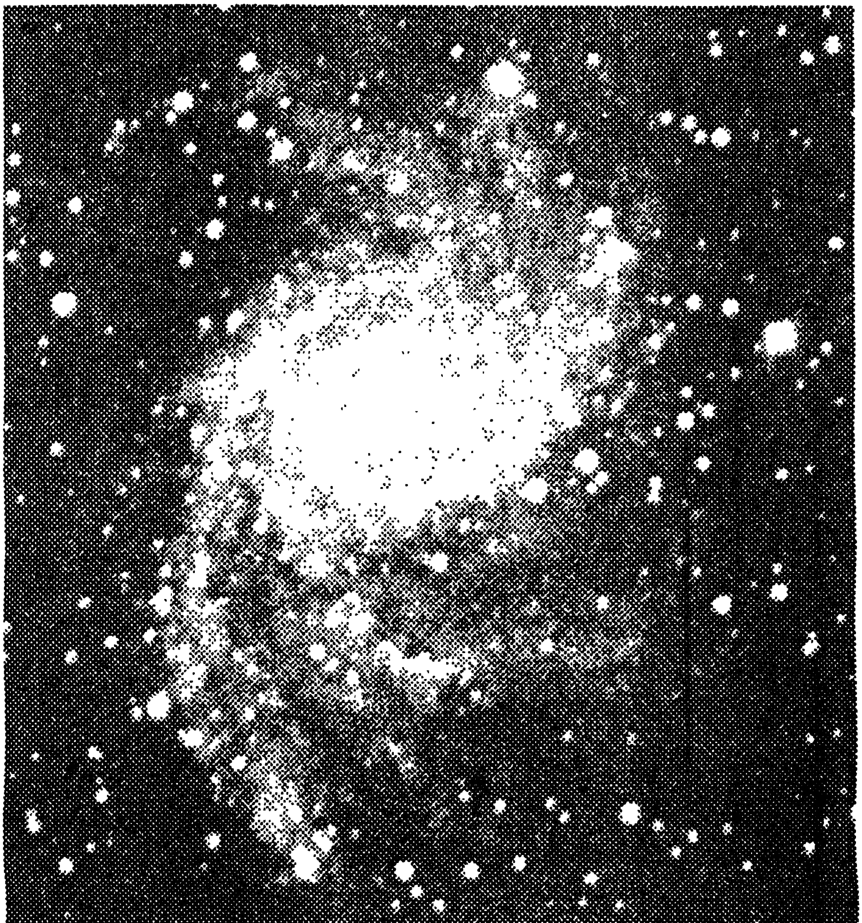
পাঠকরা হয়তো ভাবছেন পৃথিবীর ঘড়িতে আমি এতদিন যেখানে টিক্ টিক্ শব্দ করে আসছিলাম, আজ মহাকাল রূপে নিজেকে ঘোষণা দিয়ে প্রলাপ বকছি না-ত।

না— প্রলাপ বকার কোন কারণ নেই। আইনষ্টাইনীয় পরিমণ্ডলে আজও স্বীকৃত বলেই আবারও বলছি আমি অতীতের সাক্ষী আর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা।

তাই আজ আমি পাঠকদের অতীত ইতিহাস বলব। আমার এ ইতিহাস মূলতঃ কোন রাজা রাণীর ইতিহাস নয়। এ ইতিহাস সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাস। আর অগ্রগতির সহায়ক মানুষের শ্রমের ইতিহাস। তবে পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ইতিহাসের কোন রাজার শ্রম বা শ্রম শক্তিতে সহায়তার ইতিহাস এসে গেলে তা অবশ্যই আলোচিত হবে। তাই অতীতের সাক্ষী হিসাবে আমি বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়েই প্রথম আলোচনা করতে চাইছি ।

সৃষ্টির আদিকথা

বিশ্ব সৃষ্টির বর্তমান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যালোচনা করলে বস্তু ও তার স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। বিগ্‌ব্যাঙ (Big Bang) কস্‌মোলজির প্রবক্তাদের মতে একটা বিরাট বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এ ব্রহ্মাণ্ডের যাত্রা শুরু। এ বিস্ফোরণ শুরু হয় সমস্ত দেশ জুড়ে যুগপৎ একই মুহূর্তে; সমস্ত কণাগুলো পরস্পরের কাছ থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ে তীব্রগতিতে।



এখানে সমস্ত দেশ বলতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকেই বোঝায়। এ বিস্ফোরণ ঘটার প্রথম সেকেণ্ডের এক শতাংশ কাল অতিবাহিত হওয়ার মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ডের তাপমাত্রা ছিল ১০,০০০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে উত্তপ্ত তারাগুলোর অভ্যন্তরে তাপমাত্রার চেয়েও এ তাপমাত্রা অনেক বেশী। এ তাপমাত্রায় অণু পরমাণু এমনকি পরমাণুর কেন্দ্রীনগুলো পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। এভাবে অণু পরমাণুগুলো ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে যে সমস্ত কণাগুলো পরস্পরের কাছ থেকে

দূরে ছড়িয়ে পড়ে তাদের বলা হয় মৌল কণা। বিস্ফোরণের আদি অবস্থার সময় যে সমস্ত মৌল কণার প্রাধান্য ছিল তাদের বলা হয় ইলেকট্রন। এ ইলেকট্রনগুলোর তড়িতাধান ছিল ঋণাত্মক, বর্তমানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণু-পরমাণুদের বহিরাংশের উপাদান। এ সময়ে ধনাত্মক তড়িতাধান বিশিষ্ট ইলেকট্রনের সমসংখ্যাসম্পন্ন আরও এক ধরনের মৌল কণা ছড়িয়ে পড়েছিল— তাদের বলা হয় পজিট্রন। এ পজিট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান। কালের আবর্তে এরা বর্তমানে প্রায় অদৃশ্য মৌলে পর্যবসিত হয়েছে। কেবলমাত্র কয়েক ধরনের তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায়, নভোমণ্ডলের কিছু জোরালো ঘটনায় (উদাহরণ মহাজাগতিক রশ্মি ও সুপারনোভা) বা বিজ্ঞানীদের উচ্চশক্তি গবেষণাগারে এদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অথচ ব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভে ইলেকট্রন ও পজিট্রন একই সংখ্যায় ছিল। ইলেকট্রন ও পজিট্রন ছাড়া সে সময় আরও কিছু মৌলও ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ভরহীন এবং আধানের দিক থেকে ছিল তড়িৎহীন। তাদের বলা হয় নিউট্রিনো। আর বিশ্বজুড়ে ছিল আলো। আলোকে মৌল কণাও বলা হয়, কেননা আলো হল ভরহীন, তড়িৎহীন ফোটন কণার প্রবাহ। প্রতিটি ফোটনের একটা নির্দিষ্ট শক্তিও ভরবেগ আছে। প্রাথমিক অবস্থায় বিশ্বভরা যে আলো ছিল তারা মূলতঃ সংখ্যা ও শক্তির পরিমাণে ইলেকট্রন বা পজিট্রন বা নিউট্রিনোর সমান ছিল। নিজেরাই ক্রমাগত সৃষ্টি ও বিনাশ হত। এরকম সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্য দিয়েই ব্রহ্মাণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা হয়। এর ভারসাম্যতা থেকে অনুমান করা যায় ১০,০০০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মহাজাগতিক সুপের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে ৪ কোটি গুণ বেশী ছিল। তাদের সাথে স্বল্প পরিমাণে ছিল অপেক্ষাকৃত ভারী মৌল নিউট্রন ও প্রোটন বা নিউট্রিনো বা ফোটন পিছু একটি করে নিউট্রন ও প্রোটন। আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমতে লাগল। তাপমাত্রা কমার চিত্রটি ছিল মোটামুটি এ রকম —

আমার	১/১০	সেকেণ্ড	বয়সে	তাপমাত্রা কমে হলো	তিন হাজার	কোটি	ডিগ্রী	সেন্টিগ্রেড
”	১	”	”	”	এক	”	”	”
”	১৪	”	”	”	তিনশ	”	”	”

অবশেষে আমার জন্মের ৩ মিনিট পর তাপমাত্রা নেমে এলো ১০০ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ব্রহ্মাণ্ড যথেষ্ট ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। শুরু হলো নিউট্রন ও প্রোটনের জটিল পারমাণবিক কেন্দ্রীনগুলোর সৃষ্টি। একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন মিলে প্রথমেই তৈরী হলো ভারী হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীন। ব্রহ্মাণ্ডের ঘনত্ব এর মধ্যে কমতে থাকলেও পরিমাণের দিক থেকে এটা যথেষ্ট ছিল না। ফলে হাইড্রোজেনের কেন্দ্রীনগুলো চট্ করে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি করলো হাল্কা কেন্দ্রীনদের মধ্যে সবচেয়ে টেকসই হিলিয়াম কেন্দ্রীন। এ কেন্দ্রীনগুলোর মধ্যে দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে।

৩ মিনিট শেষে ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান ছিল প্রধানত ফোটন, নিউট্রিনো ও অ্যান্টি নিউট্রিনো। তখনও কেন্দ্রীন পদার্থের ভাগ কম ছিল। ৭৩ ভাগ হাইড্রোজেন ও ২৭ ভাগ হিলিয়াম। এদিকে ইলেকট্রন ও পজিট্রনের পারস্পরিক বিনাশের ফলে ফোটন, নিউট্রিনো ও অ্যান্টি নিউট্রিনো কণার আধিক্য বাড়তে থাকলেও উদ্‌বৃত্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা কেন্দ্রীন পদার্থের মতোই স্বল্প হয়ে যেতে লাগল। এসব পদার্থ যতই পরস্পর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তাদের তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ক্রমেই কমতে লাগল। কয়েক লক্ষ বছর পরে তাপমাত্রা এমনই কমে গেল যে তখন ইলেকট্রন ও

কেন্দ্রীনগুলো জুড়ে তৈরী হল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু। উদ্ভূত ঐ গ্যাস মহাকর্ষের প্রভাবে ঝাঁক বাঁধতে শুরু করল। কালক্রমে এগুলো জমেই নক্ষত্র ও নক্ষত্রমণ্ডলী সৃষ্টি হল। এভাবে প্রথম ৩ মিনিটে সৃষ্ট উপাদানগুলোর মধ্য দিয়েই নক্ষত্রগুলোর জীবনযাত্রা শুরু বা অন্যভাবে বলা যায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম কেন্দ্রীনের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি শুরু হল।

ব্রহ্মাণ্ড তথা আমার জন্ম নিয়ে আপনাদের ভাবনা চিন্তার আজও বিরতি নেই। তবে বর্তমান শতকের দুটি যুগান্তকারী আবিষ্কার সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের একটি হল কুড়ির দশকে হাব্‌ল আবিষ্কৃত "সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তত্ত্ব" অন্যটি হল অটো পেনজিয়াস ও রবার্ট উইলসন আবিষ্কৃত "বেতারগুঞ্জন"।

মাউন্ট উইলসনে বৃহৎ দূরবীণ দ্বারা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে হাব্‌ল জানালেন ব্রহ্মাণ্ড ও গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এবং বর্ণালীর লাল সরণ গ্যালাক্সির দূরত্বের সমানুপাতিক । এ সম্পর্কে তার প্রস্তাবিত সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

'কোন গ্যালাক্সির অপসারণ বেগ আমাদের থেকে দূরত্বের সমানুপাতিক"

যদি $V =$ গ্যালাক্সির গতিবেগ হয়

এবং $R =$ পৃথিবী থেকে ওই গ্যালাক্সির দূরত্ব হয়।

তবে $V = H_0R$

এখানে $H_0 =$ হাব্‌ল ধ্রুবক

এ অবস্থায় যদি $R=0$, তবে $V=0$।" এ থেকে এটা স্পষ্ট আদিতে মহাবিশ্বে এমন একটা অবস্থা ছিল যখন সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু সমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল তীব্র হওয়াই ছিল বিজ্ঞানসম্মত। যার পরিণতিতে মহবিস্ফোরণ ঘটাই ছিল স্বাভাবিক।

এছাড়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ব্যাপারে steady state নামে আর একটি বিকল্প তত্ত্ব আছে। এ তত্ত্বের প্রবক্তারা হলেন — হারম্যান বণ্ডি. টমাস গোল্ড, ফ্রিড হুয়েল। তাঁদের মতে ব্রহ্মাণ্ডের আদি বা অন্ত বলে কিছু নেই। কেননা সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন পদার্থ সৃষ্টি হয়ে নক্ষত্রগুলীর মধ্যস্থ শূন্যস্থান পূরণ করে নিচ্ছে। ফলে বিশ্ব জগৎ চিরকাল একই অবস্থাতে আছে।

তবে এ তত্ত্ব থেকে আমার জন্ম ইতিহাস সম্পর্কে পাঠকরা সঠিক তথ্য পাবেন না। এ ব্যাপারে আমি নিজেও কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিলাম না যদিও আইনষ্টানের আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী আমার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী।

যাক সংশয় কেটে গেল ১৯৬৪ সালে। সে বৎসর অটোপেনজিয়াস্ ও রবার্ট উইলসন কর্তৃক বেতার গুঞ্জনের আবিষ্কার আদি বিস্ফোরণেরই নির্ভুল সংকেত। বস্তুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রনগুলোর তাপজনিত গতি থেকেই বেতার গুঞ্জন নিঃসৃত হয়। এমনিভাবে বিগব্যাঙ কস্‌মোলজি সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নেরই দিন দিন মীমাংসা হচ্ছে।

তাছাড়া বিশ্ব সৃষ্টির এ তত্ত্বটির সাথে ধর্মীয় ভাবাবেগও দারুণভাবে কাজ করেছে। কেননা,

ধর্মীয় গুরুরাও বলে থাকেন সৃষ্টি কর্তাই তাঁর খেয়াল বশে একদিন এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। হিন্দু ধর্ম মতে ব্রহ্মাই আদি, ব্রহ্মাই এসব সৃষ্টির মূলে। তার মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম আদিতম। অপরদিকে ইসলাম ধর্মমতে নূর বা আলোই হলো সৃষ্টির আদিতম।

পাঠকগণ নিশ্চয় অবগত আছেন বিদ্যুৎ চমকালে বা কোন বিস্ফোরণ ঘটলে শব্দ ও আলো একসাথে সৃষ্টি হয়। আলোর গতি শব্দের চেয়ে বেশী বলে আলোকে আগে দেখা যায়। তারপর শব্দ শোনা যায়। মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বটির সাথে এ সকল ধর্মীয় অনুশাসনের সাযুজ্য আছে বলে তত্ত্বটিকে সার্বজনীন স্বীকৃতি দিতে ধর্মভীরুরা দ্বিধা বা সংকোচ করেননি।

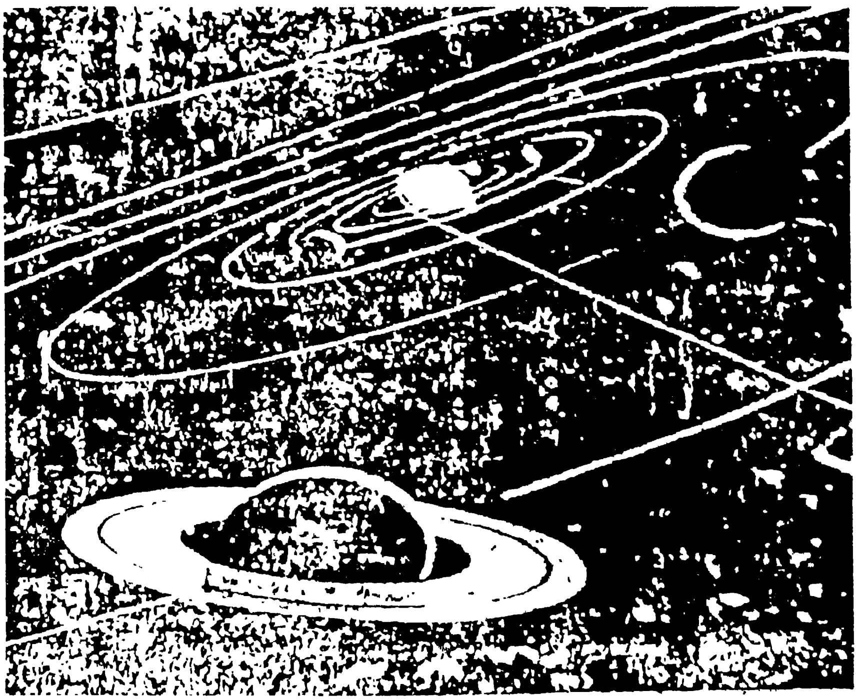
বেতার গুঞ্জনের তীব্রতার মাপ হিসাবে বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ সমতুল্য তাপমাত্রা ব্যবহার করে থাকেন। পেনজিয়াস ও উইলসন যে বেতার গুঞ্জনের আবিষ্কার করেছিলেন তার সমতুল্য তাপমাত্রা ছিল ২.৫ থেকে ৪.৫ ডিগ্রী কেলভিন। তবে এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মহাবিস্ফোরণ অর্থাৎ সম্প্রসারণ তত্ত্বের একটি বড় ত্রুটি বিজ্ঞানীদের দারুনভাবে ভাবিয়ে তুলে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী গ্যালাকসীগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যতই দূরে যাচ্ছে ততই তাদের গতি বাড়ছে। গতি বাড়তে বাড়তে একসময় আলোর গতিকেও ডিঙ্গিয়ে যাবে। যা কিনা আইনষ্টাইনীয় পরিমণ্ডলে অসম্ভব। কারণ কোন বস্তু যদি আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগে পৃথিবীর উল্টোদিকে ছুটতে থাকে, তখন পার্থিব কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারাই তাদের পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। অথচ আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন বস্তুরই আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ থাকতে পারে না। মহাবিস্ফোরণ বা সম্প্রসারণ তত্ত্বের এ অসংগতি থেকে এক নতুন তত্ত্বের জন্ম নিল। ১৯৬৫ সালে অধ্যাপক স্যান্ডাজ ঘোষণা করলেন---"এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রসারণ হচ্ছে, সংকোচন হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, লয় হচ্ছে, আবার নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে।" তাই এ বিশ্ব স্পন্দনশীল। আর তত্ত্বটিরনাম হল "স্পন্দনশীল বিশ্ব তত্ত্ব"। স্যান্ডাজের মতে বিশ্বের বয়স এখন ১০ হাজার কোটি বৎসর। এ সম্প্রসারণ চলবে। তারপর গ্যালাক্সিগুলোর ছুটে চলার শক্তি ফুরিয়ে যাবে। শুরু হবে সংকোচন, লয় পাবে তার আগের সৃষ্টি। আবার একদিন নতুন সৃষ্টি হবে। এমনিভাবে অনাদিকাল ধরে চলতে থাকবে প্রসারন, সংকোচন আর লয় ও সৃষ্টির খেলা। স্যান্ডাজের এ সৃষ্টি-তত্ত্ব বৈদিক তত্ত্ব "কম্পমান বিশ্বের" অনুরূপ। এ দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়ও হল সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এ সকল তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট। এটা কোন আদিভৌতিক ব্যাপার নয়। তবে প্রায় একই নিয়মে আমাদের সৌর জগৎ সৃষ্টি হলেও অন্যান্য নক্ষত্র সৃষ্টি ও বিবর্তন প্রক্রিয়া থেকে আমাদের সৌর জগৎ সৃষ্টি প্রক্রিয়া একটু ব্যতিক্রম। এতে কিছুটা জটিলতাও লক্ষ্য করা যায়। এ নিয়ে আড়াইশো বছর ধরে নানা মতবাদ গড়ে উঠেছে।

তবে পরিবর্তিত ক্যান্টল্যাপ্লাসের তত্ত্বটি অধিক গৃহীত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী পুরো সৌর জগতের সৃষ্টি একটি নীহারিকা থেকে। আদি অবস্থায় এ নীহারিকা ছিল হাইড্রোজেন ও সামান্য হিলিয়াম, স্বল্প পরিমাণে ভারী মৌল সিলিকেট, লোহা, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও জল প্রভৃতি বরফের আকারে জমাট টুকরোয় সমৃদ্ধ। আদি নীহারিকা স্বাভাবিকভাবেই নিজের অক্ষের চারদিকে ঘুরছিল। আবার মহাকর্ষ বলে তার সংকোচনও ঘটেছিল। কৌনিক ভরবেগের নিত্যতার সূত্রানুযায়ী সংকোচনের সাথে তার ঘূর্ণন বেগও বেড়ে চলছিল। ফলে মাঝখানে পদার্থের আধিক্য

এবং বাইরের দিকে পদার্থের পরিমাণ ছিল কম। মাঝখানের ঘন অংশই পরবর্তী পর্যায়ে সূর্যে পরিণত হল। তবে তখনও সূর্যের নিউক্লীয় সংযোজন আরম্ভ হয়নি। আর বাইরের ক্ষীণ পদার্থ পরস্পর জমাট বেঁধে ছোট বড় পিণ্ড তৈরী হল। পরবর্তী পর্যায়ে তারাই বর্তমান গ্রহগুলোর আকার নিয়েছে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে তৈরী হল তাদের আবহমণ্ডল।

"পরে সূর্যের অভ্যন্তরে নিউক্লীয় সংযোজন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ফলে সৌর জগতেরকিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সূর্যের চুম্বক ক্ষেত্রে আবহমণ্ডলের আয়নিতক গ্যাস ও একই বেগে ঘুরতে থাকে।

এভাবে সূর্যের কৌণিক ভরবেগ গ্যাস ও গ্রহগুলোতে সঞ্চারিত হয়। ফলে নীহারিকার বাইরের অংশের হাইড্রোজেন সৌর জগতের বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় সূর্য ও গ্রহের মাঝখানে গ্যাসের আবরণ লোপ পায়। আর তখন থেকেই শুরু হয় গ্রহগুলোর বিবর্তন। বিবর্তনের ফলে কোন কোন গ্রহে



হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের আবহমণ্ডল অবলুপ্ত হয়। তবে পৃথিবীর ভর ও সূর্য থেকে তার দূরত্ব এমনই পরিমিত হল যে কোন ভারী গ্যাস তার আবহমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যেতে পারল না।" এমনিভাবে সৃষ্ট আমাদের সৌর জগৎ আর আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটি। তাই বলা চলে প্রাকৃতিক নিয়মেই সূর্য থেকে ছিটকে আসা একটা উল্কাপিণ্ড বা সূর্য সৃষ্টির সাথেই যুগপৎ সৃষ্ট একটা উল্কাপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের পৃথিবী। তবে যেভাবেই সৃষ্টি হউক না কেন কালের আবর্তনে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব থাকলেও "বিগ ব্যাঙ তত্ত্বটি" আজ প্রায় সর্বজনস্বীকৃত, যদিও

অতিবৃহৎ পরমাণুর অস্তিত্ব নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন রয়ে গেছে। তবে সাম্প্রতিককালে অনন্যতা (Singularity) শীর্ষক জটিল গণিতের মাধ্যমে এ'প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিজ্ঞানী সফল হয়েছেন।

পৃথিবীতে প্রথমে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ম্যাগমা থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়শিলা। পৃথিবীর ভেতরে প্রায় ২৯০০ কিঃমিঃ পর্যন্ত আগ্নেয়শিলার ঠাসাবুনুনি। ভারী পাথর আর বিভিন্ন ধাতু মিলে গঠিত হল কঠিন কাঠামো। আরও নিচে লোহা ও নিকেলে গড়া পৃথিবীব শাঁস (Core)। প্রচণ্ড চাপে ও তাপে পৃথিবীর শাঁসে লোহা ও নিকেল জমাট গলিত অবস্থায় রয়েছে। আর গলিত কেন্দ্রকে ঘিরে রয়েছে আগ্নেযশিলার চক্রগুলো। এ আগ্নেয়শিলাপুঞ্জের ওপরে ৩৩ কিঃমিঃ পুরু আবরণই ভূ-ত্বক নামে পরিচিত।

পৃথিবীর আদিম অবস্থা ছিল নির্জলা এবং বায়ুশূন্য। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন গ্যাস সৃষ্টি হল। সৃষ্টি হল হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাস। হাইড্রোডেন ও অক্সিজেন গ্যাসের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হল জল ও বায়ুর। জলীয় বাষ্প রূপে জলের প্রথম আর্বিভাব। তারপর সে জল ঘনীভূত হয়ে পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগকে ভরে সমুদ্র সৃষ্টি করে। এভাবে প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমেক্রমে আদিতম পৃথিবী বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। তেজস্ক্রিয় মৌলের সাহায্যে পাথরের বয়স, জীবাশ্ম পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি পরীক্ষা নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় আগ্নেয়শিলার স্তরে বর্তমানের অবস্থায় রূপান্তরিত হতে প্রায় ২০০ কোটি বছর লেগেছে।

এ প্রাকৃতিক বিবর্তনের কোন মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আর্বিভাব ঘটে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক কোন তথ্য না পাওয়ায় প্রাণ সৃষ্টির সঠিক কাল নির্ণয় দুরূহ ব্যাপার হয়ে আছে। হারোল্ড উরে নামে জনৈক বিজ্ঞানী নানা তথ্যের সাহায্যে দেখান যে, "পৃথিবীর আদিম বায়ুমণ্ডলের উপাদান ছিল অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন। বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে মিথেন (CH_4), অ্যামোনিয়া (NH_3) ও জল তৈরী হতে পেরেছিল। হিলিয়াম ও অবশিষ্ট হাইড্রোজেন বায়ুমণ্ডল ছেড়ে চলে গেলে জল থেকে গড়ে উঠল সমুদ্র। মিথেন ও অ্যামোনিয়া ভারী গ্যাস বলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আটকে মিথেন ও অ্যামোনিয়া সমৃদ্ধ বায়ুমণ্ডল তৈরী হল। উরে এটাকে বায়ুমণ্ডল I নামে অভিহিত করেন।"

সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জল ভেঙ্গে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আলাদা হল। মিথেন ও অক্সিজেনের ক্রিয়ায় তৈরী হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জল। অ্যামোনিয়াব সাথে বিক্রিয়ায় তৈরী হল নাইট্রোজেন অনু ও জল। এ বিক্রিয়া খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে। তাহলেও এভাবে একদিন গড়ে উঠল কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও নাইট্রোজেনের বায়ুমণ্ডল। উরের ভাষায় এটা বায়ুমণ্ডল II নামে পরিচিত। কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত বলে সমুদ্রের জল তখন সোডা-ওয়াটারে ভর্তি ছিল। তাছাড়া স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার তখনও ওজোন স্তর দ্বারা সম্পূর্ণ গড়ে উঠেনি। ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে প্রচুব অতিবেগুনী রশ্মি এসে পড়াই ছিল স্বাভাবিক। এখন প্রশ্ন এ' অবস্থায় কি পৃথিবীতে জীবের উপাদান জৈব পদার্থ সৃষ্টি হতে পারে? না হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

"উরের মতে বায়ুমণ্ডল I-এ যখন অ্যামোনিয়া ও মিথেনের প্রাচুর্য ছিল তখনই জীবের সৃষ্টি হয়েছে। উরের ছাত্র মিলার জল, অ্যামোনিয়া, মিথেন ও হাইড্রোজেন প্রবাহের মধ্যে সাতদিন ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়েদেখলেন যে ঐ প্রবাহে নাইট্রোজেন ছাড়াও গ্লিসাইল অ্যালানিম এর মত

অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়াও আরও দু-একটি জটিল জৈব অনু তৈরী হয়েছে।" মিলারের এ' পরীক্ষাই হল প্রথম জড় পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ তৈরীর নিদর্শন। মিলারের অনুকরণে অ্যাবেলসন অনুরূপ পরীক্ষায় দেখালেন যে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিনের উপাদান অ্যামিনো অ্যাসিডও সৃষ্টি হয়।

মিলারের পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের উপাদান রিবোজ ও ডিঅক্সিরিবোজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। স্বাভাবিকভাবে এখন আব জীবন সৃষ্টির তথ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাই বলা চলে "আদিম পরিবর্তনশীল সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলে এভাবেই প্রোটিন এমনকি নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়েছে।"

এ সৃষ্টিকালে এমন কোন জীব ছিল না যারা জৈব উপাদান ধ্বংস করতে পারে। আবার বায়ুমণ্ডলে তখনও অক্সিজেন না থাকায় জৈব অনুগুলোর অক্সিডাইজ হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল না। তবে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির দ্বারা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। প্রকৃতি এদের রক্ষায় দাঁড়িয়ে গেল। সমুদ্রের স্রোত তাদের নিরাপদ গভীরতায় নিয়ে গেল। ফলে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি দ্বারা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কমে গেল। এতে এ সব পদার্থই ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে শ্যাওলা ও স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীতে পরিণত হল। আর এ প্রাণ সৃষ্টির প্রথম ধাপে শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ কাবন-ডাই-অক্সাইড থেকে অক্সিজেনের মুক্ত করে অক্সিজেনের বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল।

তবে কেম্ব্রিয়ান যুগের অনেক আগেই সমুদ্রে শ্যাওলা ও স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীরা বাস করত বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই শ্যাওলা আর স্পঞ্জই আদিতম প্রাণ হিসাবে আজ অবধি স্বীকৃত। এ আদিতম প্রাণেব পর্যায়টি প্রোটোরোজোইক যুগ নামে পরিচিত। আরও আগে আর্কিওজোইক যুগেই প্রথম পাণের স্পন্দন ঘটে ছিল বলে অনেক পুরাজীব বিজ্ঞানীদের ধারণা। যদিও সে সম্পর্কে কোন জীবাশ্ম বা কোন তথ্য এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তারপর কেম্ব্রিয়ান যুগে ঝিনুক ও শামুক জাতীয় অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর আর্বিভাব। অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিভিন্ন ধরন অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুরাজীব বিজ্ঞানীরা প্রায় ১৬ কোটি বছব পবে সাইলুরিয়ান যুগের শেষে ডাঙায় উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ এবং সমুদ্রের জলে প্রথম গাছের আর্বিভাব এ দুটি বৈপ্লবিক পরবির্তনের সম্মুখীন হলেন। সাইলুরিয়ান যুগে যাদের আত্মপ্রকাশ ডিভোনিয়ান যুগে তাদের ব্যাপকতা লক্ষ্য করলেন বিজ্ঞানীরা।

ডাঙ্গা ভরে গেল ফুলহীন উদ্ভিদে : সমুদ্রে মাছের বৃদ্ধি ঘটলো। তখনও অবশ্য সমুদ্রে অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের প্রাধান্য রয়ে গেল। ডিভোনিয়ান যুগের শেষে মাছের মধ্যে দেখা দিল বিবর্তন। মাছ প্রথমে রূপান্তরিত হল উভয়চর প্রাণীতে। সৃষ্টি হল ল্যাব্রিনথডেন্ট নামক উভচর প্রাণীর। কার্বোনিফেরাস যুগে উভচর প্রাণীর ডাঙ্গার প্রতি তীব্র আকর্ষণ তাদের দেহে এমন সব রূপান্তর ঘটাল যে তারা ডাঙ্গার ওপরেই বাস করতে সামর্থ অর্জন করল। ঐ রূপান্তরই তাদের ক্রমশঃ সরীসৃপে পরিণত করে। কার্বোনিফেরাসযুগে আবির্ভূত সরীসৃপরা আকারে ছোট হলেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও জৈবিক বিবর্তনের ফলে পারমিয়ান যুগে এসব সরীসৃপ আকারে এবং সংখ্যায় বেড়ে যায় এবং ডাইনোসর নামক অতিকায় সরীসৃপদের পূর্বপুরুষেরা এ যুগেই আবির্ভূত হয় বলে জীবাশ্ম পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পারমিয়ান যুগে আবির্ভূত ডাইনোসররা ট্রায়াসিক যুগে ব্যাপকতা

লাভ করে জুরাসিক যুগে পৃথিবীকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। স্থল ও জল উভয় স্থানেই তারা প্রাধান্য বিস্তার করে চলল।

এদের প্রাধান্য জুরাসিক যুগের পর ক্রিটেশাস যুগের প্রথম দিকেও অক্ষুণ্ণ রইল। তখন অবশ্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের সরীসৃপ থেকে ক্ষুদ্র আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীও সৃষ্টি হয়েছে। অতিকায় প্রাণীর দেহের অনুপাতেই তৎকালীন সময়ে অরণ্যে গাছপালাও ছিল বড় বড়। তাদের মধ্যেও পাইন, ফার্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে ল্যামার্কের উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। "প্রাচীন লম্বা গলা জিরাফের গাছের পাতা আহরণের জন্য গলা লম্বা করার প্রবণতা ছিল। ক্রমাগত লম্বা করার ফলে জিরাফের গলা বিশেষভাবে লম্বা হইয়া যায়। লম্বা গলা (অর্জিত বৈশিষ্ট্য) বংশগতি লাভ করিয়া নতুন প্রজাতিতে সঞ্চারিত হয়।"



ক্রিটেশাস যুগে উদ্ভিদ জগতে একটা লক্ষ্যণীয় বিবর্তন ঘটতে শুরু করল। আধুনিক যুগের গাছপালা যথা বার্চ, মেপল, ওক, আখরোট, বাদাম, ঘাস, লতাগুল্ম প্রভৃতি দেখা যেতে লাগল। গাছে ফুল ফোটা শুরু হল, আর এ যুগের শেষেই ডাইনোসরের জীবনের চরমতম দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কোথাও বা উল্কাপিণ্ড আবার কোথা বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় পৃথিবীর সর্বত্র ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হল।

ডাইনোসর ও অন্যান্য প্রাণীদের বিনাশের সাথে সাথে মধ্যজীবীয় অধিকল্পের অবসান হয়ে নবজীবীয় অধিকল্পের শুরু হলো। এ অধিকল্পের শুরুতে ক্রিটেশাস যুগের প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো শুধু ডাইনোসোরের ন্যায় বৃহৎ আকারের সরীসৃপের অবলুপ্তির কারণ হয়ে রইল না, প্রাকৃতিক জগতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটল। সমুদ্রে সুনীল জলধি থেকে জেগে উঠলো হিমালয় ও আল্পস পবর্তমালা সহ বিভিন্ন পাহাড়-পর্বত। সমুদ্রের আয়তন কমতে থাকলেও পৃথিবীর স্থলভাগ পুরোপুরি শুক্নো ডাঙ্গায় পরিণত হয়নি। রয়ে গেল অসংখ্য নদী-নালা, হ্রদ ও জলাভূমি। তারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে সুজলা, সুফলা করতে লাগল। আর এ অবস্থায় চূড়ান্ত বিকাশ ঘটল এবং মানুষের পূর্বপুরুষের আবির্ভাব ঘটল।

পর পর প্যালিওসিন, ইউসিন, অলিগোসিন, মাইওসিন, প্লায়োসিন যুগ পেরিয়ে শুরু হল প্লাইষ্টোসিন যুগ। এ যুগে বিবর্তনের ইতিহাসে ঘটল আর একটি 'ক্রান্তিকারী' ঘটনা। ঘটনাটি হল তুষার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ। এ সময় উত্তরমেরুর তুষারক্ষেত্র উত্তর আমেরিকা, য়ুরোপ ও এশিয়ার অধিকাংশকে আচ্ছন্ন করা শুধু নয় এসব অঞ্চলের ভূ-বিন্যাসে বিপুল পরিবর্তন সঞ্চারিত হল। তুষারক্ষেত্রের সম্প্রসারণের ফলে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠল বিস্তৃত উর্বর সমতলভূমি, বহু হ্রদ ও নদীর খাত। আর তুষার যুগের সাক্ষী হল আদিম গুহামানব। সংখ্যায় তারা নগণ্য হলেও বা কোথাও কোন জনপদ গড়ে না উঠলেও তুষার যুগে সৃষ্ট উর্বর সমতল ভূমিগুলো হল বর্তমান যুগের জনবসতি অঞ্চল। প্রাকৃতিক বিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণীজগতেও বিরাট বিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। ক্রিটেনশাস যুগের শেষে ডাইনোসব জাতীয় অতিকায় সরীসৃপদের বিলোপেব মাধ্যমে ছোট ছোট ক্যাঙ্গারু ও অন্যান্য কীটভূক প্রাণীদের ক্রমবিকাশের পথ খুলে গেল। বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় পুরাজীবীয় যুগেব আদিতে প্রায় জীবহীনতার মধ্যে কিছু কিছু সরীসৃপ যথা — সাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ ও কুমীর যারা ডাইনোসরদের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হারিয়ে যায়নি তারা সহ অন্যান্য কীটভূক স্তন্যপায়ী প্রাণীরা প্রবল শক্তি নিয়ে ব্যাপকতা লাভ করতে লাগল। তাকে দমন করার ক্ষমতা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরই ছিল না। তাই পুবাজীবীয় অধিকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাণীজগতে বিভিন্ন বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তনেব নানা ধাপ পেরিয়ে প্লায়োষ্টোসিন যুগে এসে আধুনিক প্রাণীজগতের সূচনা ঘটল।

বস্তুতঃ প্লায়োষ্টোসিন যুগে তুষার ক্ষেত্রের বিস্তৃতির মাধ্যমে যে উর্বর সমতলভূমির হয়েছিল সে প্রাকৃতিক বিবর্তন আধুনিক প্রাণীজগতের সৃষ্টির সহায়ক উপকরণ হিসাবে কাজ করে। প্যালিওলিন যুগে আবির্ভূত ইঁদুর জাতীয় জীব, ছাগল জাতীয় এ্যামব্লিস্ড, কুকুর জাতীয় ক্রিয়োডন্ট প্রভৃতি আরও তিনটি যুগ অতিক্রম করে প্লায়োষ্টোসিন যুগে আর একবাব বিবর্তিত হয়ে আধুনিক যুগের প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়। এ সময় গরু, বুনো মোষ, উট, হরিণ, গণ্ডার, জলহস্তী,বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারে পৃথিবী ছেয়ে গেল। বিবর্তনের ফলে বেড়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণীতে রূপান্তরিত হল।

ইউসিন যুগে আবির্ভূত ক্ষুদে বাঁদর প্লায়োষ্টোসিন যুগে এসে বিবর্তন ক্রমে আকারে বড় হয়ে ওঠে। তাদের মধ্য থেকে একদিকে সৃষ্টি হল লেজহীন গিবন, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী ও গরিলা। এদের বলা হল এপ্। আর এ সকল এপ্রাই বিবর্তনক্রমে আধুনিক মানুষে রূপান্তরিত হল।

প্লায়োষ্টোসিন যুগের পর আধুনিক যুগ। এ যুগ মানুষের যুগ। প্রাণী জগতে মানুষের প্রাধান্য এ যুগের বিশেষত্ব। এর পেছনে ছিল তার মস্তিষ্ক। মূলতঃ বিবর্তনের মাধ্যমে যে সব প্রাণীর দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের আকারের অনুপাত বেড়েছে, তারা ক্রমশঃ উন্নততর হয়েছে। এভাবে মানুষ একটা উন্নত প্রজাতিতে পরিণত হয়। আধুনিক মানুষ তাদেরই বংশধর। সাদা-কালো ইথিওপিয়ান, মঙ্গোলিয়ান ইত্যাদি যে কোনভাবেই মানুষকে ভাগ করা হউক না কেন বর্তমান বিশ্বে সব মানুষই এক প্রজাতিভুক্ত। শুধু পরিবেশ ও আবহাওয়া ভেদে ভিন্ন। এমনিভাবে ডাঙ্গায় স্তন্যপায়ী প্রাণীদের প্রাধান্য ঘটলেও জলে মাছ, হাঙ্গর ও তিমি মাছের পাশাপাশি আধুনিক ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ প্রভৃতি অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অস্তিত্ব অব্যাহত রইল। আর জীবনের জয়যাত্রা অব্যাহত রাখার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল উদ্ভিদ জগতে জীবজন্তুর আশ্রয়। খাদ্য, পুষ্টি প্রভৃতি যোগাতে উদ্ভিদরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিজেরা কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে জীবজগতকে দিয়ে থাকে বিশুদ্ধ অক্সিজেন, যা ছাড়া প্রাণীরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারে না।

এমনিভাবে ধাপে ধাপে পৃথিবীর ভূ-স্তরসহ উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিবর্তন চলতে থাকে। আমারও বয়স বাড়তে থাকে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিবর্তিত পৃথিবীর রূপরেখা সাক্ষী হিসাবে আমি নীচের সারণীতে তুলে ধরলাম।

বিবর্তনের সারণী নং-১

অধিকল্প	যুগ	কত বছর আগে শুরু	ভূ-স্তব বিবর্তন	পর্যায়ক্রমিক উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বিবর্তন
প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান (প্রি-কোম্ব্রয়ান)	প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান	২০০ কোটি বছরের বেশী	মূল আগ্নেয় শিলার ভিতে স্তরীভূত যুগ ছিল পাললিক শিলার পরিবর্তিত রূপ।	সমুদ্রে শ্যাওলা ও স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর বাস
	কেম্ব্রিয়ান	৬০.[illegible] কোটি বছর	স্তরে স্তরে জমাট বাঁধে বেলেপাথর, কাদাপাথর, চুনাপাথর প্রভৃতি।	সমুদ্রে ঝিনুক ও শামুক জাতীয় অ-মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবির্ভাব।
	অর্ডোভিসিয়ান	৫০.৫ কোটি বছর	একই ধরনের শিলাস্তরের পুনরাবৃত্তি।	ঝিনুক, শামুক জাতীয় প্রাণীদের ব্যাপকতা এবং একিণোডার্ম, প্রবাল ব্রায়োজায়া প্রভৃতির আবির্ভাব।
পুরাজীবীয় (প্যালিওজোইড)	সাইলুরিয়ান	৪৩.৫ কোটি বছর	একই ধরনের শিলাস্তরের পুনরাবৃত্তি।	ডাঙ্গায় প্রথম ফুলহীন উদ্ভিদের আত্মপ্রকাশ, সমুদ্রে মাছের আবির্ভাব।
	ডেভোনিয়ান	৪১ কোটি বছর	একই ধরনের শিলাস্তরের পুনরাবৃত্তি।	ডাঙ্গায় প্রথম ফুলহীন উদ্ভিদ ও সমুদ্রে মাছের ব্যাপকতাসহ ডিনিক্‌থিস নামক অতিকায় মাছের আবির্ভাব। মাছেরা বিবর্তনের মাধ্যমে ল্যাব্রিনথডেন্ট নামক উভচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হল।

	কার্বোনিফেরাস	৩৫ কোটি বছর	নিবিড় বনের কয়লার স্তরে রূপান্তর	ডাঙ্গা ভরে উদ্ভিদে তৈরী হল নিবিড় বন। বনে উভচয় প্রাণীর ব্যাপকতা লাভ। তাদের কেহ কেহ বিবর্তিত হল সরীসৃপে।
	পার্মিয়ান	২৯ কোটি বছর	বেলেপাথর চূণাপাথরের জমাট বাঁধার মাধ্যমে একই ধরনের শিলাস্তরের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে।	ডাইনোসর নামক অতিকায় সরীসৃপের আবির্ভাব।
	ট্রায়াসিক	২৪ কোটি বছর	" "	ডাইনোসরদের প্রাধান্য লাভ।
	জুরাসিক	২০ কোটি বছর	" "	ডাইনোসোরদের ব্যাপকতা লাভ। বিবর্তনের ফলে কোন কোন সরীসৃপ টেরোডেকটিল পাখিতে পরিণত হল।
	ক্রীটেশাস	৭ কোটি বছর	বেলে পাথর ও চূনা পাথরের জমাট বাঁধা বিভিন্ন শিলাস্তরের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। শেষ দিকে ম্যাগমার আধার থেকে ব্যাপক অগ্ন্যুৎদ্গার হতে থাকে।	পাইন, ফার্ণ, আখরোট, বাদাম, ঘাস সহ লতা গুল্মের আবির্ভাব। গাছ, ফুলের আত্মপ্রকাশ লাভ। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
নবজীবীয় (কেনাজোইক)	প্যালিওসিন	৬.৫ কোটি বছর	হিমালয় ও আল্পস পর্বতমালা সৃষ্টি। নদীমালা হ্রদ ও জলভূমি সৃষ্টি। নরম পলিযুক্ত মাটি পৃথিবীকে সুজলা সুফলা করতে শুরু করল।	স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবির্ভাব। সাপ, গিরগিটি, কচ্ছপ ও কুমীরের ব্যাপকতা লাভ। ইঁদুর, ছাগল এ্যামব্রিস্ড প্রভৃতি জন্তুদের আবির্ভাব।

	ইওসিন	৫.৫ কোটি বছর	নরম পলিযুক্ত মাটি আস্তে আস্তে শক্ত হতে শুরু করল।	ক্রিয়েডন্টরা বিবর্তনের মাধ্যমে নেকড়ের আকার নেয়। তিমি মাছের আদি পুরুষ বেসিলোসরাসের আবির্ভাব। মানুষদের আদি পুরুষ ক্ষুদে আকারের বাঁদরের আবির্ভাব।
	অলিগোসিন	৩.৮ কোটি বছর	একইরকম বিবর্তন চলতে থাকল।	স্তনাপায়ী প্রাণীদের প্রাধান্য। বিবর্তনের মাধ্যমে টাট্টু ঘোড়া, উট, প্রভৃতি জন্তুর আবির্ভাব।
	মায়োসিন	২.৫ কোটি বছর	অসংবদ্ধ কাঁকর ও পলিস্তরের ব্যাপকতা লাভ।	স্তন্যপায়ী প্রাণীদের আধিক্য।
	প্লায়োসিন	১.২ কোটি বছর	প্রায় একইরকমের বিবর্তন চলতে থাকল।	স্তন্যপায়ী প্রাণীজগতের বিবর্তন ত্বরান্বিত হল।
	প্লাইস্টোসিন	২০ লক্ষ বছর	তুযার ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ	আধুনিক প্রাণীজগতের সূচনা। গরু, বুনো মোষ, উট, হরিণ, গণ্ডার, জলহস্তী, বাঘ, চিতাবাঘ, সিংহ, প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারে পৃথিবী ছেয়ে গেল। বিবর্তনের ফলে বেড়াল, কুকুর, নেকড়ে বাঘ, সিংহ, মাংসাশী প্রাণীতে রূপান্তরিত হল। ক্ষুদে বাঁদররা বিবর্তনক্রমে আকারে বড় হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে একদিকে আধুনিক বাঁদর ও হনুমান অপরদিকে ল্যাজহীন গিবন, ওরাংওটাং, শিম্পাঞ্জী গরিলা (বর্তমানে মানুষের আদি পুরুষ) প্রমুখদের আবির্ভাব হল।

প্রাক কেম্ব্রিয়ান যুগে যে বিবর্তন শুরু, আধুনিক যুগে এসে তা শেষ একথা কেউ বলতে পারে না। কারণ বিবর্তনের শেষই শেষ কথা বলা যায় না। তবে প্রকৃতি জগতের বিবর্তনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রাণীর বিবর্তনের ইতিহাস। এ ইতিহাস থেকে রহস্য উন্মোচনই হবে মানুষের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীদের কাজ। আর সে বুদ্ধিমত্তা বা চেতনার বড় অঙ্গ হল তার মস্তিষ্ক। তবে মস্তিষ্কের বর্তমান রূপ গ্রহণ করতে তাকে দীর্ঘ বিবর্তনের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে, করতে হয়েছে কঠোর পরিশ্রম।

দেহের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা

এতক্ষণ পাঠকদের কাছে বিশ্ব সৃষ্টি এবং পৃথিবীর ভৌত বিবর্তনের কিছু মৌলিক তথ্যের প্রমাণ সহ সাক্ষ্য দিলাম। আলোচনা করলাম বর্তমান পদার্থ বিদ্যা ও পুরাজীব বিজ্ঞানের কিছু তাত্ত্বিক দিক নিয়ে। বিজ্ঞানের বড় বড় তত্ত্ব দ্বাবা পাঠকদের নিশ্চয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছি। তবুও বলতে হয় বিবর্তন ও বিকাশ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাই একের আলোচনায় অপরের কথা এসে যাবে ---এটাই স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় পাঠকদের দমবন্ধ উৎকণ্ঠার অবসানে আমি বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা শুরু করছি। বর্তমানে আলোচনাব মুখ্য বিষয় দেহের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা।

বিজ্ঞানীদের অনুমান প্লায়োষ্টোসিন যুগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের পূর্ব-পুরুষদের আবির্ভাব। তবে আজ মানব সভ্যতা উন্নতির যে চরম শিখরে উঠেছে তা হঠাৎ হয়নি। ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছে। সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট—এর পেছনে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। আর এ অবদানের পেছনে রয়েছে বাঁচার তাগিদ মেটানোর আপ্রাণ প্রয়াস। অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তাই তাকে নতুন সৃষ্টিতে বা উদ্ভাবনায় প্রেরণা যুগিয়েছে। তাই বলা হয়ে তাকে "Necessity is the mother of invention"। এ উদ্ভাবনা বা সৃষ্টি করতে গিয়ে কখনও ঘটেছে নিজের দেহের বিবর্তন, আবার কখনও ঘটেছে যান্ত্রিকও পরিবেশগত বিবর্তন। কখনও ভেঙ্গেছে, কখনও গড়েছে। আর এ ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছেছি আমরা। যুক্ত হয়েছে ২০ লক্ষ বছরের সাথে আরও একটি শতাব্দী।

বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় আমাদের পূর্বপুরুষ বিশেষ বানর জাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল আফ্রিকার মত ঘন জঙ্গলে যারা পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আর এ ছড়িয়ে পড়াব পেছনেও ছিল সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণ।

দল বেঁধে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো এবং সারাদিনে খুঁজে খুঁজে গাছের ফল, ফুল আর কচি পাতার মাধ্যমে ক্ষুধা মেটানোই ছিল বানরদের কাজ। ঋতু পরিবর্তন ও বংশবৃদ্ধির ফলে তাদের নির্দিষ্ট স্থানে খাদ্যের অভাব হত। তাই তারা স্থান পরিবর্তন কবত। আবার ঋতু পরিবর্তনে গাছগুলো যখন পুনরায় ফুলে ফলে ভরে উঠত—তখন তাবা আবার প্রাণ ভরে খেতে পেত। এরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই খাদ্য যোগানকারী প্রকৃতি এবং ঋতুভেদ সম্পর্কে তারা জ্ঞান লাভ করতে থাকে।

এমনি করে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেল। বিবর্তনের পালাও ভূ-প্রকৃতিতে চলতে থাকল। বিবর্তনের ফলে ঘন বনভূমি পাতলা হতে লাগল. বড় বড় গাছের সংখ্যা কমে ছোট ছোট তৃণভূমি বা ঝোপ-ঝাড় সৃষ্টি হতে লাগল। ফলে দেখা দিল খাদ্যাভাব। অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে বানরের দল গাছ থেকে সমতলে নেমে এসে খুঁজতে লাগল নতুন খাদ্য। বাঁচার তাগিদে তারা সরু ছুঁচালো আঙ্গুল দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে পেল গাছের মূল। ক্ষুধার তাড়নায় তা খেতে লাগল। স্বাদটা মন্দ ছিল না। আর তখন থেকে কচিপাতার সাথে গাছের নরম মূল স্থান পেল বানরের খাদ্য তালিকায়।

কিন্তু এর মধ্যে আর একটা বড় অসুবিধা দেখা দিল। চার পায়ে গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা সহজ হলেও সামনে দুটি পায়ে ভর দিয়ে চলতে খুবই অসুবিধে হয় তাদের। তাছাড়া ভর দিয়ে চলার কাজে সামনের পা দুটি ব্যবহার না করে মুক্ত করতে পারলে খাদ্য সংগ্রহ সহজ হতে পারে-এরূপ আশায় চলল চেষ্টা। কিছু করার তাগিদ অর্থাৎ হল শ্রমের আবির্ভাব। এ সময় তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে দুপায়ে ভর দিয়ে। সামনের পা দুটো (যাদের আমরা বর্তমানে হাত বলি) মুক্ত করতে পারে। আর তখন থেকেই হাতের ব্যবহার শুরু। এ হাতই হল শ্রম করার অস্ত্র। ল্যামার্কের মতে "ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে জীবের অঙ্গ বিশেষভাবে সুগঠিত হয় যাহা ঐ ব্যবহারের সমানুপাতিক এবং কোন অঙ্গের অব্যবহার ঐ অঙ্গকে ক্ষুদ্র, দুর্বল ও অক্ষম করিয়া তোলে এবং ঐ অঙ্গের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটাতেও পারে।"

পাঠকরা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন প্রাণীর দেহের বিবর্তনে শ্রমের কিরূপ ভূমিকা ছিল। তাই চার পা থেকে দু'পায়ে উত্তরণ এবং সামনের পা দুটোকে হাত হিসাবে ব্যবহার-এরূপ অভিযোজনে হাজার হাজার বছর উত্তীর্ণ হলেও এটা হল বিবর্তনের ইতিহাসে একটি ক্রান্তিকারী ঘটনা।

কেননা এর আগে বানর জাতীয় প্রাণীর দ্বারা সামনের পা তথা হাত দ্বারা পাথরের তৈরী একখানা স্থূলতম ছুরিও গড়া সম্ভব হয়নি। মানুষের হাতে পাথর থেকে প্রথম ছুরিখানা তৈরী করতে দীর্ঘ একযুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এ'হাতের ব্যবহারের মাধ্যমেই সে নিজের শারীরিক শক্তির চেয়েও বেশী শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য প্রাণীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সক্ষম হয়ে ওঠে। হাত দ্বারা অর্জিত এ নৈপুণ্য ও কৌশল সঞ্চারিত হতে থাকল বংশ পরম্পরায়, উৎকর্ষতা লাভ করতে থাকল পুরুষানুক্রমে। এপ্রসঙ্গে ডারউইনের মতবাদ উল্লেখ্য "যেহেতু কোন প্রাণীর যত সংখ্যক প্রাণী বাঁচিতে পারে, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রাণী জন্ম লাভ করে এবং যেহেতু ক্রমাগত জীবন সংগ্রাম চলিতেছে —ইহা হইতে এই ধারণা জন্মায় যে, যেকোন প্রকরণ যদি উহা অন্য প্রাণীর এবং পরিবেশের তুলনায় লাভজনক হয় —তাহা হইলে ঐ প্রজাতির প্রাণীর বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ বেশী পায় এবং স্বভাবতঃই প্রাকৃতিক নির্বাচন লাভ করে। বংশগতির মৌল ধারণা হইতে ইহাই প্রতীতি হয় যে নির্বাচিত প্রকরণ বংশগতি লাভ করে।" তাই বলা যায় হাত শুধু শ্রমের অঙ্গ নয় শ্রমের সৃষ্টিও।

শ্রমের সৃষ্টিতে হাতের সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিকাশের পারস্পরিক সম্পর্কের নিয়ম অনুযায়ী দেহের অন্যান্য অঙ্গও বিবর্তিত হতে থাকে। আর এ বিবর্তন ছিল সভ্যতা বিকাশের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এদের মধ্যে কণ্ঠনালীর বিবর্তন আর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা।

শ্রমের সৃষ্টির সাথে সাথে প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকল। প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের গুণাগুণ বিচারে মানুষের অগ্রগতি এগিয়ে চলল যা অনিবার্যভাবেই মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধন নিবিড় করতে সাহায্য করল। আর তখনই পরস্পরকে কিছু বলার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথমতঃ যূথবদ্ধ বানরের মতই মানুষও কু-কু-বা অন্যান্য সরল শব্দ দ্বারা মনের কথা একে অপরকে বুঝাতে চেষ্টা করল। ক্রমে অভিযোজনের মাধ্যমে মানুষের অপরিণত কণ্ঠনালীসহ মুখের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ধীর স্থির গতিতে রূপান্তরিত হয়ে একটা একটা করে স্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করতে

শিখল।

'শ্রম থেকে এল, শ্রমের সঙ্গে ভাষার উৎপত্তি'। তা প্রাণীদের আচরণেই খুঁজে পাওয়া যায়। মানুষ ভিন্ন অন্যান্য প্রাণীরা স্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করতে না পারলেও, একে অপরকে তাদের অনুভূতির ভাষা বোঝাতে অপারক হলেও তারা কোন অসুবিধা বোধ করে না। অধিকন্তু এরা একদিকে মানুষের সহানুভূতি বা অনুকম্পা আদায়ে সক্ষম। অপরদিকে তারাও মানুষের প্রতি তাদের ভালাবাসা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার দৈহিক আচার-আচরণের মধ্যে প্রকাশ করে থাকে। তবুও তাদের দুর্ভাগ্য তারা সভ্য মানুষের মত কথা বলতে পারে না। আর এটাও দুর্ভাগ্য যে তাদের এরূপ কথা বলার অক্ষমতা একটা খুঁত, যার প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কেননা তাঁদের বাক্‌যন্ত্রগুলি একটা নির্দিষ্ট ধরণে অতিরিক্ত মাত্রায় বিশেষীকৃত হয়ে গেছে। এমনিভাবে শ্রম প্রাণীর দেহ যন্ত্রে ধনাত্বক বিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হল।

তবে এর মধ্যেও কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। কিছু কিছু পাখীর কথা উল্লেখ করা যায়। এখানেও পাখীর মুখ যন্ত্র, মানুষের মুখ যন্ত্র থেকে একেবারে ভিন্ন হলেও শুক পাখীর ন্যায় কিছু পাখী কথা শিখতে পারে। শুক পাখীর সুর এমনিতে বিকট হলেও সে কথা বলে সবচেয়ে ভাল। আর যে কথা সে বলে তা বুঝবার শিক্ষাও সে আয়ত্ত করতে পারে। তাই শুক পাখীকে তার শেখা বুলি তার নিজের প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে দেখা যায়। তবে কথা বলার দিক থেকে শুক পাখী তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারলেও অন্যান্য আরও কিছু পাখী আছে যারা শিখানো কথা শুধু বলতেই পারে। কিন্তু শুক পাখীর মত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তারা এতটা উন্নত নয়। কারণ অভিযোজনের জন্য বাকযন্ত্রের বিবর্তনের সাথে সাথে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতিসহ মস্তিষ্কের বিকাশও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যকারিতা মস্তিষ্কের বিকাশের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মানুষের তুলনায় কুকুরে ঘ্রাণ শক্তি বেশী হলেও—বিভিন্ন গন্ধ যে বিভিন্ন জিনিষের নির্দিষ্ট প্রতীক, তা মানুষ যেভাবে চিহ্নিত করতে পারে কুকুর তার শতাংশও পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়ের সাথে মানুষের মস্তিষ্ক নিম্নতর প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশী সংবেদনশীলী।

এভাবে মস্তিষ্ক বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশও ঘটতে থাকল। মস্তিষ্ক ও তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলোর ক্রমবর্ধমান বিকাশের ফলে মানুষ শ্রম ও বাক্ শক্তি উভয় ক্ষেত্রে বিকাশের ক্রমাগত নিত্যনতুন প্রেরণা লাভ করতে থাকে বা অন্যভাবে বলা যায় বাঁচার তাগিদে শ্রম প্রাণীর প্রোটোপ্লাজম ও অ্যালবুমেনকে শুধু জীবিতই রাখছে না—নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিকল্পিত কাজের ক্ষমতা বাড়াতে মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রমাগত বিকাশও ঘটে চলছে।

এভাবে মস্তিষ্ক ও সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়গুলোর বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্রম ও বাক্‌শক্তি ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকল। 'এ বিকাশ শুধু ব্যক্তি জীবনেই নয় সমাজ জীবনেও হল। শ্রম, বাক্ শক্তি আর মস্তিষ্কের সহযোগিতায় মানুষ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর কাজ করবার, বৃহৎ থেকে বৃহত্তর লক্ষ্য স্থাপনও সাধন করার ক্ষমতা লাভ করল—আর তার পেছনে যে অভিযোজন সক্রিয়ভাবে তাকে সাহায্য করেছিল, সেটা হলো 'বাঁচার সংগ্রাম'। যে হরিণ পরের

বছর বাচ্চা দেবে তাকে শিকারী ছেড়ে দিলেও নেকড়ে ছাড়ে না। এমনিভাবে নেকড়ে একদিন বনের সমস্ত হরিণ নিঃশেষিত করতেও দ্বিধা করবে না। এটা জগতের 'লুটেব অর্থনীতি' নামে বিবর্তনের ইতিহাসে পরিচিত। তবে বানর থেকে মানুষ হতে এ লুটেরা অর্থনীতির অবদান অনস্বীকার্য। এ থেকেই খাদ্য বৈচিত্র্য আসে। আর এ বিচিত্র খাদ্যই বানর থেকে মানুষে উত্তরণের উপযোগী জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। প্রকৃত অর্থে তখনও শ্রমের আবির্ভাব ঘটেনি। মূলতঃ শ্রম সৃষ্টি হল হাতিয়ার তৈরী থেকে। খাদ্যাভাসের পরিবর্তন করতে গিয়ে একসময় মানুষ আমিষ খাদ্য গ্রহণে বাধ্য হল। শিকার বা মাছ ধরার তাগিদে মানুষ হাতিয়ার তৈরী ও ব্যবহার করতে লাগল। পরবর্তী পর্যায়ে পশুপালন, কৃষি, সুতাকাটা, কাপড়বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌ-চালনা প্রভৃতি রূপান্তরের পর বর্তমানের অতি যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। আর এসবের সাক্ষী হয়ে আমি যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে আসছি। তাই মহাকাল রূপে আজ আমি একে একে সব ঘটনার সাক্ষী দিতে চাইছি।

এছাড়াও হিংস্র পশুদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হত। একদিন বুনো শুয়োরের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে তারা ভেঙ্গে নিল গাছের ডাল, তৈরী করল লাঠি। এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে সংগ্রহ করল পাথরের চাই বা টুকরো। লাঠি আর পাথরের টুকরোর আঘাতে বুনো শুয়োরকে তারা মেরে ফেলল। এভাবেই তারা একদিকে বন্য জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করল, অপরদিকে খাদ্য সংগ্রহে পাথরের ব্যবহার করতে শিখল।

এরূপ অভিজ্ঞতার পর থেকে তারা পাথরের ওপর শ্রম প্রয়োগ করে অর্থাৎ পাথরে-পাথরে ঘষে ধারালো পাথরের অস্ত্রী তৈরী করতে লাগল। অভিজ্ঞতায় আরও দেখা গেল ঐরূপ ধারালো অস্ত্র দিয়ে অনেক সহজে বড় বড় পশুকে মেরে ফেলে আত্মরক্ষা এবং খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। তাই বলা হয়ে থাকে হাত চালাবার মধ্য দিয়ে শ্রমের আবির্ভাব হয়ে থাকলেও তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেল হাতিয়ার তৈরীর মধ্য দিয়ে। আর এ থেকেই যান্ত্রিকতার যাত্রা শুরু।

৪. বিকাশের যাত্রা শুরু

(ক) প্রস্তর যুগ

কাল ঃ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫,০০,০০০ থেকে ১,০০০ অব্দ)

অনেক পুরাজীব বিজ্ঞানীদের মতে আনুমানিক ৫ লক্ষ বছর আগে পূর্ব আফ্রিকার মানুষ পাথরের তৈরী দ্রব্যাদির সঙ্গে পরিচিত ছিল। দ্বিতীয়ত এটাই ছিল পাথরের অস্ত্র ব্যবহারের সূচনা কাল। এটা ইতিহাসে প্রস্তর যুগ নামে পরিচিত।

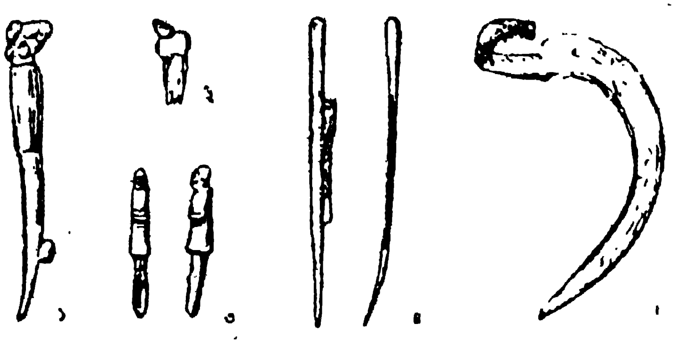
পাথরের অস্ত্র ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে সমভাবে বিকশিত হয়নি। তাই বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন--প্রত্ন প্রস্তর যুগ, মধ্যপ্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগ।

প্রস্তর যুগের সূচনাকাল থেকে আনুমানিক বরফ যুগের শেষ অবধি সময়কে বিজ্ঞানীরা প্রত্ন প্রস্তর যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ে মানুষের ব্যবহৃত পাথরের দ্রব্যাদির প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার প্রকৃতির পরিবর্তন অনুসারে প্রত্নপ্রস্তর যুগকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরা প্রাক্ প্রত্নপ্রস্তর, মধ্য প্রত্নপ্রস্তর ও নব্য প্রত্নপ্রস্তর যুগ নামে পরিচিত।

কারও কারও মতে আদি প্লায়োসিন যুগে শুরু হয়ে বরফ যুগের অধিকাংশ সময় নিয়ে প্রাক্ প্রস্তর যুগ বিস্তৃত। এ যুগের বৈশিষ্ট্য হল পাথরের তৈরী হাত কুঠার ও চোঁরকাটার ব্যবহার। এরূপ পাথরের অস্ত্র উল্লেখিত সময়কালে পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যবহৃত হত বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। বিশ্লেষণে দেখা যায় ভারতে আবিষ্কৃত কুঠার গুলো পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় আবিষ্কৃত কুঠারগুলোর অনুরূপ। পাঞ্জাবের শোন নদীর উপত্যকা, উত্তরপ্রদেশের বেলান উপত্যকায় এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাক্প্রত্নপ্রস্তর যুগে ব্যবহৃত পাথরের তৈরী অনেক অস্ত্র বা হাতিযার পাওয়া গেছে। এছাড়া বেলান উপত্যকায় কয়েকটি গুহা ও পাথর নির্মিত আশ্রয় স্থল এবং পাথরের ফলকের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাথর নির্মিত আশ্রয় স্থল, পাথরের ফলকের ব্যবহারকে বিজ্ঞানীরা মধ্যপ্রত্নপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছেন। পাথরের ফলক দ্বারা তৈরী ছোট ছোট নিত্য ব্যবহার্য বস্তুরও সন্ধান পাওয়া গেছে। ব্লেড সদৃশ পাথরের বস্তুও এ যুগে পরিলক্ষিত হয়। শোন নদীর উপত্যকায়, নর্মদা নদীর তীরে এবং তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এসকল পাথরের অস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুর নির্দশন পাওয়া গেছে।

নব্য প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও বরফ যুগের শেষ অধ্যায় মোটামুটি সমসাময়িক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। কারণ এ সময় আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। আর্দ্রতা যথেষ্ট কমে এসেছিল। পুরাজীব বিজ্ঞানীদের মতে এটা ছিল আধুনিক মানুষের আবির্ভাব পর্ব। হাত কুঠার, ছুঁচালো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও চক্মকি পাথরের ব্যবহার ছিল এ সময়ের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, ভূপাল, ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চল এবং গুজরাটের সমুদ্র তটস্থ বালিয়াড়িতেও এরূপ অস্ত্রের নির্দশন পাওয়া গেছে।

খনন কার্যের ফলে মাটির নীচে পাওয়া পাথরের তৈরী আসবাবপত্র, পাথরের ছুরি, পালিশকরা পাথরের কুড়ুল, তীরের ফলা এবং থালা বাটি প্রভৃতিতে প্রস্তর যুগের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।



প্রস্তর যুগে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র

সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের মূলওর্কণর দ্বীপে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) বছরের পুরাতন সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেছে।

আলোচনায় দেখা যায় প্রত্নপ্রস্তর যুগের এতবড় স্থায়িত্বকাল সত্ত্বেও যোগাযোগের অভাবে বিকাশের হার ছিল অত্যন্ত মন্থর। তাই আদি মানুষ এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করলেও এক অঞ্চলের ব্যবহৃত হাতিয়ার বা উদ্ভূত কলাকৌশল অন্য অঞ্চলে অনুসৃত হতে দীর্ঘকাল লেগে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বিকাশের শুরুটি ছিল দীর্ঘ সমব্যাপী। প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আবিষ্কৃত পাথরের অস্ত্রের সামঞ্জস্যতায় এটা প্রমাণিত যে পৃথিবীর ভৌত বিবর্তনের সাথে সংগতি রেখেই বিকাশের চাকা আবর্তিত হয়েছে। এতক্ষণ আমি পাথরের অস্ত্র তৈরী ও ব্যবহার নিয়েই আলোচনা করলাম। এ পর্বে স্বাভাবিকভাবেই বিকাশের গতি ছিল মন্থর। মানুষের জীবনযাত্রার আকস্মিক পরিবর্তনের কোন উপকরণ ছিল না।

তবে প্রায় একই সময়ে আগুনের আবিষ্কার ছিল মানবজাতির অগ্রগতির প্রাথমিক পদক্ষেপ। এ আবিষ্কার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও আগুনের সাথে মানুষের প্রথম পরিচয় ভয় মিশ্রিত ভক্তির মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিক আগুনকে তারা প্রথম দেখল দাবানল রূপে। প্রাকৃতিক আগুন তাদের খাদ্য যোগানকারী অঞ্চল ধ্বংস করে ফেলছে, পুড়িয়ে ফেলছে তাদের আশ্রয়স্থল। মাঝে মাঝে পুড়িয়ে মারে তাদের সাথীদেরও, পুড়িয়ে মারে হিংস্র জন্তুজানোয়ারকেও। তাই আগুনের ভয়ে পশুরা পালিয়ে যায়। এই আগুনের ভয়ে সবাই ভীত।

তখনকার সময়ে আপনাদের পূর্বপুরুষদের সাথে বর্তমানে আপনাদের জীবনযাত্রা তুলনা করা একেবারে মূল্যহীন। কারণ তখনকার মানুষ দাবানলে এত ভয় পেত যে সবাই একসাথে কোথাও জড়োসড়ো হয়ে থাকত। মনে হত যেন তারা তাদের চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

দাবানলের পর আগুন নিভে গেলে ভয়ে ভয়ে মানুষ তা দেখতে যায়। তখনও গাছের গুড়ি বা তদ্রূপ বড় বড় গাছ নিবু নিবু ভাবে জ্বলতে থাকে। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে তারা মাঝে মাঝে দেখতে পায় আধপোড়া পশুর মৃতদেহ। তারা সাধারণত যে সকল পশু শিকার করে কাঁচা খেত, ঐগুলো দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা। বিনা পরিশ্রমেই পেয়ে গেছে তাদের আহার্য্য বস্তু। ধারালো পাথরের ছোরা দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে সকলে এক সঙ্গে বসে যেত মাংস খেতে। স্বাদটা ভিন্ন। কাঁচা

মাংসের চেয়ে বেশী সুস্বাদু। একে অপরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে অবশেষে বুঝতে পারল আগুনই এর জন্য দায়ী।

এমনিভাবে আগুন মানুষের জীবনযাত্রায় নিয়ে এল যুগান্তকারী পরিবর্তন। এবার পরিশ্রম শুরু হল আগুনকে আয়ত্ত করার জন্য। তাই প্রথম প্রয়োজন এর সংরক্ষণের। পোড়া কাঠের পাশে কাঠ ও শুকনো পাতা দিয়ে আগুনকে ধরে রাখল তারা অনেকদিন। আজও গ্রামেগঞ্জে মাটির হাঁড়িতে তুষ ও কাঠ দিয়ে আগুন সংরক্ষণের প্রাথমিক পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া যায়।

এভাবে আগুন আবিষ্কার হল মানব বিকাশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। একে ভিত্তি করে প্রাথমিকভাবে মাংস পুড়িয়ে খাওয়াতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমে ক্রমে তার সাহায্যে মানুষ 'আকর' থেকে তামা বের করতে শিখল। আবার শীতের নিদারুণ প্রকোপ থেকে মানুষকে উত্তাপ দিতেও আগুন সমর্থ হল। এছাড়া পোড়া বা সেদ্ধমাংস হজমও সহজ। তাই মানুষের পরিপাক যন্ত্রে আনুষঙ্গিক পরিবর্তন শুরু হল। মস্তিষ্কসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতা অনেক বেড়ে গেল। এভাবে আগুনের আবিষ্কর মনের বিকাশেও একটা বিরাট গুণগত পরিবর্তন আনতে সমর্থ হল।

শুরু হল মাংসের জন্য শিকার। শিকারের জন্য তাদের সারাদিন ছোটাছুটি করতে হত। কখনও শিকার মিলত—কখনও মিলত না। শারীরিক গঠনের দিক থেকে নারীরা ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল। বিশেষভাবে মাতৃত্ব ধারণের কারণে নারীরা আরও বেশী দুর্বল হয়ে পড়েন। তাই তারা ভারী কাজ করতে পারেন না। ফলে দেখা দিল নারী-পুরুষ ভেদে শ্রম বিভাজন। সম্ভবত এটাই ছিল প্রথম স্বাভাবিক শ্রম বিভাজন। পুরুষেরা শিকার করে, খাদ্য সংগ্রহ করে। নারীরা খাবার ভাগ করে, গৃহস্থালী সামলায়, শিশুদের পরিচর্যা করে। পুরুষরা শিকার করে বলে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদের হাতে। অপরদিকে গৃহস্থালী আসবাবপত্র নারীদের হেফাজতে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রধান এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন।

এক বা একাধিক নারীর সন্তানদের নিয়েই ছিল এক একটি দল। তখন মাতৃপরিচয়ই ছিল সন্তানের সঠিক পরিচয়। এভাবে মায়ের রক্তের সমাজকে ভিত্তি করে বন্য মানুষের দলগুলো সংগঠিত হতে লাগল। গড়ে উঠল গোষ্ঠী প্রথা। গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিল আজকের আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের। তাই বলা হয়ে থাকে আদিকালের গোষ্ঠী প্রথাই আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রাণ। আর এটাই ইতিহাসে আদি সাম্যবাদী সমাজ বা আদিম যৌথ সমাজ নামে পরিচিত।

(খ) তাম্র প্রস্তর যুগ

কাল ঃ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০-১০০০ অব্দ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাঠকদের কাছে আদি সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়েছে। উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী মানুষের কাছে আর পেছনের দিকে ফিরে তাকানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। সে ক্রমান্বয়ে এগোতে লাগল। এবার তার বিবর্তনের গতি ত্বরান্বিত হতে লাগল। প্রস্তর যুগ পেরিয়ে আস্তে আস্তে সে সভ্যতার ঊষালগ্নে পা ফেলল। শুরু হল ধাতুর ব্যবহার। মানুষ প্রথম যে ধাতুটি ব্যবহার করতে শিখল তা ছিল তামা। এসময়ে তামা ও পাথরের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ব্যাপী বেশ কয়েকটি সংস্কৃতি গড়ে উঠল। ইতিহাসে এটা তাম্র প্রস্তর যুগ নামে পরিচিত।

অতীতের কথা মনে পড়লে আমার কৌতুক জাগে। কেননা প্রস্তর যুগ থেকে ধাতুর যুগে উত্তরণে কোন ধারাবাহিক চর্চা ছিল না। ছিল আকস্মিকতা। মনে পড়ে সেদিনের কথা। আপনাদের পূর্বপুরুষদের একটি দল তামার আকরিক সমৃদ্ধ মাটিতে আগুন জ্বালিয়ে কোন কিছু পোড়ানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আগুনের প্রভাবে তামার আকরিক ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠে। এ'ভাবেই তামার ব্যবহারের আদি কৌশল বা আদি রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। তবে হ্যাঁ, সেদিন তাদের কাছে তামা আবিষ্কারের কোন প্রস্তুতি ছিল না বলে তারা আর্কিমিডিসের ন্যায় ইউরেকা ইউরেকা বলে চিৎকার করে উঠেনি। হঠাৎ তা ঘটে গেল। আজ তামার এরূপ ব্যবহার সভ্যতা বিকাশে এক দারুণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এ'তাম্র প্রস্তর যুগ সমান ভাবে পৃথিবীর সর্বত্র বিকাশ লাভ করেনি বলে এর স্থায়িত্ব কাল নিয়ে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কারও কারও মতে এ'যুগ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং পূর্ব ভারতে তাম্র — প্রস্তর যুগের গোড়ার দিক্‌কার অনেক নির্দশন পাওয়া গেছে। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের মালাব্য, কায়াথা, এরানে এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রের জরওয়ে, নেভাসা, দাইমাবাদ, চান্দেলি, সোনাগাঁও, ইনামগাঁও ও নাসিকে তাম্র প্রস্তর যুগের নির্দশন পাওয়া গেছে। মোট কথা তামার আকরিক সমৃদ্ধ অঞ্চলেই তাম্র প্রস্তর যুগের নির্দশন পাওয়া যায়।

তাম্র প্রস্তর যুগে মানুষ বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহার করত। এদের মধ্যে বেশী ছিল লাল-কালো পাত্র এবং এদের ব্যবহারই সবচেয়ে ব্যাপক ছিল বলে ঐতিহাসকরা মনে করেন। তবে লাল-কালো মাটি যারা ব্যবহার করত তাদের সবার সংস্কৃতিতে মৌলিক সাযুজ্য থাকলেও নির্মাণ কৌশল ও নির্মিত দ্রব্যাদির মধ্যে পার্থক্যও ছিল ব্যাপক। তাছাড়া ঐ সময় থেকে পশুপাখীর গৃহপালন এবং চাষ ব্যবস্থার যাত্রা শুরু বলে অনেকে মনে করেন। দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ঐ সময়ের অধিবাসীরা গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকর, মহিষ প্রভৃতি পশু গৃহে লালনপালন করত। খনন কার্যে ঐ সকল পশুদের দেহাবশেষ আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিকদের অনুমান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এছাড়া উটের দেহাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে।

যে বিষয়টি সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হল ঐ যুগের মানুষ ধান ও গম উৎপন্ন করতে

জানত। তারা ধান ও গমের সাথে বাজরার চাষও করত। ধানের সঙ্গে ডালের উৎপাদনের নির্দশনও পাওয়া গেছে। ভারতের অন্যত্র খনন কার্যের ফলে ঐরূপ খাদ্যশস্যের সন্ধান পাওয়া না গেলেও মহারাষ্ট্রের নর্মদা নদীর তীরে নাভাদাতোলিতে ওপরের সব কয়টি খাদ্যশস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের কালো জমিতে তুলা চাষ হত। এছাড়া রাগী, বাজরা প্রভৃতি জোয়ার জাতীয় খাদ্যশস্যের নির্দশনও পাওয়া গেছে নিম্ন দাক্ষিণাত্যে।

পূর্ব ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে মাছ ধরা বড়শির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানেও ধান জাতীয় খাদ্যশস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় পূর্ব ভারতের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল মাছ-ভাত। তাম্র-প্রস্তর যুগে পোড়া ইটের ব্যবহার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কদাচিৎ তারা ইটের বাড়িতে বাস করত। অধিকাংশ বাড়ি ঘর ছিল ডালপালা দিয়ে ঘেরা ছাউনির মত। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ইনাম গাঁও-এ তাম্র-প্রস্তর যুগের প্রথম দিকে ব্যবহৃত কয়েকটি উনুন ও মাটির বাড়ি এবং গোলাকৃত মৃত্তিকা গহ্বরের মত বাসস্থানের আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ যুগের মানুষ যাযাবর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসে অভ্যস্ত হতে শুরু করে।

তাম্র-প্রস্তর যুগের আধিবাসীদের শিল্পকলা বা কারিগরি নৈপুণ্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সুযোগ না থাকলেও সে যুগের যতটুকু নির্দশন পাওয়া গেছে, তাতে সে যুগের তাম্রশিল্প ও সূক্ষ্ম পাথরের জিনিষপত্র তৈরীর নৈপুণ্যের পরিচয় স্পষ্ট। মালব্যে আবিষ্কৃত সূতা কাটার টাকু থেকে মনে হয় তারা সূতা কাটাও বোনার কাজে অভ্যস্ত ছিল। অর্থাৎ এটা প্রমাণ করে যে তাম্র-প্রস্তর যুগ থেকেই কাপড়ের ব্যবহার প্রচলিত। অর্থাৎ বলাযায় তাম্র-প্রস্তর যুগে মানুষ সভ্যজীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল।

মানব জীবনের ঊষালগ্ন থেকে সিন্ধু সভ্যতা বিস্তৃতির পূর্ব পর্যন্ত ভারতে সমাজ বিকাশের গতি প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত রূপ সাক্ষ্য হিসাবে সারণীতে তুলে দেওয়া হল।

বিবর্তনের সারণী নং ২

যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পবিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণ	স্মরণীয় আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	পরিবর্তন বা আবিষ্কারের পরিণতি
প্লাইয়োষ্টিন	১) মানুষের পূর্বপুরুষ বানর সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখে, সামনেব পা দুটো (যাদের বর্তমানে হাত বলা হয়) মুক্ত করতে পারে	গাছের ডালপালা ব্যবহারের প্রচেষ্টা	শ্রমের আবির্ভাব	শ্রমজীবী মানুষের উত্তরণের যাত্রা
	২) বাক্ যন্ত্রের বিবর্তন	দলবদ্ধভাবে বাঁচাব প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় অপরিহার্য হয়ে ওঠে।	বানরের ব্যবহৃত কু-কু শব্দ স্পষ্ট ধ্বনিতে রূপান্তর	শ্রবণেন্দ্রিয়ের উন্নতি
	৩) মস্তিষ্কের বিকাশ ৪) শাকাসি থেকে মাংসাসিতে পরিবর্তন	বাঁচার জন্য সংগ্রাম বিকশিত মস্তিষ্ক ও অন্যান্য স্নায়ুতন্ত্রের জন্য অধিকতব পুষ্টি যোগাতে মাংস সক্ষম।	সংবেদনশীল অংশের বিকাশ শিকার বা মাছ ধরার প্রয়োজনে পাথরের চাঁই বা গাছের ডালা প্রভৃতি হাতিয়াবের আবিষ্কার ও ব্যবহার।	পরিকল্পিত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি। অতি যান্ত্রিকতা আবির্ভাবের প্রাথমিক পদক্ষেপ।
প্রস্তর যুগ	১) বাক্‌যন্ত্র শ্রবনেন্দ্রিয়সহ স্নায়ুকোষ ও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ বৃদ্ধি পেতে থাকলো।	বিভিন্ন ধরনের পাথবের অস্ত্রেব ব্যবহার।	গুহা এবং পাথর নির্মিত আশ্রয়স্থলের আবিষ্কার।	উন্মুক্ত আকাশের পরিবর্তে আশ্রয়স্থল বাসস্থানের সূচনা।
	২) ,,	হাতকুঠার, ছুঁচালো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ও চক্‌মকি পাথবের ব্যবহার।	উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অব্যাহত।	পৃথিবীর ভৌত পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ।

তাম্র-প্রস্তর যুগ	৩) ,,	প্রাকৃতিক দাবানল	আগুন আবিষ্কার ও পোড়া মাংস খাওয়া।	আগুন সংরক্ষণ এবং নারী পুরুষ ভেদে শ্রম বিভাজন।
	১) মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি	তামার আকরিক সমৃদ্ধ জায়গায় আগুন জ্বালানো	আগুনের উপস্থিতিতে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তামার আকরিক ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে।	ধাতব যুগের সূচনা।
	২) ,,	বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি। লাল কালো মাটির সন্ধান।	মাটির পাত্রের আবিষ্কার	মাংসের তাগিদে পশু সংরক্ষণ ও পশুপালন।
	৩) ,,	আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে মাটি খাদ্য শস্য উৎপাদনে উপযোগী হয়ে উঠে।	ধান, গম, বাজরা সহ বিভিন্ন খাদ্য শস্যের এবং তুলা চাষ। উনুন ও মাটির বাড়ী এবং ছাউনি যুক্ত ঘরের আবিষ্কার। কুঠার আবিষ্কার। সূতা-কাটা কাপড়ের ব্যবহার।	যাযাবর জীবনযাত্রা পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা।

(গ) সিন্ধু সভ্যতা বা প্রথম নগর সভ্যতা

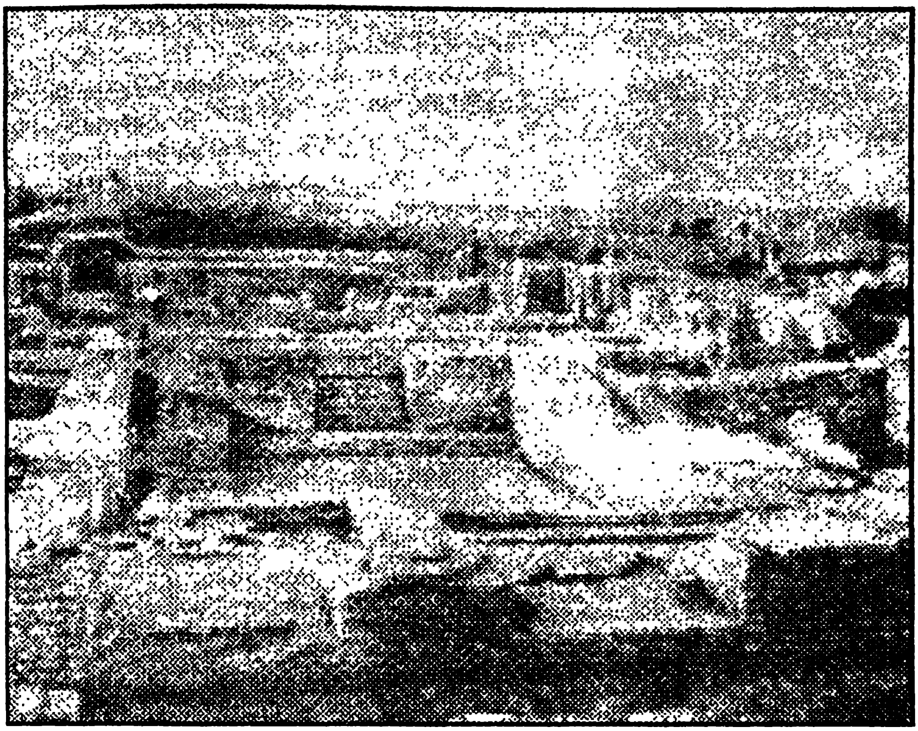
কাল ঃ (আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০০-২০০০ অব্দ)

মহাবিস্ফোরণের পর থেকে তাম্র প্রস্তর যুগ অবধি বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আলোচিত হল বিবর্তনের সাথে বিকাশের বিভিন্ন পর্বগুলো নিয়েও। প্রতি ধাপেই দেখা যাচ্ছে বিকাশ ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত কোথাও তাকে পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। তেমনি এক ক্রমবিকাশের সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আপনাদের রচিত ইতিহাসে এটা সিন্ধু সভ্যতা নামে খ্যাত। যুগ হিসাবে এটা আবার তাম্র প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ যুগ নামে পরিচিত। এ সময় ভারত ব্যতীত মিশরের মেসোপটেমিয়া নামক স্থানেও অনুরূপ সভ্যতা বিকাশের সাক্ষী আমি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদিও আমার সাক্ষ্যের পরিপূরক।

অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশের হরপ্পা নামক স্থানে ১৯২১ সালে খনন কার্যের ফলে এক প্রাচীন সভ্যতার নির্দশন পাওয়া যায়। সিন্ধু নদের অববাহিকায় ঐ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল বলে বা হরপ্পা নামক স্থানে এর প্রথম নির্দশন পাওয়া যায় বলে ইতিহাসে এটা সিন্ধু সভ্যতা নামে পরিচিত। ঐতিহাসিকদের মতে এর বিস্তৃতিকাল ছিল দীর্ঘ। বয়সের দিক থেকে এটা তাম্র প্রস্তর যুগের চেয়েও প্রাচীন। কিন্তু বিকাশের দিক থেকে এটা ছিল তাম্র-প্রস্তর যুগের চেয়েও উন্নত। স্থায়িত্ব ও বিকাশ উভয় দিক থেকেই এ সভ্যতা মিশরের মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সমসাময়িক।

উত্তরে জম্মু থেকে দক্ষিণ নর্মদা, পশ্চিমে বালুচিস্তানের মারকান উপকূল থেকে উত্তর-পূর্ব মীরাট পর্যন্ত ঐ সভ্যতা বিস্তৃত ছিল। আয়তনে প্রায় ১২,২৯,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। আকৃতির দিক থেকে ছিল ত্রিভুজের ন্যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ ও ২০০০ অব্দের মধ্যে পৃথিবীর কোথাও হরপ্পার ন্যায় এত বড সভ্যতার নির্দশন আজ অবধি পাওয়া যায়নি। এ বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্যে এ পর্যন্ত যে ২৫০টি স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে ছয়টিকে নগর বলে চিহ্নিত করা যায়। এগুলোর মধ্যে পাঞ্জাবের হরপ্পা ও সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদাড়ো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে এদুটি স্থানই পাকিস্তানের অন্তর্গত। প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার দূরে দুটি শহর আবিষ্কৃত হলেও সিন্ধুনদের মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে আবার কোন কোন শহরে যেমন কালিবাগনান বা বানওয়ালিতে প্রাক্ হরপ্পা যুগের মাটির ইটের তৈরী মঞ্চ, রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির নির্দশন আবিষ্কারই উপরে উল্লিখিত সিন্ধু সভ্যতার স্থায়িত্বকালের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

খনন কার্যে আবিষ্কৃত বিভিন্ন নির্দশন থেকে এটা স্পষ্ট এ সময়ে মানবসভ্যতা বিকাশের ঊষালগ্নে থাকলেও নগর পরিকল্পনা, কৃষিকার্য, পশুপালন, কারিগরী ও প্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে যথেষ্ট উন্নয়নের বীজ বপন করতে সফল হয়েছিল। উঁচু স্থানে দুর্গ তৈরী, উপনগরীতে জনসাধারণের বাসস্থানের ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে নিরাপদে জীবনযাপনে মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পোড়া ইটের তৈরী দুর্গ ও বাড়ী, উপনগরীতে ১১.৪৮×৭.০১×২.৪৩ ঘন মিটারের সার্বজনীন স্নানাগার, ৪৫.৭১ × ২.২৩ বর্গ মিটারের শস্যগোলা, উন্নত পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির আবিষ্কার নিঃসন্দেহে উন্নত সভ্যতারই পরিচায়ক।



মহেঞ্জোদাড়োতে আবিষ্কৃত স্নানাগারের চিত্র

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত পোড়া ইটের বাড়ী, স্নানাগার, মাটি ও পাথরের বাসনপত্র, পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র, লিখিত শিলালিপি প্রভৃতি থেকে তৎকালীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আপনারা নিম্নলিখিত অনুমানগুলো গ্রহণ করতে পারেন।

১) এ সভ্যতা তাম্র প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করে ব্রোঞ্জ যুগ অবধি বিস্তৃত ছিল । আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০০ অব্দ থেকে ২০০০০ অব্দ পর্যন্ত।

২) পোড়া ইটের বাড়ীঘরের আবিষ্কার প্রমাণ করে তারা যাযাবর জীবনের চেয়ে সীমাবদ্ধ আশ্রয়ে বসবাস করতে আগ্রহী ছিল।

৩) পোড়া মাটি, তামা, ব্রোঞ্জের বাসনপত্র এবং সোনা রূপা প্রভৃতি অলঙ্কারের আবিষ্কার প্রমাণ করে তারা সংকর ধাতু ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

৪) বিদেশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে নৌকা এবং গাধা ও ঘোড়ার ব্যবহার উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাথমিক পদক্ষেপ।

৫) অসংখ্য টেরাকোটা নারীমূর্তি আবিষ্কার, পুরুষ ও মহিলার অসংখ্য লিঙ্গমূর্তির আবিষ্কার প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যায় তারা মূর্তির আরাধনায় বিশ্বাসী ছিল। তবে অগ্নিদেবতা সম্ভবতঃ তাদের উপাস্য দেবতা ছিল। এছাড়া বিভিন্ন গাছপালা ও জীবজন্তু উপাসনা করত। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত

প্রায় ২০০০ শীলমোহরে ষাঁড়, মহিষ, বাঘ প্রভৃতি পশুর উপস্থিতি থেকে এটা অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, তারা বিভিন্ন পশুরও উপাসনা করত।

৬) ১৮৫৩ সালে আবিষ্কৃত প্রথম শিলালিপি থেকে এটা অনুমান করা যায় যে সিন্ধুবাসীরা লিখতে পড়তে জানত। অবশ্য আজ পর্যন্ত লিপিগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তবে লিপিগুলোর কোন বর্ণমালা নেই। আছে বিভিন্ন ছবি। মনে করা হচ্ছে প্রতিটি ছবি অক্ষর, ধ্বনি বা ভাব বুঝাত।

৭) লিখতে জানত বলে সিন্ধুবাসীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির হিসাব নিকাশ করত। ওজন করার জন্য বাটখারার ন্যায় নানাবিধ সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এ থেকে অনেকে মনে করছেন তারা ওজনের ক্ষেত্রে ১৬ গুণিতক ব্যবহার করত।

৮) আবিষ্কৃত দুর্গ বা বাড়ী ঘরের গঠন ব্যবসা বাণিজ্যের ধরণ দেখে মনে করা যায়, বণিক তথা ব্যবসায়ীরাই সমাজের নেতৃত্ব দিতেন।

৯) মেসোপটেমিয়া ব্যতীত অন্য কোন সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সিন্ধু সভ্যতার সাযুজ্যের কোন তথ্য আজ অবধি আবিষ্কৃত না হলেও ঐ সভ্যতার শেষ দিকে ব্যবহৃত কিছু অস্ত্রশস্ত্র দেখে অনুমান করা যায় কিছু নতুন অধিবাসী সিন্ধু অঞ্চলে বসবাস করা আরম্ভ করে। তাতে আদিবাসী ও নতুন অধিবাসীর সংস্কৃতিতে একটা মিশ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সভ্যতাটি ধ্বংসের সঠিক তথ্য আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি। আমিও বিস্মৃত হয়ে গেছি। হয়তো অনাবৃষ্টির দরুণ মরুভূমির বিস্তৃতি ও জমির নোনাভাব বৃদ্ধি ও আকস্মিক বন্যা ও প্লাবন বা বিদেশী আক্রমণ বা আর্য সভ্যতার বিস্তৃতি প্রভৃতি কারণে সভ্যতাটি ধ্বংস হয়েছিল। যে কারণেই ধ্বংস হউক না কেন সিন্ধু সভ্যতা যে ভারতীয় জীবনে বিবর্তন ঘটিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। তাই এ সভ্যতা ভারতে পরবর্তী দিনে আরও উন্নত সভ্যতা বিকাশের পাথেয় হিসাবে চিহ্নিত। কেননা সে সময়টাই ভারতে মূলতঃ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চার প্রসূতি কাল। তাই তৎকালীন সময়ে বিজ্ঞান চর্চা ও তার সাফল্য নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা ঃ

উপরের আলোচনায় দেখা যায় মহঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা ছিল ভারতে নগর সভ্যতার আদি পীঠস্থান। মানুষ যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী বসতি স্থাপনে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই বাসস্থান, আহার সহ জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরীতে তাদেরকে অবশ্যই জ্ঞান অন্বেষণে নিয়োজিত হতে হল। প্রয়োজনের তাগিদে তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের চেষ্টাও বৃদ্ধি পেতে থাকল। নগর জীবনের স্বার্থে পোড়া মাটির ইট ও পাত্র তৈরী এবং ব্যবহার, কৃষি, বুনন প্রভৃতি প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা ঘটতে থাকে। স্থপতির স্বার্থে অংক, কৃষির স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ চর্চা এবং পাথর, তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারে রসায়ন চর্চায় হরপ্পাবাসীরা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

পরিমাপ ও পরিমিতি ঃ মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি অঞ্চলে যে সকল পোড়া মাটির ইটের নির্দশন পাওয়া গেছে তাদের কয়েকটির আয়তন নিম্নরূপ ঃ

১) মহেঞ্জোদাড়ো ঃ ২২৫ × ১১৫ × ৫৭ মিমি.

২) লোথাল ও মহেঞ্জোদাড়ো ঃ ২৫০× ১২৫ × ৬০ মিমি.

৩) কালিবাগনান ও মহেঞ্জোদাড়ো ঃ ২৫০ × ১২৫ ×৬৫ মিমি.

৪) কালিবাগনান ঃ ৪০০ × ২০০ × ১০০ মিমি.

আয়তনের তিনটি দিক থেকে ইটগুলোর অনুপাত ৪:২:১। ইট তৈরীর ক্ষেত্রে তাদের আনুপাতিক ধারণা বর্তমান যুগে ব্যবহৃত ইটের আনুপাতিক হারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে ইট তৈরী ও পোড়া এবং তাদের সাহায্যে বিভিন্ন আকার ও আয়তনের পাকাবাড়ি, স্নানাগার, শস্যভাণ্ডার, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি তৈরী সম্পর্কীয় তথ্য ও তত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মাণ যে, সিন্ধুবাসীরা অংক শাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিল। বিশ্লেষণে দেখা যায় তৎকালীন সময়ে সিন্ধুবাসীরা পরিমাপ ও পরিমিতিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিল।

দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রে মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা ও লোথালে তিন প্রকারের স্কেলের নির্দশন পাওয়া গেছে। তিনটি স্কেলই ছিল ধাতু নির্মিত। মহেঞ্জোদাড়ো এবং হরপ্পাতে ব্রোঞ্জ ও লোথালে আইভরি দ্বারা তৈরী স্কেলের ব্যবহার হত। বিশেষ বিশেষ ধাতব স্কেলের ব্যবহার প্রমাণ করে সেই সময়ে মানুষের তাপের প্রভাবে বস্তুর প্রসারণের ধর্ম সম্পর্কে ধারণা ছিল।

ব্যবহৃত স্কেলগুলো দ্বারা দৈর্ঘ্য পরিমাপে সিন্ধুবাসীদের নিপুণতা অবশ্যই লক্ষনীয়। মহেঞ্জোদাড়োতে ব্যবহৃত স্কেলটি নয়টি দাগে বিভক্ত ছিল। প্রতি দাগে একটি ফাঁপা বৃত্ত ছিল। প্রতি পঞ্চম দাগে একটি বড় বৃত্তাকার বিন্দু দেখতে পাওয়া যায়। এরূপ একটি ফাঁপা বৃত্ত দ্বারা প্রতি পাঁচ দাগ বুঝানো হত এবং এভাবেই সম্পূর্ণ স্কেলটি তৈরী ছিল। স্কেলে এরূপ দাগ কাটা পদ্ধতি খুব নিখুঁত। পরপর দুটি দাগের অন্তর্বর্তী দূরত্ব ছিল ৬.৭০৫৬ মিমি.। ত্রুটি ছিল মাত্র ০.০৭৫ মিমি. ফলে পাঁচটি দাগের মধ্যকার দূরত্ব দাঁড়ায় ৩৩.৫২৮ মিমি.। এবং পরপর দুটি ফাঁপা বৃত্তাকার দাগের দূরত্ব ৬৭.০৫ মিমি.। বড় দাগের মধ্যকার দাগগুলো দশমিক পদ্ধতিতে চিহ্নিত থাকাটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যায়। ফলে সম্পূর্ণ স্কেলে দশটি দাগ থাকলে স্কেলটির মোট দৈর্ঘ্য হয় ৬৭০.৫৬ মিমি.। ঐ মাপটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ঐ পরিমাপটা বর্তমানে ব্যবহৃত মিটার স্কেলের দুই-তৃতীয়াংশ। লোথালে স্কেল ছিল ১৫ মিমি. চওড়া, ৬ মিমি. পুরু, দৈর্ঘ্য ছিল ১২৮ মিমি. স্কেলটিতে মাত্র ২৭টি দাগ সনাক্ত করা গেছে। ঐ দাগগুলোর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ছিল ৪৬ মিমি.। প্রতিটি দাগের গড় দূরত্ব ১.৭০৪ মিমি.। ৬ষ্ঠ ও ২৯তম দাগ দুটি অন্যান্য দাগগুলো থেকে বড় ছিল। ঐ দুটি দাগের মধ্যকার দূরত্ব ২৫.৬ মিমি.

মহেঞ্জোদাড়ো ও লোথালের স্কেলের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যাচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে স্কেল দুটি ভিন্ন হলেও বাস্তবে অভিন্ন। লোথাল স্কেলে ২০ দাগের মোট দূরত্ব ৩৪ মিমি. অন্যদিকে মহেঞ্জোদাড়ো স্কেলের একটি ফাঁপা বৃত্ত এবং বৃত্তাকার বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব ৩৩.৫৩ মিমি.। এতেই দুটি স্কেলের সামঞ্জস্য দেখা যায়, যদিও দাগের পরিমাপে কিছুটা পার্থক্য রয়ে গেছে। আনুপাতিকভাবে লোথালে স্কেলের চারটি দাগ মহেঞ্জোদাড়ো স্কেলের একটি দাগের সমান দেখা যাচ্ছে। লোথাল স্কেলের সূক্ষ্মতার দ্বারা প্রমাণিত হয় দৈর্ঘ্যের সূক্ষ্মতা পরিমাপের জন্যই ঐ স্কেল ব্যবহৃত হত।

ঐতিহাসিক Mainkar'র লেখা "সিন্ধু সভ্যতার ওজন ও পরিমাপ" শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় ওজন পরিমাপের ক্ষেত্রে সে সভ্যতা একটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত অঞ্চলে ওজনের ক্ষেত্রে প্রায় একই পদ্ধতি ব্যবহৃত হত। এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে ওজন পরিমাপে একই পদ্ধতির ব্যবহার একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। তাছাড়া ওজন পরিমাপের জন্য আয়তকার, ঘনাকার এবং মাঝে মাঝে গোলাকার নির্দিষ্ট ধাতব খণ্ড ব্যবহার করা হত। এগুলো ছিল অত্যন্ত মসৃণ এবং আবিষ্কারের সময় এগুলো অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এগুলো বর্তমানে ব্যবহৃত ওজন মাপার বাটখারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক A.S.Hemmy মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার ব্যবহৃত ওজনের ফলকগুলোর বিশ্লেষণ করে ওজনের এককাবলীর একটি সারণী তৈরী করেছিলেন। Hemmy'র মতে ঐ ওজন পদ্ধতি ছিল আংশিক বাইনারি ও আংশিক দশমিক। ১৯৭৩ সালে ঐতিহাসিক Rao আবিষ্কৃত অন্য একটি ওজন পদ্ধতি বিশ্লেষণে দেখা যায় পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাইনারি। ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলো বাইনারি বা দশমিক সেই সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ না রেখে ঐতিহাসিক Mainkar যে বক্তব্য রেখেছেন তা নিম্ন রূপ ঃ

"তাঁর মতে ১০০ গ্রা-কে ২ দিয়ে গুণ করে ২০০ গ্রা পাওয়া যায়। আবার ২ দিয়ে ভাগ করে ৫০ গ্রা পাওয়া যায়। ব্যবহৃত সমস্ত ওজনের বেলায়ই যদি এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ২ দিয়ে গুণ এবং ২ দিয়ে ভাগ করা হয় তবে ১,২,৫,২০,৫০,১০০,২০০,৫০০ ইত্যাদির পরিমাপ পাওয়া যায়। অনুপাতের দিক থেকে তারা ১:২:৫ এবং অনুপাতের ক্ষেত্রে প্রতিটি সংখ্যার দশমিক গুণক পাওয়া যায়। নীচের সারণীতে দুটি ওজন পরিমাপ দেওয়া হল ।

ওজনের প্রথম সারণী		ওজনের দ্বিতীয় সারণী	
গড় ওজন (প্রায়)	অনুপাত (প্রায়)	গড় ওজন (প্রায়)	অনুপাত (প্রায়)
১.২১৮৪	০.০৫	০.৮৭১	০.০৫
২.২৮৫	০.১	১.৭৭০	০.১০
৫.১৭২	০.২	৩.৪৩৪	০.২০
১৩.৭৯২	০.৫	৮.৫৭৫৩	০.৫০
২৭.৫৮৪	১	১৮.১৬৫০	১.০০
৫৫.১৬৮	২	৩৩.৩০৫২	২.০০
১৩৭.৯০	৫	১৭৪.৫০	১০.০০
২৭১.৩৩	১০	৬৯০৩.০০	৫০০.০০
৫৪৬.২০	২০	১৪১৭.৫০	৫০.০০
২৭০১.৪	১০০	৫৫৫৬.০০	২০০.০০
১০৮৬৫.০	৫০০		

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত History of Science and Technology in Ancient India-এর সৌজন্যে)

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে ওজন পরিমাপের দুটি পদ্ধতিই একই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং ঐগুলো এতই যুক্তিসংগত ছিল যে পরবর্তী চার হাজার বছর পর্যন্ত ব্যবহৃত মেট্রিক পদ্ধতিতেও এর প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান।

সিন্ধু সভ্যতার তৎকালীন বিদগ্ধ লোকেরা বস্তুর দৈর্ঘ্য ও ওজন পরিমাপে যেমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, অনুরূপভাবে তারা বিভিন্ন প্রকারের ইট তৈরী ও ব্যবহারের স্বার্থে জ্যামিতিতেও যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। জমি জরিপ এবং নির্মাণ কার্যের বিভিন্ন ধাপগুলো দেখে মনে হয় সিন্ধুবাসীরা জ্যামিতির কিছু মৌলিক তত্ত্ব বা উপপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। যেসকল উপপাদ্য সম্পর্কে সিন্ধুবাসীদের জ্ঞান বিকাশের সুযোগ আছে বলে মনে করা হয় সেগুলো হল ঃ

উপপাদ্য ঃ

ক) "বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের কর্ণ ক্ষেত্রটিকে সমান ভাগে ভাগ করে।

খ) বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রের কর্ণ দুটি পরস্পর সমান।

গ) বর্গক্ষেত্রের বিপরীত বাহুগুলোর সমদ্বিখণ্ডক পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করে।"

সম্পাদ্য ঃ

ক) "একটি সরল রেখাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা। (খ) যে কোন সরল রেখাকে যেকোন সমান অংশে ভাগ করা। (গ) সমকোণের মান ও একটি বাহুর দ্বারা একটি বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্র তৈরী করা। (ঘ) একটি বড় বর্গক্ষেত্র বা আয়তক্ষেত্রকে কয়েকটি সমান ও ছোট বর্গক্ষেত্রে বা আয়তক্ষেত্রে ভাগ করা। (ঙ) একটি রম্বস বা ত্রিভুজকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা। (চ) দুটি সমান্তরাল সরলরেখা অংকন করা।" প্রভৃতি জ্যামিতিক অংকন পদ্ধতি সম্পর্কে সিন্ধুবাসীদের ধারণা ছিল বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। তাছাড়া সিন্ধু সভ্যতার যুগে বৃত্তের ধর্ম, বিভিন্ন জ্যামিতিক বস্তুর ক্ষেত্রফল, আয়তন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থাপনায় U বা T আকারের ইট বা ম্যানহোলের ব্যবহারের মাধ্যমে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হয় যে নগর সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রকৌশলী বা নির্মাতাদের সুবিধার্থে গণিতের উৎকর্ষতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত জরিপের কাজে ব্যবহৃত কম্পাস সদৃশ্য একটি যন্ত্র তৎকালীন সময়ের অংকশাস্ত্রের ব্যবহারিক উৎকর্ষতারই পরিচায়ক। যন্ত্রটি দেখতে ফাঁপা চোঙ্গাকার। প্রতি ধাপে চারটি ছোট ছিদ্র ছিল। দূরের কোন বস্তুর প্রান্তে এসকল ছিদ্রের সাহায্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হত। এতে বস্তুটির অবস্থান পর্যবেক্ষণ খুব সহজ হত। এভাবে কেন্দ্রগামী একটি সরল রেখা পাওয়া যায়। এক দিকের বিপরীত মুখী ছিদ্রগুলো কোন জ্যার মাধ্যমে যুক্ত করলে তারা নিজেদের সমকোণে খণ্ডিত করে। সমস্ত ছিদ্র দিয়ে যে সমস্ত জ্যা সংযুক্ত করা যায়,তারা কেন্দ্রে পরস্পর ছেদ করে এবং এভাবে গঠিত আটটি রেখা ৪৫° পরিমাপের কোণ উৎপন্ন করে। ভূমি জরিপ, রাস্তা ও বাড়ীঘরের অবস্থান নির্দেশনায় ঐরূপ উন্নত যন্ত্রের ব্যবহারে প্রমাণিত হয়, ভারতের প্রথম নগর সভ্যতা বিকাশে অংক শাস্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের।

ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত দালান কোঠার নমুনা বিশ্লেষণে দেখা যায় এ সকল পাকাবাড়ী তৈরী হয়েছে গ্রিডিং পদ্ধতি অনুসারে। চুন, বালি বা ইট চূর্ণ বা চুন ও জিপসাম পরিমাণ মত জল মিশিয়ে চুন বালি বা চুন সুরকী, চুন জিপসামের মিশ্রণ তৈরী করা হত। তা দিয়ে পাকাবাড়ীর ইটের গাঁথুনি দেওয়া হত। দুই ধরনের ইটের গাঁথুনি থেকে এটা প্রতীয়মাণ হয় যে আধুনিক যুগের ন্যায় তৎকালীন সময়েও ধনী ব্যক্তিরা চুন বালি বা চুন সুরকীর বা চুন জিপসামের গাঁথুনি সম্পন্ন শক্ত মজবুত পাকাবাড়ি ব্যবহার করত। আর অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণীর লোকেরা কাদা মাটির গাঁথুনি সম্পন্ন ইটের তৈরী বাড়ি ব্যবহার করত। গ্রিডিং পদ্ধতিতে পাকা বাড়ি তৈরী এবং গাঁথুনিতে চুন বালি বা চুন সুরকী বা চুন জিপসামের ব্যবহারে এটা প্রমাণ করে যে সিন্ধুবাসীরা অংক শাস্ত্র ও রসায়নে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিল।

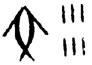
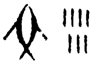
জ্যোতির্বিদ্যা ঃ

সিন্ধুনগরীর উত্তর দক্ষিণমুখী পথ, বাড়ীঘর নির্মাণশৈলী, বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল কৃষি ব্যবস্থা, বাণিজ্যের স্বার্থে সমুদ্র বিচরণ প্রভৃতি তথ্য থেকে এটা প্রমাণিত যে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতি প্রকৃতি অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে সিন্ধুবাসীদের কিছু মৌলিক জ্ঞান থাকা ছিল খুবই স্বাভাবিক।

আজ পর্যন্ত যে কিছু সংখ্যক শিলালিপির পাঠোদ্ধার করা গেছে তা থেকে জানা যায় তৎকালীন সময়ে অর্জিত গাণিতিক জ্ঞান ও কিছু সরল যন্ত্রপাতির সাহায্যে সিন্ধুবাসীরা জ্যোতির্বিদায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ধ্রুবতারার ধারণাও ক্যালেণ্ডার নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ঐ অসাধারণ জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত না বিদেশ থেকে ধার করা ঐ সম্পর্কে সঠিক তথ্য আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

তবে রহস্যে ভরা আকাশ আর সূর্যতারা আজও যেমন মানুষের জ্ঞানের নব নব দ্বার উন্মোচন করে চলছে তদ্রূপ অতীতেও বিদগ্ধ জনেরা এর সত্য সন্ধানে ব্রতী থাকতেন। সিন্ধু উপত্যকায় জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে Ashfaque এবং Parpol বিস্তারিত চর্চা করেছেন। আশফাকের মতে "সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শিলমোহরগুলোর ওপর খোদিত নানা প্রকার জীব, জন্তু, ষাঁড়, হাতি, জলহস্তী, কুমীর, বাঘ, একশৃঙ্গী প্রাণী ও মনুষ্যাকৃতি বিশিষ্ট কিছু দেবদেবীর ছবি চন্দ্রের আপাত পথ বরাবর আকাশ বিভাজনের কোন না কোন পদ্ধতি সূচিত করে।"

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শিলমোহরগুলোর প্রায় শতকরা ২০ ভাগ দখল করে আছে মাছ চিত্র। Father Jeram প্রথম এ চিহ্নটির সাথে দ্রাবিড় শব্দ মীনের যোগসূত্র লক্ষ্য করেন। দ্রাবিড় শব্দ মীনের অর্থ 'মাছ' বা 'তারা'। Parpol সহ অনেক ঐতিহাসিকই এ শব্দটির ব্যবহারের তাৎপর্যে সহমত পোষণ করেছেন। সমুদ্রে যেমন মাছ সাঁতার কাটে তদ্রূপ মহাকাশে অসংখ্য তারকা বিচরণ করে বেড়ায়। তাই জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় আদি চিহ্নটিকে মৌলিক সংকেত ধরে নিয়ে এর সাথে অন্যান্য জ্যামিতিক সংকেত বা দাগ কেটে নিয়ে বিভিন্ন তারকা মণ্ডল বা গ্রহ্ উপগ্রহের পরিচিতি বের করা হয়েছিল এবং তাদের বাৎসরিক বা পর্যায়ক্রমিক গতি পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া হত। নিচে তাদের কিছু পরিচয় তুলে ধরা হল।

চিহ্ন	দ্রাবিড় নাম	বৈদিক বা পরবর্তী পরিচিতি	মন্তব্য
	আরুমীন	কৃত্তিকা	এ তারা মণ্ডলীতে অসংখ্য তারা থাকলেও খালি চোখে সাধারণত ছয়টি তারাই দেখা যায়।
	এলুমীন	সপ্তর্ষিমণ্ডল	এখানে সাতটি তারার উপস্থিতিই চিহ্নিত।
	পাকুমীন	বুধগ্রহ	আমবা সকলে বুধকে সবুজ গ্রহ বলে জানি। এ চিহ্ন দ্বারা বুধগ্রহকে চিহ্নিত করা হয়।
		মেমীন	কালো তারা। ভৌত ধর্মে কালো তারা বর্তমানে শনি গ্রহ রূপের সমতুল্য বলে বিবেচিত।
	ভেলমীন	সাদা তাবা	শুক্র গ্রহকে বুঝায়।
		লাল তারা	মঙ্গল গ্রহকে বুঝায।
	পোল কোল	সোনালী তারা	বৃহস্পতি গ্রহকে বুঝায়।

পূর্বে উল্লিখিত চিহ্নগুলো বেশ কিছু নক্ষত্র বা গ্রহের পরিচিতি বুঝালেও সাধারণভাবে গ্রহের প্রতীক বুঝাতে এই চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হত।

বটমীন (বটগাছ বা আকাশের তারা)	দিক নির্দেশিকা তারা। এ দ্বারা উত্তর দিক বুঝানো হয়েছে। এটাকেই বর্তমানে ধ্রুব তারা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। একে ভিত্তি করে যুগ যুগ বহু কল্প কাহিনী বা সংস্কার প্রচলিত আছে।

ভারতে প্রচলতি নক্ষত্র ক্যালেণ্ডারের ধারণা সিন্ধু সভ্যতার যুগে উন্নত জ্যোতির্বিদ্যা চর্চারই ফল বলে অনেক জ্যোতির্বিদ বা ঐতিহাসিক মনে করেন। সাধারণতঃ ১) মধ্য দিনের সূর্যের ছায়ার বিষুবীয় ও অয়নান্ত দৈর্ঘ্য নির্ণয়। (২) সূর্যোদয়ের ঠিক আগে তারকামণ্ডলীর সনাক্তকরণ। এগুলো ছিল তৎকালীন সময়ের যুগান্তকারী ঘটনা।

তাই কুরমীন ভোরের তারা সনাক্তকরণের মধ্য দিয়ে দিনের যাত্রা শুরু হত বলে Parpol অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পূর্বাকাশে কৃত্তিকার আগমনের মাধ্যমে বৎসারান্তের ধারণা প্রচলিত ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এ ধারণা উত্তমাশা অন্তরীপ অস্ট্রেলিয়া থেকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা পর্যন্ত স্বীকৃত ছিল। কৃত্তিকা দর্শনের সাথে সাথে উপরে বর্ণিত পাঁচটি গ্রহের যে কোন একটির

দিগন্তের উপরে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

কৃতাম, অপসরা ইত্যাদি তারার উপস্থিতির সাপেক্ষে চন্দ্রের অবস্থান নির্ণয় করা হত। এর সাহায্যেই চন্দ্রের প্রাত্যহিক পর্যায়গমন নির্ণয় করা সম্ভব। মাস গণনা চন্দ্রের বিভিন্ন তিথিতে উপস্থিতির দ্বারাই সূচিত হত। তবে চান্দ্র মাসের সাথে সৌর বৎসরের সাযুজ্যকরণ সে যুগে অবশ্যই সহজ কাজ ছিল না। সঠিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে চান্দ্রমাস এ সৌর বৎসর গণনার অসংগতি দূর করতে সিন্ধু যুগে কতকগুলো বেশী মাস বা দিন সংযুক্তির প্রচলন ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

 চিহ্নটির দ্বারা পাঁচদিনের সপ্তাহেব ধারণা জ্ঞাত করে বলে মনে হয়। ∩ দ্বারা একটি সপ্তাহ এবং উলম্ব রেখা দ্বারা পাঁচদিন নির্দেশ করত বলেই মনে করা হচ্ছে। এই পাঁচদিন সম্ভবতঃ চান্দ্র দিন। এ পাঁচদিনে একটি সপ্তাহের ধারণা কবা হয়েছে। এ রূপ ছয়টি সপ্তাহে এক চান্দ্র মাস গণনা করা হত বলে মনে করা যায়। অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে ছয় সপ্তাহে এক মাসের প্রচলন ছিল বলে অনেকে করে থাকেন।

মহাজাগতিক স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকা সত্ত্বেও খালি চোখে দেখে বিভিন্ন নক্ষত্র মণ্ডলের সনাক্তকরণ, নক্ষত্র করণ সাপেক্ষে চন্দ্রের অবস্থিতি এবং ইহা থেকে সহজ সরল পদ্ধদিতে ঋতু গণনা, পাঁচটি গ্রহ চিনে তাদের গতি পথ অবলোকন প্রভৃতি ছিল আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি। বৃষ্টি নির্ভর কৃষি কাজের সুবিধার্থেই মূলতঃ তৎকালীন যুগে জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষতা ঘটে থাকলেও অখণ্ড আকাশেব হাত ছানিতে তৎকালীন সময়েও মানুষ তার জ্ঞানের মান বৃদ্ধি করতে সক্ষমা হয়েছিল। তারই হাত ধরে বৈদিক যুগে বা তার পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় অভাবনীয় উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল।

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ঃ

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা মূলতঃ কৃষি অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। তবে উৎপাদনে উদ্বৃত্তের প্রমাণ পেলেও কৃষি ব্যবস্থার যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা বিতর্কিত মত পোষণ করেন। মাঠে সীতা (furrows) দাগ থেকে ঐতিহাসিক Salkalia মনে করেন— "কৃষি কাজে অবশ্যই লাঙ্গনের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এটা সম্ভবতঃ কাঠের তৈরী"। তবে লাঙ্গনের মাথায় কোন ধাতব পদার্থ অর্থাৎ ব্রোঞ্জ বা তামার কোন ফলক ছিল কিনা সে সম্পর্কে কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। কৃষি ক্ষেত্রে কাঠের লাঙ্গলের ব্যবহার হরপ্পার সভ্যতার পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বলে অনেকে মনে করেন। ঐতিহাসিক Despande র মতে "সমগ্র হরপ্পার সভ্যতা উদ্বৃত্ত কৃষি অর্থনীতিতে কুসুমিত হয়ে উঠে ছিল।"

সিন্ধু সভ্যতার যুগে কৃষিকাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিয়ে ঐতিহাসিক বা বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও এটা স্পষ্ট যে, "অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক নদী নালার জল ব্যবহার করে বা জলাভূমি সংস্কার করে সিন্ধুবাসীরা অফুরন্ত ফসল ফলাত।" প্রধান শস্য গম ও বার্লি বসন্ত কালে ফলত বলেই অনুমান করা হচ্ছে। মাঠ থেকে যখন প্লাবনের জল নেমে যেত তখন সে সকল শস্যের বীজ বপন করা হত আর মার্চ বা এপ্রিল মাসে তা ঘরে তোলা হত। আধুনিক কৃষি

ব্যবস্থায়ও এমন জমি আছে যেখানে লাঙ্গলের সাহায্য ব্যতীতই শস্যবোনা বা রোয়া হয়। সেসব জমিতে জল বা সারেব ব্যবহার দরকার হয় না। তাই ঐতিহাসিক Lambrikর মতে, "তৎকালীন সময়ে অনুসৃত সমস্ত কৃষি ব্যবস্থাতেই নৈপুণ্যের প্রয়োগ ছিল কম, স্বল্পমাত্রা পরিশ্রমও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ছাড়াই কৃষিকার্য পরিচালিত হত।" অপরদিকে শবৎকালীন ফসল হিসাবে তুলা ও তিল বীজ বপন করা হত। সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নদী নালার ধারে মাটি দিয়ে উঁচু পাড় বেঁধে এ সকল ফসল বপনকরা হত। বর্তমানেও তার প্রচলন আছে। এসকল প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের সাহায্যে এটা প্রমাণ করা যায় যে. সিন্ধু সভ্যতায় কৃষি ক্ষেত্রে উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার না করা হলেও অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে প্রকৃতিকে বশে এনে মানুষ তার বাঁচার তাগিদে অফুরন্ত ফসল ফলিয়েছে।

প্রয়োজনের তুলনায় প্রচুর উদ্বৃত্তেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবতার মন্দির সংলগ্ন শস্য ভাণ্ডার এবং মন্দিরের একদিকে বড় বড় প্রাসাদ ও কিছু দূরে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘবেব আবিষ্কারেব মধ্য দিয়ে সমাে" দুই শ্রেণীব মানুষের বসবাসের ইংগিত দেয়। সিন্ধু নগরায়ণ পরিকল্পনায় এটা স্পষ্ট যে পুরোহিত, রাজা ও বণিক শ্রেণী সমাজ পরিচালনা করতেন। আর কামাব, কুমোর, ইমারতী শ্রমিক — যারা এ নগব সভ্যতা বিকাশের স্থপতি, তাবা ছিলেন শাসক শ্রেণীর কাছে দায়বদ্ধ। তাদের অতিরিক্ত শ্রমের দ্বারা নগবের শস্য ভাণ্ডারগুলো শস্যের মজুত ভাণ্ডারে পবিণত হত। প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্য আজও চলছে শ্রমিক আর মালিক শ্রেণীর উদ্ভবে এবং এ দুইয়ের জীবন ধারায় আকাশ পাতাল পার্থক্যেব মাধ্যমে।

মৃৎশিল্প ঃ

সিন্ধু সভ্যতায় মৃৎশিল্পে উৎকর্ষতাব পরিচয় পাওয়া যায়। হাতে চালানো চাকার সাহায্যে মাটিব পাত্র তৈরী হত। কোনকোন ঐতিহাসিকের মতে পা চালানো চাকাবও অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। অধিকাংশ মাটির পাত্রই ছিল উজ্জ্বল ও চকচকে। মাটিব পাত্রের রং-এর ব্যবহার ছিল শিল্প নৈপুণ্যের আরেকটি দিক। সাধারণতঃ কাদার সাথে বালি ও চুন মেশানো হত। মাঝে মাঝে বিশেষ করে পোড়ানোর সময় মাইকাও মেশানো হত। তবে বালির সাথে একই খনিতে মাইকা থাকে বলে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত আলাদাভাবে মাইকা কমই মেশানো হত। রং ব্যবহারে খুব বেশী যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কারও কারওমতে শ্লেট কালার ব্যবহার করে পাত্রকে গাঢ় কালো করা হত। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে পোড়ামাটির পাত্রে বিভিন্ন রং ধরানো হত। তার কারণ ছিল পাত্রের মাটিতে উপস্থিত লৌহ মৌলের ফেরাস বা ফেরিক যৌগ বা কার্বনেট যৌগ তাপমাত্রার পরিমাণের উপর নির্ভব করে বিভিন্ন রং-এ পরিণত হতে পারে। সেই সময় লৌহ আবিষ্কৃত হয়নি। তাই সরাসরি লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে সিন্ধুবাসীদের কোন জ্ঞান ছিল না। তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সিন্ধুবাসীদের যে অভিজ্ঞতা ছিল তা ঐতিহাসিক Mackayব বক্তব্যে প্রকাশ পায় —

"মহেঞ্জোদাড়োর মৃৎপাত্রগুলো ভালভাবে পোড়ানো হত। পাত্রগুলোর দৃঢ়তা এবং রং-এর সমসত্বতা থেকে এটা স্পষ্ট যে পাত্রগুলো পোড়ানোয় মৃৎশিল্পীর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। বেশী পোড়ানো হয়েছে এরূপ কিছু ব্যবহৃত পাত্র দেখতে পাওয়া গেছে। কম পোড়ানো হয়েছে বা পোড়ানো হয়নি এমন কোন বা তদ্রূপ কোন পাত্র পাওয়া যায়নি। তবে এব্যাপারে প্রমাণের যথেষ্ট ঘাটতি আছে।"

আগুনে পোড়া মাটির তৈরী দ্রব্যাদিই টেরাকোটা নামে পরিচিত। এগুলোর অধিকাংশ খেলনা বা উপাসনার বস্তু ছিল। পাখী, কুকুর, ভেড়া, বানর প্রভৃতির মূর্তিও পাওয়া গেছে। বেশ কিছু পাত্রে মানুষের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। তবে পুরুষের তুলনায় নারী মূর্তির সংখ্যাই বেশী। এ সকল মূর্তির ব্যবহৃত কলাকৌশল সম্পর্কে ঐতিহাসিক Mackayর মতামত হল —

"সিন্ধুবাসীরা মৃৎশিল্পে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকলেও টেরাকোটার কাজগুলো ছিল নেহাতই মামুলি ধরনের। এই দুই রকম মানের কাজ থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, দুই শ্রেণীর লোক দুই ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহার করত। প্রথমটি সাধারণতঃ ধনিক সম্প্রদায়ের এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ টেরাকোটা ব্যবহার করত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ।"

বস্ত্র শিল্পের উদ্ভব ঃ

হরপ্পায় একখণ্ড বোনা কাপড়, টাকু এবং ববিন প্রাপ্তির মাধ্যমে সিন্ধু উপত্যকায় নগরায়নে বিজ্ঞানের অবদান দৃঢ় ভাবে প্রমাণিত হয়। সূতা তৈরী ও কাপড় বোনা প্রায় বাড়ীতেই ছিল বলে ঐতিহাসিক Marshall মনে করেন। গাছের রসে লাল রং-এ রঞ্জিত কাপড়ে টুকরো প্রাপ্তি সম্পর্কে Marshall বলেন —

"যে আঁশযুক্ত বস্তু থেকে সূতা কাটা হত তা বনজ সম্পদ ছিল না। তা কৃষি দ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন করা হত। তাতে মনে হচ্ছে বর্তমানে যে তুলা, পাট উৎপন্ন হয় সিন্ধু সভ্যতা কালেই তার উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল।" বম্বের Technological Reaserch Lab প্রাপ্ত কাপড়ের টুকরায় ব্যবহৃত সূতার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে অধিকর্তা Turner যে তথ্য পেয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

"সূতাগুলো ছিল কাঁচা (অপক্ক) তুলা থেকে সংগৃহীত এবং অল্প চাপেই ছিঁড়ে যেত। তবে তুলার গঠনগত বৈশিষ্ট্য জানার স্বার্থে একদিকে তিন ইঞ্চি ও একদিকে এক ইঞ্চি পরিমাণ টুকরা নিয়ে একটা বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

১) সূতা	ঃ	তুলা থেকে তৈরী
২) সূতার ওজন	ঃ	প্রতি বর্গ গজে ২ আউন্স
৩) দুমড়ানো ও পেচানো সূতার সংখ্যা	ঃ	৩৪ কাউন্ট
৪) প্রাপ্ত দুমড়ানো সূতা	ঃ	ইঞ্চি প্রতি ২০ কাউন্ট
৫) প্রাপ্ত পেঁচানো সূতা	ঃ	ইঞ্চি প্রতি ৬০ "

তবে কোথায়ও কোন লুম (loom) এর নির্দশন পাওয়া যায়নি। মনে হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী বস্তু দিয়েই এগুলো প্রস্তুত করা হত। কোন লুমের নির্দশন পাওয়া যায়নি বলে বলা যাচ্ছে না উলম্ব বা সমান্তরাল বা গোলাকার লুম ব্যবহৃত হত কিনা। সূতা সেলাইয়ের সুঁচের ন্যায় যন্ত্রের অস্তিত্ব না পাওয়া গেলেও অন্যান্য উন্নত যন্ত্রাংশ প্রাপ্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিকরা মনে করেন সম্ভবত হরপ্পায়ই তুলা বা তদ্রূপ বস্তু থেকে কাপড় বোনা ও কাটা কাপড় তৈরী শিল্পে পৃথিবীর অগ্রদূত।

যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

মাটির পাত্র তৈরীর ক্ষেত্রে চাকার ব্যবহার সম্বন্ধে সিন্ধুবাসীদের জ্ঞান থেকে এটা বুঝা কষ্টকর নয় যে এরূপ চাকার ব্যবহার তারা অন্যত্রও করতে পেরেছিল। টেরাকোটার গরু দ্বারা গাড়ী টানা বা হাতে টানা ঠেলা গাড়ীর চিত্র বা মডেল থেকে এটা বুঝা যায় সিন্ধুবাসীরা স্থলপথে যাতায়াতের জন্য বা মাল বহনের জন্য গরুর গাড়ী ব্যবহার করত। আবার ঠেলা গাড়ীর সাহায্যে একস্থান থেকে অন্যত্র মাল বয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল না। টেরাকোটার মডেল বা চিত্র বা হরপ্পার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেস থেকে কোন কোন ঐতিহাসিক এ সকল যানবাহনের যেসকল মডেল বানিয়েছেন, তা সিন্ধু-প্রদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত যানবাহনগুলোর অনুরূপ। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক Piggot-এর বক্তব্য হল

"বেশী পরিমাণ পরিবহণের জন্য হরপ্পায় গরুর গাড়ী ব্যবহার করা হত। মাটির তৈরী গাড়ীর নমুনাগুলোর ন্যায় অনুরূপ গাড়ী পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এবং এ ধরনের গাড়ীর গিয়ারবর্জিত চাকার বিশেষ ধরনের শব্দ মহেঞ্জোদাড়োর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে শোনা যেত। হরপ্পা শহরে খননের ফলে প্রাপ্ত ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত গাড়ীর চাকা সাম্প্রতিক কালে সিন্ধুপ্রদেশে ব্যবহৃত গাড়ীর চাকার অনুরূপ। এ থেকে এটা স্পষ্ট হরপ্পায় ব্যবহৃত গাড়ীর ধরণ আজও বিশেষ পরিবর্তিত হয়নি। তৃতীয় শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে উদ্ভাবিত গাড়ীর প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক স্থলযানের যাত্রা ঘটলেও হরপ্পায় ব্যবহৃত যানগুলোর বাস্তবতার দিক থেকে মূল্য অপরিসীম।"

স্থলযানের মত জলযানের ক্ষেত্রেও সিন্ধুবাসীরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিল বলেই অনেকেই মতামত দিয়েছেন। নদী পথে নৌকার সাহায্যে যাত্রী ও মালপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত বলে অনুমান করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার — যেমন খোলা নৌকা ও একপাশে বসার জায়গা বিশিষ্ট নৌকা বা মধ্যখানে বসার জায়গা বিশিষ্ট নৌকা ব্যবহার হত বলে ঐতিহাসিক S R Rao অনেক প্রমাণ রেখেছেন। এছাড়া সমুদ্রেও বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত। যাতায়াতের সুবিধার জন্য নৌকার গঠন ও বিভিন্ন প্রকার ছিল।

এ সকল ব্যবস্থা সমন্বিত নৌকাগুলোর কোন কোনটা সমুদ্রে চলাচল করত, আবার আকারে ছোট নৌকাগুলো নদী বা ছোট ছোট জলাভূমিতে যাতায়াত করত। Rao বর্ণিত সিন্ধু সভ্যতার নৌকার সাথে বর্তমানে ব্যবহৃত নৌকার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া লোথালে নৌকা নোঙরের কাজে ব্যবহৃত বৃত্তাকার বা ত্রিভুজাকার অনেক পাথর খণ্ড নদী বা সমুদ্র পথে নৌকার ব্যবহারের নির্দশন প্রমাণ করে। নৌকাগুলোর বিবরণ দিতেগিয়ে S. R. Rao বলেন, "কোন কোন নৌকার অগ্রভাগ খুব সুঁচালো ছিল। মধ্যভাগ খুব দৃঢ়। এক দড়িতে টানা হত। তিন পা বিশিষ্ট মাস্তুল ছিল। এদের একটি বা দুটিকে দেখা যেত। তৃতীয়টি গুটানো থাকত।" আবার কোন কোন নৌকা "ধারালো কিল, সুঁচালো অগ্রভাগ ও দৃঢ় চেপ্টা মধ্যভাগ" এভাবেও বিভক্ত থাকত। এই তিন জায়গায় তিনটি ছিদ্র বিশিষ্ট ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া গেছে। নৌকার ধারে যে ছিদ্রের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া গেছে তা দিয়ে মাস্তুল, পাল ও দাঁড় আটকানোর ব্যবস্থা ছিল বলে ঐতিহাসিক রাও মনে করেন।

পাথরের উন্নত শিল্প ঃ

সিন্ধু সভ্যতায় তাম্র ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হলেও পূর্ববর্তী যুগের পাথরের ব্যবহার কিন্তু থেমে থাকেনি। বরং সিন্ধু সভ্যতা যুগে আরও উন্নতভাবে তৈরী পাথরের বাসনপত্র ব্যবহারের নির্দশন খুঁজে পাওয়া গেছে। চকমকি পাথরের ফলকগুলো লম্বা ও আয়তাকার ছিল। তাদের নির্মাণ কৌশল প্রস্তরযুগের শেষের সময় থেকেই চলে আসছিল বলে মনে করা হচ্ছে। সুক্কুরে আবিষ্কৃত পাথরের ফলক তৈরীর কারখানা দেখে অনুমান করা যায় "এখানের তৈরী পাথরের ফলক হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, লোথাল প্রভৃতি অঞ্চলে নেওয়া হত, বিভিন্ন প্রকার নিখুঁত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্যাদিতে এ সকল পাথরের দ্রব্যাদি তৈরী করার জন্য।" প্রেসার ফ্লেকিং বা crested ridge পদ্ধতিতে এ সকল পাথরের দ্রব্যাদি তৈরী করা হত বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

কিন্তু ঐতিহাসিক Mackayর মতে পাথরের ফলক তৈরীতে "তেমন কোন কলাকৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলতঃ সুক্কুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত চুনা পাথরের আঁশ থেকে এ সকল ফলকগুলো তৈরী করা হত। কারিগররা কিছু অভিজ্ঞতার দ্বারাই এ কাজ আয়ত্ত করতে পারত।" তবে Allchins এর মতে "ফলক কারখানা সে সময় একটি উন্নত পেশাগত কারখানা ছিল এবং কারিগররা বিশেষ পারদর্শিতা দেখানোর যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও কাজগুলো অনায়াসেই করতে পারত।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে সিন্ধুনগর সভ্যতা পূর্ণতা প্রাপ্তির মুহূর্ত থেকেই বিশেষ বিশেষ শিল্প পারদর্শিতা অর্জিত হতে থাকে। প্রচুর সংখ্যক পাথরের তৈরী যাঁতা আবিষ্কারে এটা প্রমাণ করা যায় যে হরপ্পাবাসী কৃষিক্ষেত্রে খুব স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এ যাঁতাগুলো উত্তলাকার। সম্ভবত গ্রানাইট, ব্যাসাল্ট ও বেলে পাথর থেকে এ সব যাঁতা তৈরী করা হত। একটি উপর আর একটি যাঁতা বসিয়ে শস্য পেষা হত। উপরেরটির মধ্যখানে একটি ছিদ্র করা হত।

ঐতিহাসিক Rao এরূপ একটি যাঁতা খুঁজে পেয়েছেন যাতে দেখা যাচ্ছে "উপরের যাঁতার কোন এক জায়গায় একটি অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্র ছিল। তার মধ্য দিয়ে শস্য দানা পেষার জন্য দেওয়া হত এবং অন্য পথে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিদ্র দিয়ে একটি সমান্তরাল শক্ত কাঠির সাহায্যে উপরের যাঁতাটি ঘুরানো হত।" এতে কম বেশী পেশী শক্তি ব্যবহার করে শস্যদানা চূর্ণ করা যেত। এ ধরনের পাথরের তৈরী ঘূর্ণায়মান যাঁতা আবিষ্কার সিন্ধু সভ্যতার কালে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানে উৎকর্ষতারই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তবে পাথরের বাসনপত্র তৈরীতে হরপ্পাবাসীরা ততটা নৈপুণ্যের প্রমাণ রাখতে পারেনি। অ্যালাবাস্টার, চুনা পাথর প্রভৃতি নরম পাথর থেকে এ সকল বাসনপত্র তৈরী করা হত। সম্ভবত নলাকৃতি ছেদন যন্ত্রের সাহায্যে ভেতরের খাঁজকাটা হত। এ সকল বাসনপত্রে শুষ্ক বা তৈল সমৃদ্ধ খাবার রাখা হত। সিন্ধু সভ্যতা তামা ও ব্রোঞ্জের সভ্যতা রূপে চিহ্নিত হলেও সে সময়ও পাথরের দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হত এবং ব্যবহৃত পাথরের দ্রব্যে উন্নত কারিগরী শিল্পের প্রভাব বিজ্ঞানের উৎকর্ষতাই প্রমাণিত।

সীলমোহর ঃ

সিন্ধু সভ্যতার সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প নির্দশন অবশ্যই সীলমোহর। এখন পর্যন্ত প্রায় ২০০০টি সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের অধিকাংশের গায়ে ছোট ছোট লিপি খোদাই করা আছে। অবশ্য লিপিগুলোর

পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি। তাছাড়া আছে ষাঁড়, মহিষ, বাঘ, গণ্ডার ছাগল ও হাতির মত প্রাণীর প্রতিকৃতি। এ ২০০০ সীলমোহরের প্রকার ভেদ বিভিন্ন। কোনটি গোলাকার বা বর্গাকার যার পেছনের দিকে ছিদ্রযুক্ত সমুন্নত কারুকার্য সমৃদ্ধ । এছাড়া কারুকার্য বিহীন বর্গাকার, ঘনকাকার, উত্তলপৃষ্ঠ যুক্ত আয়তাকার ইত্যাদি প্রায় দশ প্রকারের সীলমোহর পাওয়া গেছে।

এগুলো সাধারণতঃ কাদামাটি ও বিটুমিনের ন্যায় নরম পদার্থ দিয়ে তৈরী হত। কারিগররা নির্দিষ্ট আকার ও আয়তনের সীল অলিখিত বা না খুঁদিয়ে রেখে দিত। জনসাধারণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট আকারের সীলমোহরে তাদের ইঙ্গিত অনুলিপি বা চিত্রাঙ্কন করতেন। ঠিক যেমন বর্তমান যুগে শ্বেতপাথরের ফলক বা মোজাইক প্লেট বাজারে ক্রয় করতে পাওয়া যায়।

এ সকল সীল ফলকের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে Sanaullah যে সকল উপাদান সনাক্ত করতে পেরেছিলেন তাদের শতকরা হিসাব নিম্নে দেওয়া হল ঃ

বালু	৬১.২ শতাংশ
অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহের অক্সাইড	২.৪ শতাংশ
ম্যাগনেশিয়াম	৩৪.৬ শতাংশ
জল	১.৮ শতাংশ
মোট	১০০ শতাংশ

উপাদানগুলোর রায়াসনিক ধর্ম সম্বন্ধে কারিগরদের কোন পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় না পাওয়া গেলেও অভিজ্ঞতার নিরিখে তারা অজৈব পদার্থ ব্যবহারে যে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল তা উন্নত বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞানেরই পরিচায়ক।

উন্নত পুঁতি শিল্প ঃ

সিন্ধুবাসীরা পুঁতি তৈরীতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনুমানকরা হচ্ছে আধুনিক ভারতের উন্নত অলংকার শিল্পের উৎপত্তি তখন থেকেই ঘটেছিল ঐতিহাসিকরা মনে করেন হরপ্পার নারীরা নানা প্রকারের অলংকার পড়তে খুব ভাল ভাসতেন। ঐতিহাসিক Mackayর মতে "পুঁতি তৈরী ছিল ভারতের আদি কারুশিল্পের শ্রেষ্ঠ নির্দশন। পুঁতি তৈরীর কাঁচামাল সুলভে পাওয়া যেত বলেই এই শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল"। পরবর্তী সময়ে Allchinরা এই মতের সমর্থন করেছেন। গোলাকার, আয়তাকার, চাকার দাঁতের মত, নলের ন্যায়, কারনেলিয়ান আকৃতি সহ বিভিন্ন আকারের পুঁতির নির্দশন পাওয়া গেছে।

এ সকল পুঁতি সাধারণত নরম পাথর, বিভিন্ন প্রকার আঠালো বস্তু, লাইম স্টোন, সোনা, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি থেকে তৈরী হত। নির্মাণ কৌশলে কারিগরি পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক Wheelerর মতে "ছানচুরোতে একটি পুঁতি তৈরীর দোকানের নির্দশন পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে এটা স্পষ্ট পুঁতি কাটা, গুঁড়ো করা, বিভিন্ন স্তরে সাজানো বা ছিদ্র করা প্রভৃতি কারিগরি কাজকর্ম এর সাথে লিপ্ত ছিল। তবে কাজটি ছিল অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ।

পাথরগুলোকে প্রথমে গুঁড়িয়ে বড় আয়তাকার দণ্ডে পরিণত করা হত। তারপর তাকে ছোট ছোট গোলাকার স্তরে পরিণত ও মসৃণ করা হত। পরে ব্রোঞ্জ বা অন্য কোন ছেদক দিয়ে ছিদ্র করা হত। এগুলো ছিল পুঁতি তৈরীর সাধারণ কলাকৌশল। এছাড়া পুঁতিশিল্প এত বেশী বিকশিত হয়েছিল যে অনু ক্ষুদ্র আকারের পুঁতি নির্মাণ কৌশলে ও হরপ্পাবাসীরা যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন। এ অনুক্ষুদ্র পুঁতির ব্যাস .০২৬ থেকে .০২১ ইঞ্চি। তাব চেয়েও ক্ষুদ্র যাদের ব্যাস .০০৮৩ থেকে .০১০২ ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সেরূপ ছয়টি পুঁতির রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় ৫:১ অনুপাতে টেলক ও কোয়ালিনাইটের মিশ্রণ দিয়ে এ সকল পুঁতি তৈরী করা হয়েছে। প্রাপ্ত পুঁতির মধ্যে সুক্ষ্ম ও উন্নত কারুশিল্পের নির্দশন খুঁজে পাওয়া যায়। অনুক্ষুদ্র পুঁতি নির্মাণ কৌশলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে কঠিন না হলেও কঠোর শ্রম ও নৈপুণ্যের প্রয়োজন ছিল। K.T.M. Hegal-এর মতে এরূপ একটি কারখানা পরিচালনা করতে নিগুজন দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন হত। "একজনে আঠা জাতীয় রাসায়নিক বস্তুগুলোকে নিস্পেষণের কাজে নিযুক্ত থাকত। দ্বিতীয় জন নরম টিউবগুলো কাটত এবং তৃতীয় জন একটা ভাল শুকনো চাইয়ের পাত্রে ঐ দানাগুলো সংগ্রহ করত। তারপর ঐ সকল অনুক্ষুদ্র দানাগুলো ৯০০ থেকে ১০০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হত"।

কারনেলিয়ন পুঁতি নামে বপ্তানিযোগ্য পুঁতি নির্মাণেও হরপ্পার শিল্পীবা যথেষ্ট পাবদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। এগুলো বিভিন্ন রংবেবং ও নক্শা কাটা সমৃদ্ধ ছিল। এরূপ তিন ধরনের পুঁতির নির্দশন পাওয়া গেছে।

(১) লালের পিঠে সাদা (২) সাদাব পিঠে কাল (৩) পাথরের উপর সারি সারি নক্শা কার্য। Sankaliaব মতে পুঁতি তিনটি তৈরীব জন্য ভিন্ন নির্মাণ কৌশল ছিল। পটাশ, সাদা সীসা এবং কিরাল বুশের (Kiral Bush) ঘন তরল দিযে প্রথমটি তৈরী করা হত। কারখানার চুল্লীতে উত্তপ্ত করে শক্ত দৃঢ় ও মজবুত করা হত। দ্বিতীয়টির বেলায় প্রথমে এলকালাইন পদার্থের একটি সাদাতল তৈরী করা হত। তারপর তামা বা ম্যাঙ্গানিজের কোন সুচালো রড় দিয়ে সাদা তলের উপব দাগ কাটা হত। তৃতীয়টির ক্ষেত্রে পুঁতির গায়ে সবাসরি কালো নক্শা কাটা হত। নানা নৌলের ব্যবহারেব অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে না যে হরপ্পাবাসীবা প্রকৃতি বিজ্ঞানের অঙ্গ হিসাবেই রসায়ন শাস্ত্র বিষযে চর্চা করত কিনা।

ধাতব শিল্পের বিকাশ ঃ

সিন্ধু সভ্যতার উন্নত প্রস্তর যুগের প্রভাব উন্নত শিল্প বিকাশে পরিলক্ষিত হলেও সিন্ধুবাসীদের কাছে এটা ছিল অনেকটা হারিয়ে যাওযা শিল্পের রেশ। এ সময় ধাতুর ব্যবহার ছিল শিল্প বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ। এসব ধাতব পদার্থ শুধু শক্ত ও নমনীয়ই ছিল না টেকসই, দৃঢ় ও মজবুতও ছিল। ব্যবহৃত ধাতব শিল্প সমাজ বিকাশের একটা উন্নত পাথেয় হিসাবে গর্বের দাবী রাখে। সমাজের উৎপাদন পদ্ধতিতে উন্নত কারণসহ বিশেষ বিশেষ শিল্পে পারদর্শিতা অর্জনে সমর্থ হল এবং বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক সূত্র প্রতিষ্ঠায় জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হল। ফলে নগরায়নের বেগ ত্বরায়িত হতে থাকল এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রকৌশল উদ্ভূত হতে লাগল।

প্রথমদিকে দেশীয় তামা পাথর রূপেই ব্যবহৃত হত। এসকল পাথরখণ্ডকে ছোট ছোট টুকরায়

পরিণত করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহার করা হত। সাধারণতঃ প্রথম দিকে হাতুরীর সাহায্যেই এ সকল পাথরের টুকরা থেকে যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে আকরিক থেকে ধাতু গলানোর পদ্ধতির মাধ্যমেই মূলত ধাতব শিল্পের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। এভাবে ধাতু গলানোর পদ্ধতি ছিল খুব জটিল এবং কিছুমাত্র কেন্দ্রেই এই উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

অ্যানাটোলিয়া, আরমেনিয়া থেকে আফগানিস্তান পার্বত্য অঞ্চলগুলো খনিজ পদার্থে ভরপুর ছিল। এ অঞ্চলে উন্নত মানের কাঠকয়লাও পাওয়া যেত। তাই স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলটা ছিল ধাতব শিল্প বিকাশের অনুকূল। তাল-ই-ইব্লিসে ৪০০ সালের আবিষ্কৃত গলানো যন্ত্রপাতি থেকে এটা অনুমান করা যায় যে সিন্ধু উপত্যকায় এ অঞ্চলের প্রভাবেই উন্নত ধাতব শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল।

মহেঞ্জোদাড়োর ডি. কে. মাউণ্ডে অধিক খননের ফলে যে ১৪টি বর্শার ফলক, ৬৪টি ছুরি, ২৩টি কুড়াল, ২টি তরবারি, ২টি করাত, ১৮টি তীরের ফলক এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্যাদি আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত উন্নত ধাতব শিল্পের মাধ্যমে সিন্ধুবাসীরা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে একটা দারুণ ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়েছিল শুধু তাই নয়, এ শিল্প তৎকালীন সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিল। হরপ্পা নগরায়নেও বিকাশমান ধাতব শিল্প অনুরূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়েছিল।

এখন যে প্রশ্নগুলো স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনকে আন্দোলিত করে সেগুলো হল এরকম

i) "হরপ্পাবাসীরা কি গলানো তামা ব্যবহার করত?

ii) কি ধরনের আকরিক ব্যবহৃত হত?

iii) শংকর ধাতুর ব্যবহার করত কিনা?

iv) কি ধরনের শিল্প প্রযুক্তি ব্যবহৃত হত?

v) কোন খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল কি? --- ইত্যাদি"

হরপ্পায় প্রাপ্ত তামার আকরিকে সীসা, আর্সেনিক, বিসমাথ, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ধাতব পদার্থ অপরিশোধিত আকারে পাওয়া গেছে। কিন্তু ব্যবহৃত ক্ষেত্রী আকরিকেই এ ধরনের অপরিশোধিত পদার্থ পাওয়া যায়। ইহা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে হরপ্পাবাসীরা বিহার অঞ্চলের আকরিক স্থলে রাজস্থানের আকরিক ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। তবে ইহা একটা অনুমান বিশেষ। কেননা, তৎকালীন সময়ে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো সঠিকভাবে নির্ণয় করা এখনও সম্ভব হয়নি। রাসায়নিক বিশ্লেষণের পর দ্রব্যগুলোতে প্রাপ্ত খাদের উপস্থিতি ও দ্রব্যাদির ধরণের সাযুজ্য দেখে খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একটা অনুমানের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে এবং বর্তমান আফগানিস্তান ও ইরাণের উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চলকে খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চল রূপে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

উপরিউক্ত রাসায়নিক বিশ্লেষণে খাদ হিসাবে বিভিন্ন খনিজ পদার্থে অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেও একমাত্র মিশ্রিত ব্রোঞ্জের সংকর ধাতু ব্যতীত অন্য কোন সংকর ধাতুর প্রচলনের কোন প্রমাণ

পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ (৮-১২)% টিন মিশ্রণে যে সংকর ধাতু তৈরী হয় তা শক্ত সমৃদ্ধ, মসৃণ ও উজ্জ্বল হয়। প্রায় ১৭৫টি রাসায়নিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে মিশ্রণগুলো ছিল প্রায় নিম্নরূপ

"টিনের শতকরা হার -	< ১ %	<	৮%	(৮-১২)% >	১২%
যন্ত্রপাতির শতকরা হার -	৭০%		৮১%	১৪%	৬০%

উপরের তালিকা থেকে দেখা যায় অধিকাংশ যন্ত্রপাতি তামা থেকে নির্মিত। (৮-১২)% টিন মিশ্রিত ব্রোঞ্জের যন্ত্রপাতির পরিমাণ ১৪%। এতে অনুমান করা যায় সিন্ধু উপত্যকার টিনের শুধু ঘাটতিই ছিল না, সিন্ধুবাসীদের টিনের মিশ্রণে সংকর ধাতু তৈরীতেও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবও ছিল।

হরপ্পায় ধাতু নির্মিত যন্ত্রপাতি ছিল সাধারণ অকারের। এমনকি বর্শার ফলক, ছুরি প্রভৃতিও ছিল সরু ও সমতল ধরনের। তবে মাছ ধরায় হুক নির্মাণ কৌশলে তারা যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। তাছাড়া গৃহস্থালী কাজে ব্যবহৃত পাত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি হাপরের সাহায্যে পুড়িয়ে এবং পিটিয়ে তৈরী করা হত। মহেঞ্জোদাড়ো ও লোথালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের নৃত্যরতা লাস্যময় নারীমূর্তি হরপ্পা সভ্যতায় ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ থেকে প্রমাণিত যে হরপ্পা ও সিন্ধুবাসীরা উন্নত ব্রোঞ্জ শিল্পকলায় পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছিল।

আবহাওয়ার প্রভাব ঃ

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে এটা প্রতীয়মান যে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হত। ফলে উপত্যকা খাল, বন, জলাভূমিতে সমৃদ্ধ ছিল। গরম ও আদ্র আবহাওয়া বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর জীবন ধারণের অনুকূল ছিল। বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া, জলাভূমি প্রভৃতি কৃষিকাজের উপযোগী ছিল বলে প্রচুর পরিমাণ কৃষি শস্য উৎপাদিত হত। প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হত। এ উদ্বৃত্ত শস্যই মূলত সিন্ধু উপত্যকায় ভারতের প্রথম নগর সভ্যতা বিকাশে সহায়ক উপাদান ছিল। উদ্বৃত্ত শস্য যেমন একদিকে নগর সভ্যতা বিকাশের পথ উন্মুক্ত করেছিল, তদ্রূপ অধিবাসীকে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায়ও উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার ফলে অধিবাসীগণ একদিকে যেমন গণিত ও জ্যোতিষ চর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল তদ্রূপ কৃষিকাজ, মাছ ধরা, শিকার প্রভৃতি কাজের সহায়ক যন্ত্র পাতি নির্মাণে ভারতে প্রথম ধাতব শিল্পের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এত উন্নতি সত্ত্বেও একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতাকালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল কি? সাধারণতঃ উন্নত ধাতব শিল্প বিকাশের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্ফূরণ বা বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত নির্দশন থেকে কেহ কেহ মনে করেন যাদু বিদ্যা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বা দেব দেবীতে বিশ্বাসই নগর সভ্যতা বিকাশে মুখ্য ভূমিকা ছিল। তবে ঐ মতপুরোপুরি সর্বজনস্বীকৃত নয়। কেননা, জীবন-জীবিকার প্রশ্নে যাদু বা ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হলেও প্রয়োজনেরও তাগিদে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় তারা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। তাদের এ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ছিল অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। প্রকৃতি বিজ্ঞানের কোন সূত্রের সন্ধান আজও পাওয়া যায়নি বলেই এটা বলা যায় না প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে সিন্ধুবাসীদের জ্ঞানের অভাব ছিল। প্রাপ্ত শীলমোহরগুলোর পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে হয়তো

একদিন প্রাকৃতিক সূত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হবে। কারও কারও মতে দ্বিতীয় নগরায়ন সময়ই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব। ঐ বক্তব্যকে মেনে নিলেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রথম নগরায়নের সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঠিক বিকাশ না ঘটলেও সে সময় মানুষের কাজে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় যে নির্দশন পাওয়া গেছে তা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় দ্বিতীয় নগরায়নের সময় বিকশিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল প্রথম নগরায়নে বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে।

(ঘ) আর্যদের আবির্ভাব ঃ ঋক্‌বেদের যুগ

কাল ঃ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির যে সাক্ষ্য আমি পাঠকদের সামনে রাখলাম তাব উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সুযোগ না দিয়ে, ধ্বংসের পথে ঠেলেছিল যারা, তাদের জীবনযাত্রা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে বক্তব্য রাখাই হল বর্তমান অংশের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সেখানে বিদেশীদের আক্রমণকে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র এবং বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্রে ভিন্ন দেশের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে ইরাণে ব্যবহৃত মাটির পাত্রের সাথে ঐ গুলোর সাযুজ্য দেখে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এ'ভিনদেশীরা সম্ভবতঃ ইরাণ বা তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে সিন্ধু উপত্যকায় এসেছিল। তারাই ইতিহাসে আর্য নামে পরিচিত। ঋক্‌বেদেও তাদের উল্লেখ আছে। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আল্পস্ পর্বতের পূর্বদিকের ইউরোপীয় অঞ্চলেই ছিল আর্যদের সম্ভাব্য আদি বাসস্থান।

আপনাদের কেহ কেহ বলেন, ভোল্গা নদীর তীরে অরণ্য তুষার সমাচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানব গোষ্ঠীর পদধ্বনি শোনা গিয়েছিল তারাই ক্রমান্বয়ে ভোলগার তট থেকে অগ্রসর হতে হতে পামির ও উত্তর কুরুতে তাদের বসতি স্থাপন করল। যাযাবর জীবিকাই তাদের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। ভারতবর্ষে আসার আগে তারা সম্ভবতঃ ইরাণে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। তাই ইরাণ থেকে ভারতে আসাটাই ছিল স্বাভাবিক। হরপ্পা সভ্যতার আমলে যে পূজা অর্চনার সূত্রপাত ঘটেছিল, ঋকবেদ কালে তা বেশী মাত্রায় প্রকাশিত হতে লাগল। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে জ্ঞানের ঘাটতি থাকায় প্রথম যুগের আর্যরা প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার কাল্পনিক কাল থেকে কিছু দেব দেবীর প্রতিষ্ঠা শুরু করল। এবং ঋক্‌বেদের কাল থেকে এ'সকল দেব দেবীর স্তুতির জন্য কিছু মন্ত্র ও প্রচলিত হল। এ'সকল ঘটনা প্রমাণ করে আর্যরা ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় বেশী উৎসাহী ছিলেন না। তবে সে সময় থেকে তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক ঘটনা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও চর্চা শুরু হয়।

তবে যে নামেই দেবতাদের স্তুতি করা হউক না কেন বৈদিক মতে 'বিশ্ব এক' এবং ভগবান 'একমেবাদ্বিতীয়তম''। ভিন্ন কাজে তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায় মাত্র। তাই কবি লিখেছেন-

"They call him Indra Mitra Varuna And Agni. He is the heavenly bird Garutmat. To what is one, the poets give many a name. They call it Agni Yama Matarisven".

আর্যরা সাধারণতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। পরিবর্তিত আকারে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাই ইউরোপ, ইরাণে ও ভারতে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। ঋক্‌বেদেও ইন্দো ইউরোপীয় ভাষায় রচিত ভারতীয় প্রথম গ্রন্থ। অগ্নি, মিত্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে বহু কবি ও সন্ন্যাসী যে প্রার্থনা মন্ত্র রচনা করেছিলেন, ঋক্‌বেদ তারই সংকলন। ইরাণী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ আভেস্তার সঙ্গে ঋক্‌বেদের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আর্যরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভারতে এসেছিল। প্রথম আর্যদের দলটি ঋক্‌বেদের সমসাময়িক। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি তারা ভারতে বসবাস শুরু করে। পশুপালন তাদের মুখ্য জীবিকা

ছিল। ঋক্‌বেদে 'গোরু' শব্দটির বহুল ব্যবহারে এটা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে গরুই তাদের জীবিকার অন্যতম উপাদান ছিল। ঋক্‌বেদে গাভিস্থি শব্দটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। তার অর্থ গো অন্বেষণ। গরু হারিয়ে গেলে গরু অন্বেষণে বের হয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যেত। তাই 'গাভিস্থি' শব্দটির দ্বারা গরুর জন্য সংঘর্ষকেও বুঝান হয়েছে ঋক্‌বেদে।

'ঋক্‌বেদে' লাঙ্গলের ফলার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলাটি কাঠের তৈরী ছিল বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে এ ধরনের ফলার ব্যবহার সিন্ধু সভ্যতায়ও দেখতে পাওয়া যায়। শস্য কাটা, মাড়াই করা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ছিল। ঋতু সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান ছিল বলে ঋক্‌বেদে উল্লেখ আছে।

তারা তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরী উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের ঘাটতি থাকায় এ সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না।

ছুতোর, রথ নির্মাণ, তাঁত, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি কারিগরি জ্ঞানে আর্যরা যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিল বলে ঋক্‌বেদে উল্লেখ আছে। তবে নগরায়ন বা স্থায়ী বসতি স্থাপন তাদের জীবনযাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। অতি সম্প্রতি হরিয়ানার ভগবানপুরায় যে নির্দশন পাওয়া গেছে তা থেকে ঐতিহাসিকরা ঋক্‌বেদের যুগকে প্রাক্ লৌহযুগের অধ্যায় রূপে চিহ্নিত করেছেন।

এ সময়ে আর্যদের দ্বারা বিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন খুঁজে না পাওয়ায় মনে হয় চাষবাস, কামার, কুমোর প্রভৃতি কাজে স্থানীয় সিন্ধুবাসীদের কাছ থেকেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। তবে ঋক্‌বেদই হল সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নির্দশন। এ সময়ের আর্যরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রকৃতিকে মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করতে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তারা ছিল প্রকৃতির দাস। সে জন্য প্রকৃতিকে বিভিন্ন পূজার্চ্চনার মাধ্যমে তুষ্ট রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকত। ঋক্‌বেদে বর্ণিত শ্লোকগুলোর অর্থও মূলতঃ তাই। তবে এটা সত্য যে এ শ্লোকগুলোর মধ্যে প্রকৃতির নিগূঢ় তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। আধুনিক গবেষণায় এটা প্রমাণিত ঋক্‌বেদের প্রতিটি শ্লোকই প্রকৃতির কোন না কোন ঘটনা নিয়ে রচিত যে গুলোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অনেক সূত্রের পূর্বসুরী রূপে শ্লোকগুলো স্বীকৃতি পাচ্ছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঋক্‌বেদে ঋত শব্দটি ৪৫০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল জিনিষের সামঞ্জস্যপূর্ণ গতি প্রকৃতি। এ সম্পর্কে দার্শনিক রাধাকৃষ্ণাণ বলেন, "ঋত এর বুৎপত্তিগত অর্থ হল জিনিষের গতি প্রকৃতি। সাধারণভাবে ইহা প্রাকৃতিক সূত্রাবলী এবং ন্যায়ের অন্তর্নিহিত সত্য কে বোঝায়।" সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের নিয়মিত চলন, দিনরাত্রি ও ঋতু পরিবর্তনের ন্যায় প্রাকৃতির ঘটনাবলীকে বুঝানোর জন্যই ঋত শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। শৃঙ্খলাবদ্ধ পৃথিবী বুঝাতেই শব্দটির ব্যবহার। বিশ্বে যা শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে, তাতে নীতিগতভাবেই ঋত আছে। ইহা প্লেটোর পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অভিজ্ঞতার পৃথিবীই হল ঋত এর প্রতিফলন বা প্রতিচ্ছবি। ইহা পরিবর্তনহীন সত্য। অভিযোজনের যেকোন অবস্থায় ইহা ধ্রুবক। শব্দটির দ্বারা সামাজিক নীতিবোধের কথাও বলা হয়েছে। সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে ন্যায় নীতি অনুসরণের প্রাসঙ্গিকতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঐ প্রসঙ্গে Keith-এর বক্তব্য "ঋত শব্দটির দ্বারা মহাজাগতিক শৃঙ্খলা ও মানবিক শৃঙ্খলা উভয়কে বুঝায়।"

এছাড়া মিত্র ও বরুণ নামে যে সকল দেবতার স্তুতি করা হয়েছে, তাতে প্রকৃতির গতি প্রকৃতির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

বরুণের শক্তি এতই প্রবল ছিল যে উড়ন্ত পাখি বা প্রবাহিত নদী কারো পক্ষে তাঁর সীমানায় পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তিনি সকলকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে থাকেন। তিনি আকাশের উড়ন্ত পাখি সম্বন্ধে জানেন। সমুদ্রে জলযানের (জাহাজের) গতিপথ চেনেন। বহু দূরে ভ্রাম্যমাণ বায়ুর গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে অবগত আছেন।

এরকম আরও কিছু দেবতার স্তুতির মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার সামঞ্জস্য পূর্ণ উৎপত্তি ও অবস্থানের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তা থেকে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা সভ্যতাকালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে কোন সুশৃঙ্খল উৎপত্তি বা ব্যাপ্তি না ঘটলেও ঋক্‌বেদের কালেই ছিল প্রকৃতি বিজ্ঞানের সূতিকা গৃহ। তাই বলা হয়ে থাকে এ সময় নগরায়ন বা সভ্যতা বিকাশে খুব বেশী অগ্রগতি না হলেও এ সময়টাই হল পরবর্তী বিজ্ঞানসম্মত উন্নত সভ্যতা বিকাশের ঊষা লগ্ন।

(ঙ) পরবর্তী বৈদিক যুগ

কাল ঃ (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৬০০ অব্দ)

তবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকদের জানার স্পৃহা অদম্য। তাঁরা হাতে কলমে কাজ করে সত্য আবিষ্কার করতে চায়। তাই তারা মাটি খনন করে বিভিন্ন উপাদান বের করে এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করে অতীত সত্য আবিষ্কার করতে চায়। আমি কিন্তু এ বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাজেরও সাক্ষী। ১৯২১ সালে খননের দ্বারা হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর অতীতের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য আপনাদের যেন নেশা পেয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর যত্রতত্র খনন করে চলেছেন। তবে হ্যাঁ আপনারা অবশ্য একেবারে যে নেশার বশেই তা করেছেন তা কিন্তু বলা চলে না। আপনাদের দেখছি সেসব জায়গায় ভূ-স্তর সম্পর্কে যন্ত্রপাতি দিয়ে কি সব পরীক্ষা নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। কখনও কখনও আমাকেও পরিমাপ করেন। টিক্ টিক্ করা বা না করা ঘড়ির সাহায্যে। এমনি কিছু ভৌত পরীক্ষার দ্বারা মাটির তলায় অবস্থিত কোন ঐতিহাসিক সভ্যতা বা খনিজ দ্রব্যের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হয়েই বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকরা মাটির খোঁড়ার কাজে হাত দেন। এমনিভাবে উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে খনন কার্যের ফলে প্রায় ৫০০টি মনুষ্য অধ্যুষিত জনবসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি স্থানেই বিভিন্ন চিত্র সম্বলিত ধূসর বর্ণের মাটির পাত্রের নির্দশন পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে এ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সকলেই ধূসর বর্ণের মাটির পাত্র ব্যবহার করত। কোথাও কোথাও লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের কিছু ধ্বংসাবশেষের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অনুমান করা যাচ্ছে এ সভ্যতার বিকাশ ও সৃষ্টি হয় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে। অর্থাৎ ঋক্‌বেদের পরবর্তীকালে।

সমাজ ব্যবস্থা ঃ ঋক্‌বেদ বৈদিক যুগের ইতিহাস রচনায় অন্যতম উপাদান। বৈদিক স্তোত্র বা মন্ত্রের সংকলনগুলোকে বলা হয় সংহিতা। বৈদিক স্তোত্র বা মন্ত্রগুলোকে গানের মাধ্যমে উচ্চারণ করার জন্য সুর আরোপ করা হয়েছিল এবং এ সংকলনটির নাম হল সামবেদ সংহিতা। সামবেদ ছাড়া তৎকালীন সময়ে আরও দুইটি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। সেগুলো "যজুর্বেদ" ও "অথর্ববেদ" নামে পরিচিত। মন্ত্র উচ্চারণ সহ আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ রয়েছে "যজুর্বেদে"। অপরদিকে রোগ ও মহামারীর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বহু মন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে "অথর্ববেদে"। এ সকল বেদের স্ত্রোত্র এবং সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তৎকালীন সময়ে এক উন্নত সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন চোখে পড়ে। তাছাড়া লৌহের তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার তৎকালীন সময় থেকে শিল্পে ধাতুর ব্যবহার এক ক্রান্তিকারি ব্যবস্থাপনার বিকাশ ঘটায়। তাই খ্রীষ্টপূর্ব (১০০০-৬০০) অব্দ ভারতের ইতিহাসে "লৌহযুগ" বা পরবর্তী বৈদিক যুগ নামে পরিচিত।

বৈদিক গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় আর্যরা পাঞ্জাব থেকে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল। আর্যদের দুইটি গোষ্ঠী ভরত ও কুরু একত্রিত হয়ে 'কুরু' নামে নতুন এক গোষ্ঠীর প্রবর্তন করে। প্রথমদিকে এই গোষ্ঠী সরস্বতী ও দোয়াবের পার্শ্ববর্তী ও ত্রিসাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যে কুরুগোষ্ঠী

দিল্লী ও দোয়াবের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে। ক্রমে তারা দোয়াবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী পাণ্ডব গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ কুরু-পাণ্ডব গোষ্ঠী সমগ্র দিল্লী ও দোয়াব অঞ্চলে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'মীরাট' জেলার হস্তিনাপুরে তাদের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৯৫০ সালে কুরু গোষ্ঠীভুক্ত একই পরিবারে সদস্য কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধই মহাভারতে বর্ণিত "কুরুক্ষেত্রের" যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে কুরুরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে।

হস্তিনাপুরে অবস্থিত ধ্বংসাবশেষ (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০-৫০০ অব্দের মাঝামাঝি) নগর জীবনের ইতিহাস বহন করে। তবে মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুরের সাথে এ নগর সভ্যতার তেমন কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগ পোড়া ইটের ব্যবহার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। হস্তিনাপুরে মাটির তৈরী যেসব কাঠামো পাওয়া গেছে সেগুলো স্থায়ী ছিল না। তাই কোন এক সময় হস্তিনাপুরে বন্যায় বিধ্বংস্ত হয়ে গেলে 'কুরু' গোষ্ঠীর অধিষ্ঠান এলাহাবাদের নিকটবর্তী কৌশাম্বীতে চলে গিয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত।

বর্তমানের বেরিলি কারুকাবাদ নিয়ে গঠিত ছিল সে সময়ের পাঞ্চাল রাজ্য। ব্রাহ্মবাদী দর্শন চর্চার জন্য পাঞ্চাল রাজ্যের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের সর্বত্র আর্যদের বিস্তৃতি ঘটতে থাকে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ তারা দোয়াব অঞ্চলে থেকে সরে এসে পূর্বদিকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশের কোশল এবং উত্তর বিহারের বিদেহ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বৈদিক মানুষ অন্য শ্রেণীভুক্ত একদল মানুষের সম্মুখীন হন। তারা সাধারণতঃ তামার তৈরী জিনিষপত্র ও লাল কালো মাটির পাত্র ব্যবহার করত। অনুমান করা হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা সমকালীন কোন এক গোষ্ঠী খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ বা তার আগে থেকেই এখানে বসবাস করত। তাদের সভ্যতা পুরোপুরি হরপ্পা সভ্যতা ছিল না। তাদের সভ্যতায় মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

লোহার ব্যবহার ঃ তবে বৈদিক অধিবাসীদের লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্র ও ঘোড়ার ব্যবহারই উত্তর ভারতব্যাপী বৈদিক সভ্যতা বিস্তৃতির পথ সুগম করে দিয়েছিল।

কৃষিকাজ ও লৌহশিল্পের ব্যাপকতা লাভই বৈদিক যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের মূলভিত্তি। এছাড়া সিন্ধুসভ্যতা কালে বিকশিত তাঁত শিল্প, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প এবং কাষ্ঠশিল্প ও যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে বর্তমান পাকিস্তানের গান্ধার অঞ্চলে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। খনন কার্যের ফলে শবদেহের সাথে লোহার তৈরী জিনিষপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। একই সময়ে পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানেও লোহার তৈরী জিনিষপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ থেকে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ধনুকের ফলা এবং অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে লৌহ শিল্পের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃষি ব্যবস্থা ঃ আর্যরা অনার্য তথা সিন্ধু উপত্যকায় অধিবাসীদের কাছ থেকে কৃষি কাজ সম্পর্কীয় জ্ঞান অর্জন করে। তবে সেই সময়ে কাঠের লাঙ্গলে লৌহের ফলা ব্যবহারের পক্ষে

যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তথাপি কোন কোন ঐতিহাসিক চব্বিশটি ষাঁড়ে টানা লাঙ্গলের কথা বলে থাকলেও তা অতিরঞ্জিত ঘটনা হিসাবেই মনে করা হচ্ছে। কেননা উচ্চ গাঙ্গেয় অববাহিকায় মাটির গঠন এতই সহায়ক ছিল যে, ষাঁড়ে টানা কাঠের ফলাযুক্ত লাঙ্গলের সাহায্যে চাষাবাদ করা মোটেই কঠিন ছিল না। অপরদিকে বলিদানের কাজে গবাদি পশুও ব্যবহৃত হত বলে যথেষ্ট সংখ্যক বলশালী গরু কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া যেত না। তাই কৃষিকার্যে তারা উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হননি। তবে ব্যাপকহারে কৃষি কাজ হত বলে শস্য উৎপাদনের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। তা থেকে অনেকে অনুমান করেন, বৈদিক যুগে একটা সময় পর্যন্ত রাজা প্রজা সকলেই নিজে কৃষি কাজে যুক্ত থাকতেন। বিদেহের রাজা ও সীতার পিতা জনক রাজার প্রাচীন কাহিনী অনুমানের পক্ষে যথেষ্ট। তবে কাহিনী যাই হউক না কেন, বৈদিক যুগে বার্লি, বীন, গম প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হত। খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দ নাগাদ হস্তিনাপুরে ধানের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চালের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা উৎপাদনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কুটির শিল্প ঃ বৈদিক যুগে লোহার ব্যবহারের সূত্রপাত হলেও স্বাভাবিকভাবে লৌহ ভিত্তিক বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠেনি। তাই বৈদিক যুগে কুটির শিল্পের প্রসারই ছিল প্রযুক্তিগত ব্যুৎপত্তির প্রতীক। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত শিল্পগুলোর দ্রুত প্রসার ও উৎকর্ষতা ঘটেছিল।

বয়ন শিল্প ঃ তৎকালীন সময়ে বয়ন শিল্পের ব্যাপকতা ঘটেছিল। সমাজের মহিলারাই সাধারণতঃ তাঁত বোনার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত "মোঘ সংহিতা বৈ-স্ত্রিয়ঃ" অর্থাৎ রমণীগণ অসার জাঁকজমক প্রিয় ছিলেন। তার জন্য তারা নিজেদের সুসজ্জিত ও সুশোভন করে তুলতে সচেষ্ট থাকতেন। তাই তারা অলঙ্কার যুক্ত বস্ত্র পরিধানে তৃপ্তি পেতেন। আর এ'বস্ত্র অলঙ্করণের কাজে নারীরাই পারদর্শী ছিলেন। তৎকালীন সময়ে বস্ত্র অলঙ্করণকে "পেশস্করণ" বলা হত। বর্তমানে ইহাই বস্ত্র অলঙ্করণ বা Embroidery শিল্প নামে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের (৩-১১-১০) নং উক্তিতে দেখা যায় — "তাহারা (নারীরা) তাহাদের বস্ত্রের দুই সীমানায় পাড়ের কাছে ফুল তোলা প্রভৃতি অলঙ্করণ করিতেন। অঞ্চলদেশে ও বস্ত্রের মধ্যভাগে বিভিন্ন বর্ণের সূতা দ্বারা সুশোভন করিয়া তুলিতেন।" রাজসিংহাসন ও কাষ্ঠাসনের চেয়ারে বসলে যাতে কঠিন কাঠের অনুভূতি লঘু হয় সে লক্ষ্যে নারীরা সোনালী, রূপালী ও রঙ্গীন সূতা মিলিয়ে নরম আস্তরণ তৈরী করতেন। এ'ধরনের আস্তরণ তৎকালীন সময়ে হিরণ্যকশিপ বা হিরণ্যকুর্চ নামে পরিচিত ছিল।

শুক্ল যজুর্বেদের ত্রিংশতম অধ্যায়ে উল্লেখিত বৈদিক যুগে প্রচলিত প্রায় ৭০টি পেশার মধ্যে বয়ন, ঝুড়ি প্রস্তুতি, সুগন্ধি তৈরী, কাজল প্রস্তুতি, কোষ নির্মাণ, পুত্তলী নির্মাণ, বস্ত্রাদি রং করা, বয়ন ও বস্ত্র অলঙ্করণ এ'কয়টি পেশা কেবলমাত্র নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

চর্মশিল্প ঃ বেদের কতগুলো মন্ত্রে চর্ম শিল্প ও চর্মকারের উল্লেখ আছে। অনেকেই চর্মশিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। বেদের (৬-৪৭-২৭) মন্ত্রে গো-চর্মাকৃত রথ, (৮-৪৮-১৮) মন্ত্রে চর্ম নির্মিত আধার, (৫-৯-৫) মন্ত্রে ধমাতরী প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী বৈদিক যুগ বা ব্রাহ্মণ্যবাদের যুগেও শূকর চামড়া নির্মিত জুতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রজ্জুশিল্প ঃ ঋগ্‌বেদের উল্লেখিত কতগুলো মন্ত্রে বলা হয়েছে "রজ্জু দ্বারা যেমন কোন দ্রব্যকে দৃঢ়ভাবে বেধে রাখা যায় তদ্রূপ রাজাও তার রাজ্যকে দৃঢ়ভাবে সংহত করে রাখবেন।" এ'থেকে মনে হচ্ছে তৎকালীন সময়ে রজ্জু শিল্পেরও বিকাশ ঘটেছিল।

স্বর্ণ শিল্প ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হয়েছে সমাজে নারীরা অলঙ্কার পড়তে ভাল বাসতেন। বৈদিক রমণীগণও অলঙ্কার পড়তে পছন্দ করতেন। তার মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার তাদের বেশী পছন্দ। স্বর্ণকার কর্তৃক স্বর্ণ ও অন্যান্য ধাতু গলানোর কথা ঋক্‌বেদের (৬-৩-৪) মন্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদে স্বর্ণ বলয় (৭-৫৬-১৩), সুবর্ণ কবচ (৪-৩৪-৯) এবং (৪-৫৩-২), উষ্ণীষ (৫-৫৪-১১), হিরণ্য কুণ্ডল (১-১২২-১৫), স্বর্ণহার (৭-৫৬-১৩) প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া সোনার রথ যথা "ত্বষ্টা যদ্ বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্র ভৃষ্টিং স্বপা অর্বতয়ৎ" — অর্থাৎ সহস্র ক্ষুরধার যুক্ত উত্তম রূপে তৈরী ইন্দ্রের রথের পরিচয়ও মন্ত্রে পাওয়া যায়। স্বর্ণের অস্ত্রশস্ত্র বা স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহারের কথাও ঋকবেদের মন্ত্রে পাওয়া যায়। মোট কথা বৈদিক যুগে স্বর্ণশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষতা ঘটেছিল। তবে এ'সকল সোনা সংগ্রহের তথ্য সম্পর্কে সঠিক কোন প্রমাণাদি নেই।

পূর্তশিল্প ঃ বেদের মন্ত্রে গৃহনির্মাণ, দুর্গনির্মাণ, পরিকল্পিত গ্রাম, পুকুর খনন, নলকূপ বসানো, কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি পূর্ত কার্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। প্রস্তর নির্মিত নগর ও গৃহ নির্মাণ, লৌহ নির্মিত দূর্গ, সহস্রস্তম্ভ সম্বলিত অট্টালিকা, পানীয় জল সংরক্ষণের জন্য চৌবাচ্চা নির্মাণ প্রভৃতি পূর্তকার্যের পরিচয় ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়। নলকূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋকবেদের ১-৮৫-১০ মন্ত্র উল্লেখ্য।

"উর্ধ্বং নুনুদ্রে অবতংত ওজমা দাদৃহানং চিদ বিভিদুটি পতিম" — অর্থাৎ মরুদ দেবতাগণ পৃথিবী ভেদ করে 'অবত' নামক যন্ত্র বসিয়ে অধোদেশ হতে জল এনেছিলেন ।

রথ শিল্প ঃ তৎকালীন রথ নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা ছিল। যুদ্ধযাত্রা, দৈনিক যাতায়াত প্রভৃতি কাজে চাকাযুক্ত রথের বহুল ব্যবহার ছিল। ঘোড়া, খচ্চর, গাধার দ্বারা রথ টানা হত। সমাজে রথ শিল্পীদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। কথিত আছে অভিষেকের সময় সিংহাসন আরোহণের পূর্ব মুহূর্তে রাজাকে রথ শিল্পির অনুমতি নিতে হত। রথকারের শিল্প নৈপুণ্যের সাথে গৌতমমুণি প্রবর্তিত মন্ত্র সম্পর্কে জনৈক ঋষি লিখেছেন "গৌতমো ইন্দ্র নব্যমতক্ষৎ" অর্থাৎ রথকার যেমন রথের বিভিন্ন অংশ তৈরী করে পরে সংযুক্ত করেন তদ্রূপ গৌতমমুণিও এ'মন্ত্র রচনা করেছেন।

পোতশিল্প ঃ ঋকবেদের দ্বিতীয় মণ্ডলেও অন্যান্য স্থানে জলযানরূপে নৌকার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ঋকবেদের ১০-১৪৩-৪৫, ৭-৬-৭ প্রভৃতি মন্ত্রে সামুদ্রিক পোতের উল্লেখ দেখা যায়। সমুদ্রগামী পোতগুলো অতিদৃঢ়ভাবে নির্মাণ করা হত যাতে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ বা লবণাক্ত জল দ্বারা পোতগুলোর কোন ক্ষতি না হয়।

"শতারিত্রাং নাবম্ আতস্থিবাং সম্" মন্ত্রে একশত দাঁড়টানা জাহাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

বিশালনদী পার হওয়ার জন্য ব্যবহৃত দৃঢ় নৌকাগুলো 'সুতর্মা নৌঃ' নামে পরিচিত ছিল। ঋকবেদের ঐতরের ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে দীর্ঘ সমুদ্র পথের যাত্রীরা প্রচুর পানীয় জল এবং বহুদিনের

খাদ্য নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করত। এ'সকল নৌকোগুলো "সৈরাবতী নৌঃ" নামে পরিচিত ছিল। আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট আর্যগণ পৌত শিল্পে যথেষ্ট নৈপুণ্য অর্জন করেছিল।

অস্ত্রনির্মাণ শিল্প ঃ আর্যরা যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন সে সম্পর্কে অবশ্যই কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। তবে তারা যে শুধু দক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন তা নয়, নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণেও তারা সুদক্ষ ছিলেন। ঋক্‌বেদের ১-৫২-৮, ১-৮১-৪, ১০-৯৬-৩ প্রভৃতি মন্ত্রে লৌহনির্মিত অস্ত্রের বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া লৌহ, স্বর্ণ ও প্রস্তর এ তিন প্রকার ধাতু হতে অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হত। ৭-৮৩-১ মন্ত্রে কুঠার, ৫-৫২-৬, ৫-৫৭-২ ও অন্যান্য বহু মন্ত্রে ধনু, ৫-৫৭-৫ ও অন্যান্য বহু মন্ত্রে তীর, ৬-৩-৫, ৬-৪৭-১২ প্রভৃতি মন্ত্রে লৌহ অস্ত্রের উল্লেখ আছে। এছাড়া বর্শা, খড়গ প্রভৃতিও যুদ্ধাস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হত। নিরাপত্তার স্বার্থে ব্যবহৃত লৌহবর্ম, নিষঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রের উল্লেখও ঋক সংহিতায় দেখতে পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত "ত্বষ্টা যদ্ বজ্রং - সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ" নামক মন্ত্রে বলা হয়েছে ত্বষ্টা নিজে এক হাজার ক্ষুরযুদ্ধ স্বর্ণ বজ্র ইন্দ্রকে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। উল্লিখিত মন্ত্রগুলো অস্ত্র নির্মাণে আর্যদের সুদক্ষতারই পরিচায়ক।

খনন কার্য দ্বারা ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যায়। তারা যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পশুপালন ছেড়ে কৃষিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তাই কৃষিকাজ ও শিল্পকলা নির্ভর পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষ উচ্চগাঙ্গেয় সমভূমিতে ক্রমশঃ পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করল। তবে কৃষি পদ্ধতিতে উন্নত প্রথার উদ্ভব না হওয়ায় কৃষকরা নিজেদের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে বেশী পরিমাণে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদনে সমর্থ ছিল না। ফলে সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পার ন্যায় নগর সভ্যতা পত্তনের প্রাথমিক উপাদানের ঘাটতি ছিল। তবে এই যুগের শেষদিকে হস্তিনাপুর ও কৌশাম্বীতে নগর সভ্যতা পত্তন শুরু হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। তাতে ঐতিহাসিকদের অনুমান সমুদ্র পথে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা

খনন কার্য ও অনুসন্ধানের ফলে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার ন্যায় পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রামাণ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের ঘাটতিতে মনে করা সংগত হবে না যে, এ যুগের মানুষ সিন্ধু ও হরপ্পাবাসীদের ন্যায় অভিজ্ঞতা নির্ভর বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা ও তার সুফল লাভে সক্ষম ছিল। তবে লৌহ দ্রব্যাদির ব্যবহারিক জ্ঞানে এ যুগকে ঐতিহাসিকরা ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছেন। তাছাড়া ঋক্‌বেদ সংহিতা, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অর্থবেদ ও তাদের সংহিতাগুলো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তত্ত্বের উপর দাঁড় করিয়ে প্রণালীবদ্ধ করার পথ উন্মুক্ত করেছে। তাই বলা হয় বৈদিক সাহিত্য শুধু দেবদেবীর পূজা অর্চনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের পথ উন্মোচনে আজও খোরাক জুগিয়ে চলেছে। বৈদিক সাহিত্যগুলোতে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য

শিল্পকলা সম্পর্কে যে তত্ত্বের অবতারণা করেছে, সেগুলো বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে আজও সমাদৃত।

বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা : এ সকল বিষয়কে ভিত্তি করে বৈদিক যুগে ভারতে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যাচর্চার যে উৎকর্ষতা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে তুলে ধরা হল।

বৈদিক সমাজে তিনটি উচ্চশ্রেণীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক ছিল বলে অনেক বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে সে শিক্ষা মূলত বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নেই অধিকাংশই সীমিত ছিল। উপনয়নের পর গুরুগৃহ বা তপোবন বিদ্যালয়ই ছিল ছাত্রদের অধ্যয়নের স্থল।

তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়ন গ্রহণে অধিকার ছিল। উপনয়নের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হত। শতপথ ব্রাহ্মণের (১১-৫-৪-১২) স্তোত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মচার্য পালন করে তাহার নবজন্ম হয়। নতুন আধ্যাত্মিক জীবনের সূত্রপাত হয়।' ছাত্রকেও এজন্য যথেষ্ট উৎসাহী ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হত। 'আমি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করতে চাই, আমাকে ব্রহ্মচারী হইতে দেওয়া হউক' এরূপ প্রতিজ্ঞার উত্তরে "আজ হইতে তুমি ব্রহ্মচর্যের নিয়মাবলী পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে। তোমার করণীয় কর্তব্য শুরু কর। যজ্ঞকুণ্ডে কাষ্ঠ দান কর। আচার্যের আজ্ঞাধীনও বাধ্য হইবে। দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। জিতেন্দ্রিয় হইবে" ইত্যাদি উপদেশযোগে আচার্য ছাত্রকে তাঁর বিদ্যালয়ে গ্রহণ করতেন। বলতে গেলে সেদিন থেকেই ব্রহ্মচারীর ছাত্রজীবন শুরু হত। অধ্যায়ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে গুরুগৃহে কঠোর তপস্যা বা সাধনায় ব্রতী হতে হত। তার পুরো ছাত্র জীবনকে সুদীর্ঘ যজ্ঞের সহিত তুলনা করা হয়েছে। তাই শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে "পবিত্র যজ্ঞাগ্নির উজ্জ্বল শিখা ছাত্রের মনকেও উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত।" তাছাড়া প্রথম থেকেই তার মনে বিনয়ীভাব জাগার জন্য "লজ্জা ও অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া তাহাকে ভিক্ষা দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত।"

শতপথ ব্রাহ্মণে (১১-৫) মন্ত্রে তৎকালীন সময়ের পাঠ্য তালিকায় বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত সংহিতা বা মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গ আবশ্যিক বিষয় ছিল। এছাড়া বেদের নিয়ম প্রণালী (অনুশাসনাদি), বিজ্ঞান (বিদ্যা), কথোপকথন (বাকোবাক্যম্) প্রচলিত কাহিনী ও কিংবদন্তি (ইতিহাস পুরানম্) মানুষের কীর্তি সম্পর্কীয় ছন্দোবদ্ধ বাক্য (গাথানারাশংসী) ইত্যাদি বিষয়গুলোও ছাত্রদের পড়ানো হত। এছাড়া সর্পবিদ্যা, রাক্ষসবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ রয়েছে (৭-১-২) নং মন্ত্রে।

তবে প্রতি বছরই পাঠ্য তালিকার সংযোজন ও পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে প্রতি বছরই পাঠ্য তালিকায় নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হত। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৭-১-২) এরূপ সংযোজিত ও পরিবর্ধিত পাঠ্য তালিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

চারটি বেদ ব্যতীত ইতিহাস পুরাণ (বেদানাং বেদ্ম), পারলৌকিক কাজের করণীয় নিয়মাবলী, অংক বা রাশিশাস্ত্র, দৈববিদ্যা, নিধিবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজন বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রচেষ্টা পুরাণের যুগ থেকেই দেখতে পাওয়া যায়।

বিতর্কসভা বা আলোচনাসভা বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা উচ্চতর সংযোজন। বিতর্ক বা আলোচনার মাধ্যমে ছাত্ররা কোন একটা বিষয় সম্পর্কে অধিক অধ্যয়ন বা জানার সুযোগ পেত। বৈদিক মূলগ্রন্থে এ সকল বিতর্ককে 'ব্রহ্মোদ্য' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাকে বিদ্যাবিচার বা বিদ্যাবিষাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এরূপ বিতর্কসভায় প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করার সুযোগ থাকত। বিচারের ভার থাকত একজন বা একাধিক আচার্যের উপর। আজও এরূপ বিতর্ক সভার প্রচলন আছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও শাকল্যের মধ্যে বিতর্ক (১৯-৬-৩), আচার্য শাণ্ডিল্য ও তাঁর ছাত্র সাপ্তরথ্যের বিতর্ক, ঋক্‌বেদীয় পুরোহিত হোতা ও যজুর্বেদীয় পুরোহিত অর্ধবসুর মধ্যে শাস্ত্র আলোচনা, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পর্কীয় বিভিন্ন পুরোহিতের আলোচনা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ক্রমশ উন্নত হতে যথেষ্টভাবে সাহায্য করেছে।

এধরনের বিতর্কসভাকে রাজারাও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৯-৬-২) জনক রাজার তর্কসভা আজও উল্লেখের দাবী রাখে। মহাজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ঋষিদের মধ্যে যে সকল তর্ক ও আলোচনা হয়েছিল, তারই সংকলিত রূপ 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ' বলে অনেকে মনে করেন। এ উপনিষদ প্রাচীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অবিস্মরণীয় প্রমাণ।

বৈদিক যুগের আরুণি, ভৃগু, শ্বেতকেতু, নচিকেতা, সত্যকাম, নাজনেদিষ্ঠ, নারদ, শৌনক প্রমুখ ছাত্রদের অধ্যয়ন, তপস্যা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন প্রণালী ও গুরুর উপদেশ পালনের প্রতি আগ্রহ আজও সুষ্ঠু ছাত্র জীবনের অন্যতম নির্দেশাবলী রূপে বিবেচিত হয়।

ছাত্রদের দিক থেকেও 'উপকুর্বাণ' ও 'নৈষ্ঠিক' নামক দু'ধরনের ছাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। নৈষ্ঠিক ছাত্ররা পাঠ সমাপনান্তে ত্যাগের আদর্শে ব্রতী হয়ে চিরকৌমার্য গ্রহণ করে স্বগৃহে না গিয়ে গুরুগৃহেই থেকে যেত। তারা সাধারণত ত্যাগেব আদর্শে ব্রতী হয়ে উত্তরকালে পরম পণ্ডিত বা ঋষিরূপে জীবনযাপন করত। অপরদিকে উপকুর্বান ছাত্ররা পাঠসমাপনান্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করে গার্হস্থ্য জীবন শুরু করত। গুরুগৃহ ত্যাগের আগে এরূপ ছাত্রদের হোমাগ্নিতেশেষকাষ্ঠ সংযোগ করে শেষ স্নান করতে হত। স্নান সমাপনে সাধ্যানুসারে গুরুকে দক্ষিণা দিয়ে ছাত্র পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়ার অনুমতি পেত। সে সময় অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে উপাধি দেওয়া হত। পাঠ সমাপনান্তে গুরুগৃহ ত্যাগের অনুষ্ঠানটি 'সমাবর্তন' নামে পরিচিত ছিল। সে জন্যই হয়তো আজও উপাধিদান প্রথাকে 'সমাবর্তন' উৎসব বলা হয়।

ছাত্রদের ন্যায় অধ্যাপকদের ক্ষেত্রেও দু'ধরনের আচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। উপনয়ন সমাপনান্তে যে সকল ছাত্রকে গুরু তাঁর নিজের গৃহে বা তপোবনে পাঠের ব্যবস্থা করতেন তাঁদের আবাসিক আচার্য বলা হত। আর এক ধরনের আচার্য স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। তাঁদের চরক বলা হত। মূলতঃ শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তৎকালীন সময়ে বেশ সমাদৃত ছিল। অপরদিকে আবাসিক বিদ্যালয়ে যে সকল আচার্য দশ হাজার ছাত্রের ভরণপোষণের ভার নিয়ে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করতেন তাঁদের 'কুলপতি' উপাধি দেওয়া হত।

কুলপতির বৈশিষ্ট্য নিম্নবর্ণিত সংস্কৃত শ্লোকে দেখতে পাওয়া যায়।

"মুনীনাং দশ সহস্রং যোহন্নাদানদিনা
অধ্যায়পয়েদ্ ভবেদ বাপি সবৈকুলপতিঃস্মৃতঃ"

— কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ গ্রন্থে উল্লেখিত ঋষি কন্ব ছিলেন অনুরূপ একজন কুলপতি।

আচার্য ও ছাত্রের সম্বন্ধ ছিল অত্যন্ত মধুর ও আন্তরিকতা পূর্ণ। ছাত্ররা আচার্য কে পিতার ন্যায় দেখত আবার আচার্যও ছাত্রদের পুত্রতুল্য মনে করতেন। প্রাত্যহিক শিক্ষারম্ভে আচার্য দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যং করবা ব হৈ,
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ,
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"

মন্ত্রটির অর্থ "ব্রহ্ম আমাদের উভয়কেই রক্ষা করুন। তিনি আমাদের একত্রে বহন করুন। আমরা একত্রে জ্ঞান লাভের শক্তি যেন অর্জন করি। আমাদের শিক্ষা যেন তাহার প্রকৃত বৈশিষ্ট টি প্রকাশ করতে পারে। আমাদের মধ্যে যেন কখনও বিদ্বেষের সৃষ্টি না হয়।"

নারী শিক্ষা ঃ পুরুষদের ব্রহ্মচর্য পালন বা উপনয়নের মাধমে ছাত্র জীবনারম্ভের কথা থাকলেও নারীদের জন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থার খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে বৈদিক সাহিত্যে সংহিতার মন্ত্রদ্রষ্টা রূপে বহু নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য সাহিত্যেও বহু নারী অধ্যাপিকা, শিষ্যা, তপস্বিনী, ব্রহ্মচারিণী বা ব্রহ্মবাদীর নাম পাওয়া যায়।

ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় সংহিতার যুগ হতে সাহিত্যের যুগ পর্যন্ত নারীরাও উপনয়নের মাধ্যমে দীক্ষিত হতেন। তারাও ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। অগ্নি আধান করতেন। বেদও অন্যান্য গ্রন্থ সমূহ পাঠ করতেন। স্মৃতিকার যম বলেছেন—

"পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধ নম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা।"

অর্থাৎ প্রাচীনকালে পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা নারীদের অভিষিক্ত করা হত। তাঁরা বেদ পাঠ করতেন এবং সাবিত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করতেন।

স্মৃতিকার হারীত বলেছেন—

"সদ্যোবধূনাং তু উপস্থিতিতে বিবাহে কথাঞ্চিং
উপনয়নং কৃত্বা বিবাহং কার্য্যঃ।"

অর্থাৎ পবিত্র ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা উপনীত করে সদ্যোবধূদের বিবাহ দেওয়া হত। ভারতীয় আর্যশাখার এ'রীতি আজ পরিত্যক্ত হলেও ইরাণীর আর্য শাখায় এ'রীতি আজও প্রচলিত আছে। আজও জরথুশত্র সম্প্রদায়ভুক্ত নারীরা পবিত্র ব্রহ্ম সূত্র দ্বারা উপনীত হয়ে নতুন জীবন শুরু করে। নওজোত নামে ইহা জরথুশত্র সম্প্রদায়ের একটা বড় উৎসব।

বর্তমানে হিন্দু বিবাহে বধূদের মন্ত্র উচ্চারণ আবশ্যিক না হলেও প্রাচীনকালে বরের ন্যায় বধূদেরও মন্ত্র উচ্চারণ করা আবশ্যিক ছিল।

'পত্নী' শব্দটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে পানিনি "পুত্যর্নো যজ্ঞ সংযোগে" এ সূত্রটি রচনা করেছেন। তাই পত্নী শব্দের অর্থ হল যজ্ঞ কর্মে পতির সহযোগিনী। সে বিবেচনায় বিপত্নীক বা অবিবাহিত কোন পুরুষের যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার ছিল না। ব্রহ্মগ্রন্থে ইহার স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।

'ন বৈ অপত্নীকস্য হস্তাৎ দেবা বলিং গৃহ্নন্তি।'

তাই অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমান রাজার চারি রাণীর যজ্ঞে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়।

নারী শিক্ষার জন্য কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থার প্রমাণিক তথ্য না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্যে বেশ কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত বিদূষী নারীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে বিশ্ববারা, রোমশা, লোপমুদ্রা, অম্ভৃনী বাক্, জুহু, পৌলোমী, কাক্ষবতী ঘোষা, জরিতা, শ্রদ্ধা কামায়নী প্রমুখ হলেন ঋকবেদে মন্ত্রদ্রষ্টাকারী নারী। এছাড়া গার্গী, মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী নারী।

এ অবস্থায় স্বাভাবিক প্রশ্ন এ সকল বিদুষী নারীরা কোথায় অধ্যয়ন করতেন। তাঁদের জন্য তপোবন বা গুরুগৃহে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ না থাকলেও তাঁরা বিদুষী নারীরূপে বৈদিক সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁদের পাণ্ডিত্য অবশ্যই প্রমাণ করে তাঁরা কারও না কারও কাছে অধ্যয়ন করে থাকবেন।

ঐতিহাসিক আলোচনায় যা বুঝা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এ সকল বিদূষী নারীরা হয়তো কোন পণ্ডিত বা ঋষির কন্যা বা স্ত্রী ছিলেন। তাই পিতা বা স্বামীর কাছ থেকেই তারা বেদ পাঠে উৎসাহিত হয়ে থাকবেন।

বৈদিক সাহিত্য ব্যতীত ললিতকলা চর্চায় ও তৎকালীন সময়ে নারীরা যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির পরিচয় রেখেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে 'নৃত্য গীতং স্ত্রীনাং কর্ম' অর্থাৎ গান করা, নৃত্য করা স্ত্রীলোকের কাজ এর উল্লেখ বহুবার দেখতে পাওয়া যায়।

ঋকবেদের কয়েকটি মন্ত্রে সামরিক শিক্ষায় নারীদের পারদর্শীতার পরিচর পাওয়া যায়। রাজা নমুচির আদেশে তাঁর মহিষী অতি ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মুদগলের স্ত্রী মুদগলানী ভয়শূন্য রণ পণ্ডিত বীরঙ্গনা নারী বৈদিকযুগের বীরঙ্গনাদের অন্যতম। অসীম সাহসী সুভদ্রার নামও বীরাঙ্গনা নারীরূপে মহাভারতে স্থান দখল করে আছে। ঋকসংহিতা ৫-৬১, ৫-৮০-৬, ৭-৭৮-৫, ৮-৩৩-১৯,৮-৯১ প্রভৃতি সূত্র ও মন্ত্রে আর্য বীরঙ্গনার কার্যকলাপ ও যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ ভাবে দেখা যাচ্ছে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে যথেষ্ট সুযোগ না থাকলেও আর্যনারীরা তাদের স্বকীয় উৎসাহ ও অধ্যাবসায় দ্বারা বৈদিক সাহিত্য, ললিতকলা চর্চা ও সামরিক বিদ্যায়ও দক্ষতা অর্জনে যথেষ্ট পারদর্শিকার পরিচয় রেখেছেন।

গণিতচর্চা ঃ বৈদিক সাহিত্যে গণিতকে সকল বিদ্যার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলতে সাধারণত পাটিগণিত ও জ্যোতিষবিদ্যাকে বুঝতেন, যদিও বৈদিক মতেই গণিতের অর্থ গণনাবিদ্যা। গণিত সম্পর্কে বেদাঙ্গ জ্যোতিষে যে বর্ণনা দেওয়া আছে তা নিম্নরূপঃ

"যথা শিখাময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্দ্ধনি স্থিতম্।।"

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ - ৩৪

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার চূড়ার মত, সাপের মাথায় মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতের অবস্থিতি।

বিরাট বিরাট সংখ্যা কল্পনা করার ক্ষমতা সেই যুগের ঋষিদের মধ্যে দেখা যায়। যর্জুবেদ সংহিতায় বিভিন্ন সংখ্যায় আমরা যে নামকরণ সহ পরিচয় পাই তা নিম্ন রূপ

এক (১), দশ (১০), শত (১০০), সহস্র (১০০০), অযুত (১০,০০০), নিযুত (১০০০০০), **প্রযুত (১০০০০০০), সমুদ্র (১,০০০,০০০,০০০), মধ্য (১০,০০০,০০০০০০), অন্ত (১০০,০০০ ,০০০,০০০) ও পরার্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০)।**

এই সংখ্যাগুলোর পরিচিতির মাধ্যমে প্রমাণ মেলে যে বৈদিক গণনা পদ্ধতি ছিল "দশমিক" পদ্ধতি নির্ভর। কেননা এখানেও ১০ দিয়ে গুণ করলে পরবর্তী বড় সংখ্যা পাওয়া যায়, আবার দশ দিয়ে ভাগ করলে পূর্ববর্তী সংখ্যায় ফিরে আসা যায়। তাই বলা চলে বর্তমানে ব্যবহৃত মেট্রিক পদ্ধতি বৈদিক যুগে ব্যবহৃত পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে বড় বড় সংখ্যাগুলো সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। শত বা সহস্রকে আশ্রয় করেই বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত। যেমন পঞ্চাশ সহস্র (৫০,০০০)। এছাড়া উপরে দশকের বিভিন্ন মাত্রার যে মান দেওয়া আছে তা দিয়ে মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে না। তার জন্য যোগ-বিয়োগের আশ্রয় নিতে হবে। যেমন 'ত্রয়োদশকে আমরা লিখতে পারি দশের সাথে '৩' যোগ করে। অর্থাৎ (১০+৩)='১৩' ত্রয়োদশ। আবার ঊনবিংশ প্রকাশ করতে পারি বিশ থেকে এক বিয়োগ করে অর্থাৎ (২০-১)=১৯ এভাবে দশকের বিভিন্ন মাত্রার মধ্যবর্তী সংখ্যাগুলোকে নিরূপণ করাও সম্ভব ছিল।

সংখ্যার লিপি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহর ও অন্যান্য লিপিতে সংখ্যা লেখার যে নমুনা পাওয়া যায় তা নিত্যান্তই প্রাথমিক রূপে স্বীকৃত। এক বা একাধিক দাগের সাহায্যে সংখ্যা নির্দিষ্ট হত। বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ কোন চিহ্ন ব্যবহারের নির্দশন পাওয়া যায়নি। মহেঞ্জোদাড়োর পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালিপির যে নমুনা পাওয়া যায় তা খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী নামে পরিচিত। খরোষ্ঠী মূলত বিদেশী লিপি। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তন কাল অজ্ঞাত। পারসিক রাজ দরায়ুসের (খ্রীষ্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর ভারতে খরোষ্ঠী লিপি প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন। খরোষ্ঠী লিপি ডান থেকে বামে লেখা হত। অপরদিকে ব্রাহ্মী লিপি বাম থেকে ডানে লেখা হত। এছাড়া ১, ৪ থেকে ১০, ২০ ইত্যাদির জন্য পৃথক পৃথক প্রতীক ব্যবহার করা হত।

খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি পদ্ধতিতে যৌগিক সংখ্যা যেমন ৩৪৮ ও ৩২৭ লেখার দুইটি নমুনা নীচে দেওয়া হল

খরোষ্ঠী পদ্ধতি =

৩৪৮ = (৮+৪০+৩০০) দক্ষিণ থেকে বামে

= XX + 33 + EIII = XX 33EIII

ব্রাহ্মী লিপি পদ্ধতিতে (নানা ঘাট)

৩২৭ = ৩০০+২০+৭ (বাম হতে দক্ষিণে)

)⊣ + O + ২ =)⊣O ২

বর্তমানে ব্যবহৃত সংখ্যা তত্ত্বের আলোকে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপিগুলো যথেষ্ট কঠিনই বলা চলে।

পাটীগণিত ঃ

উপরে বর্ণিত সংখ্যা সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের জ্ঞান থেকে এটা অনুমেয় যে তারা পাটীগণিতেও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। পাটীগণিতের নামকরণ নিয়ে কিছু অনুমানের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সে যুগে কাগজ ও কলমের ব্যবহার ছিলনা। গণনা করা হত পাটী বিছিয়ে। তৎকালীন সময়ে ঋষি বা গণিতজ্ঞরা পাটীর উপর ধূলো ছড়িয়ে তর্জনীর অগ্রভাব বা কাঠখণ্ড দিয়ে সংখ্যা লিখতেন ও গণনা করতেন। পাটী বিছিয়ে গণনা করা হত বলেই সম্ভবতঃ গণিতের এ শাখাটি পাটীগণিত নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

প্রথমদিকে পাটীগণিতই গণিতের অন্যতম শাখা হলেও বীজগণিত , জ্যামিতি প্রভৃতি শাখার উদ্ভবে পাটীগণিত গণিতের একটি স্বতন্ত্র শাখা নামে চালু হয়ে আসছে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল প্রভৃতি গণিতের প্রাথমিক প্রক্রিয়া নিয়েই পাটীগণিত সীমাবদ্ধ ছিল।

পাটীগণিতে অন্যতম সহজ ও প্রাথমিক প্রক্রিয়া হল যোগ। যোগ আদি প্রক্রিয়া। কয়েকটি সংখ্যার একীকবণকেই ভারতীয় গণিতে যোগ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাতে সহজভাবে বুঝা যায় যোগ মানে বেড়ে যাওয়া।

বর্তমানে আগে এককের অংক সমূহ, তারপরে হাতে নিয়ে দশকের অংক সমূহ, আরও পরে শতকের অংকসমূহ যোগ হয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যোগ করার দুটি ভিন্ন পদ্ধতি ছিল।

একটি ক্রমানুসারে আর একটি উৎক্রমানুসারে। ক্রমের বেলায় যোগ এককের অংক থেকে শুরু হত অর্থাৎ ডান থেকে বায়ে চলত। তবে এখানে বর্তমানের ন্যায় হাতে নিয়ে কবার প্রচলন ছিল না। "অরূপ রতন মহাশয়কে অনুসরণ করে একটি উদাহরণ নেওয়া হল ঃ-

৭
৫
৩৪
১৮৭
২৩
৪৯
<u>১০৫</u>
২৪০
××
৪১

অর্থাৎ যোগফল ৪১০ ।

পদ্ধতিটা হল এককের সংখ্যাগুলোর যোগফল ৪০ এর শূন্য বসল এককের ঘরে। ৪ বসল দশকের ঘরে। ৪ সহ দশকের সংখ্যাগুলোর যোগফল ২১। ২১ এর ২ বসল যোগফলের শতকের ঘরে । আর ১ বসল আসল যোগফলের দশকের ঘরে । শতকের ঘরের অংকগুলোর যোগফল ৪ আসল যোগফলের শতকের ঘরে বসবে। ফলে যোগফলটি দাঁড়াল এককের ঘরে '০' দশকের ঘরে '১' এবং শতকের ঘরে '৪' অর্থাৎ ৪১০ ।

উৎক্রম পদ্ধতিতে যোগটা হল উল্টো। একই যোগের উদাহরণ নেওয়া যাক ।

৭

৫

১৩৪

৮৭

২৩

৪৯

১০৫
___

২৭০

× ×

৩ ১

৪

এখানে বাম থেকে শুরু করতে হবে। শতকের অংকগুলোর যোগফল ২ শতকের ঘরে বসল ও দশকের অংকগুলোর যোগফল ১৭ এর ৭ বসল দশকের ঘরে। আর দশকের ১ শতকের ২ এর সাথে যোগ হয়ে ৩ বসল পরবর্তী শতকের ঘরে। এককের সংখ্যাগুলোর যোগফল ৪০ এর শূন্য বসল এককের ঘরে। দশকের ৪ এর সাথে পূর্ববর্তী দশকের ৭ যোগ করে হয় ১১। ১১ এর এককের ১ বসল শেষ ফলে দশকের ঘরে । আর দশকের ১ পূর্ববর্তী ৩ এর সাথে যোগ হয়ে হল '৪'। ৪ বসল শেষ ফলের শতকের ঘরে। সবশেষে দাঁড়াল শতকের ঘরে ৪, দশকের ঘরে ১, এককের ঘরে ০, অর্থাৎ ৪১০" । অংক দুটোর বিশ্লেষণে বলা যায় উভয় পদ্ধতিই বর্তমানে একক থেকে শুরু করে হাতে রইল পদ্ধতি সহ যোগের চাইতে অবশ্যই কঠিন ছিল। তবু চর্চার দ্বারা তৎকালীন সময়ে গণিতজ্ঞ বা ঋষিরা এ'গুলো আয়ত্ত করেছিলেন বলেই মনে করা যায়।

বিয়োগের ক্ষেত্রেও একই ক্রম পদ্ধতি এবং উৎক্রম পদ্ধতি ব্যবহার করা হত। আজও 'ক্রম' পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হচ্ছে। আর উৎক্রমে পদ্ধতিটা হল 'ক্রম' পদ্ধতির উল্টো।

যোগ বিয়োগের পর আসে গুণের কথা, প্রাচীনকালে ভারতে কপাটসন্ধি, স্থান খণ্ড প্রভৃতি

বিভিন্ন পদ্ধতিতে গুণ করার প্রচলন ছিল। "অরুণ রতন মহাশয়কে অনুসরণ করে একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ১১৫ কে ২৫ দিয়ে বর্তমানে গুণ করলে দাঁড়ায়।

$$\begin{array}{r} ১১৫ \\ \underline{১৫} \\ ৫৭৫ \\ \underline{১১৫} \\ ১৭২৫ \end{array}$$

এখানে ১১৫ গুণ্য আর ২৫ গুণক। ১১৫ কে কপাটসন্ধি পদ্ধতিতে গুণ করলে নিম্নরূপে লিখতে হবে

১৫

১১৫

এখন গুণ্যের এককের ৫ দিয়ে গুণকটিকে গুণ করতে হবে। ৫ × ৫ = ২৫, ৫ বসবে এককের ঘরে এবং গুণকের একক ৫ এর একঘর পূর্ববর্তী হাতে থাকবে ২, আবার ৫ × ১ = ৫ এর সাথে ২ যোগ হয়ে ৭ হবে। ৭ বসবে দশকের ঘরে। ৫ এর কাজ শেষ হল। একক ৫ এর কাজ শেষ হলে গুণ্যটি বদলে দাঁড়াবে ১১৭৫। এবার গুণক ও গুণ্যকে নিম্নলিখিতভাবে লিখতে হবে।

১৫

১১৭৫

এখন ১ দিয়ে ১৫ কে গুণ করতে হলে প্রথমে ৫×১=৫। এখন গুণ্যের দশক অংক ৭ এর সাথে ৫ যোগ হবে। যোগফল ১২। তাহলে পরবর্তী গুণকে ৭ এর জায়গায় বসবে ২। হাতে রইল ১। এখন ১×১=১ এর সাথে ১ যোগ করে হবে ২। এ'অবস্থায় নতুন গুণ্য হবে ১২২৫। পুনরায় গুণক ও গুণ্যকে নিম্নলিখিতভাবে লিখতে হবে।

১৫

১২২৫

এখন ১৫×১=১৫ এর ৫,২ এব সাথে যোগ হয়ে হবে ৭। আর হাতের ১ সবচেয়ে বাঁয়ে বসবে। অবশেষে গুণফলটি দাঁড়াল ১৭২৫।

স্থানখণ্ড পদ্ধতিতে ১১৫ কে ১৫ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়াবে

$$\begin{array}{l} ১১৫ \\ \underline{১} \\ ১১৫ \end{array} \qquad \begin{array}{r} ১১৫ \\ \underline{৫} \\ ৫৭৫ \\ \underline{১১৫} \\ ১৭২৫ \end{array}$$

কপাট সন্ধি ও স্থান খণ্ড পদ্ধতিতে উভয়েব মধ্যে স্থানখণ্ড পদ্ধতিটি অধিক সহজ। অনেকটা বর্তমানে ব্যবহৃতের অনুরূপ।

পাটীগণিতের প্রথম চারটি প্রক্রিয়ার শেষ প্রক্রিয়াটি ভাগ। যোগের সাথে যেমন বিয়োগের

সম্পর্ক তেমনি গুণের সাথে ভাগের সম্পর্ক। ভাগ সম্ভবতঃ চারটি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। তবু ভারতীয়রা তাকে বাস্তবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রাচীনকালে গণিতজ্ঞরা ভাগ বোঝাতে ভাগহার, ভাজন, হরন ও ছেদন শব্দ ব্যবহার করতেন। ১৭২৫ কে ১৫ দিয়ে ভাগ করতে হলে তৎকালীন ব্যবহৃত নিয়ম অনুযায়ী আমাদের লিখতে হবে।

১৭২৫ $\qquad$ $\frac{১}{\text{ভাগফল}}$

১৫

এখনকার ভাগের নিয়ম অনুযায়ী ১৭ কে ১৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ১ এবং ভাগ শেষ ২। তাহলে নতুন ভাগ

২২৫ $\qquad$ $\frac{১১}{\text{ভাগফল}}$

১৫

এখন ২২ কে ১৫ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ১ এবং ভাগশেষ ৭

শেষ ধাপে ভাগ

৭৫

১৫ $\qquad$ $\frac{১১৫}{\text{ভাগফল}}$

ভাগফল ৫ এবং ভাগশেষ শূন্য।

প্রক্রিয়াটি বর্তমানে ব্যবহৃত পদ্ধতির চেয়ে কঠিন হলেও প্রাচীনকালে ঋষিরা এরূপ ভাগ পদ্ধতি ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন।

বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক ঋষিগণের শুল্বসূত্রে সহজে ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের কয়েকটি নমুনা নিচে দেওয়া হল ঃ

“ $২\frac{২}{৭} + (\frac{১}{২} + \frac{৭}{১২}) + (১ - \frac{১}{৩}) = ৪\frac{১}{২৫}$

$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{২৫} = ১৮৭\frac{১}{২}$

$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{২৫}$ এর $\frac{১}{২}$ = ২২৫ এর ইত্যাদি”

শুল্বসূত্রে বর্গমূল নির্ণয়ের পরিচয় ও পাওয়া যায়। এমনকি ২, ৩ প্রভৃতি অমূলদ রাশির বর্গমূল নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার প্রচেষ্টাও দেখা যায়। তাছাড়া জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বর্গক্ষেত্রকে নানা ভাগে ভাগ করে √২, √৩ প্রভৃতি অমূলদ রাশির স্থূলমান ও নির্ণয় করা হত।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় কাব্যাকারে রচিত কয়েকটি প্রগতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

এগুলো হল ঃ

"১, ৩, ৫.............১৯,২৯,৩৯,৯৯

২, ৪ ৬ ....২০

৪. ৮ ১২.............২০ ইত্যাদি"।

এগুলো আবার সমান্তর প্রগতির উদাহরণ। সমান্তর প্রগতিকে আবার যুগ্ম ও অযুগ্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একটি গুণোত্তর প্রগতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

"২৪,৪৮,৯৬...........১৯৬৬০৮, ৩৯,৩২১৬ ইত্যাদি।"

তাছাড়া সমান্তর ও গুণোত্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয় সম্পর্কেও আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের একটি দৃষ্টান্ত ঃ

[৩×(২৪+২৪+৩২...........+ ৭টি রাশি = ৭৫৬] এ সকল তথ্য থেকে বৈদিক যুগে ঋষিদের পাটীগণিত সম্পর্কে জ্ঞানের উৎকর্ষতাই প্রমাণিত হয়।

শূন্যের আবিষ্কার ও ব্যবহার ঃ

শূন্যের আবিষ্কার সম্পর্কে গণিতজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও এটা অনেকেই আজ স্বীকার করে নিয়েছেন যে হিন্দুরাই শূন্যের প্রথম আবিষ্কারক। দশমিক স্থানিক অংক পাতন পদ্ধতির সহিত শূন্যের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে অনুসরণ করে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। "দশমিক স্থানিক অংক পাতন পদ্ধতি অনুযায়ী তিন হাজার পঁচিশকে আমরা বর্তমানে —

সহস্র	শতক	দশক	একক
৩	০	২	৫

এভাবে লিখলে শতকের ঘরে শূন্য বসল। "অথচ এ পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে তিন হাজারের জন্য একটি প্রতীক, (ইহা অবশ্য সহস্র ও তিনের প্রতীককে মিলিয়ে হত) কুড়ির জন্য একটি প্রতীক ও পাঁচের জন্য একটি প্রতীক ব্যবহার করা হত।" ইহা বেশ জটিল ছিল।

অপরদিকে দশমিক স্থানিক পদ্ধতিতে লিখতে গিয়ে শতকের ঘরে ফাঁক রাখা হল। এ ফাঁক অংশটুকুই শূন্যের (০) প্রতীকে ভরাট শুরু হল। তাই বলা হয়ে থাকে বড় সংখ্যার 'ফাঁক' জায়গা

শূন্য (০) প্রতীকে ভরাট করার উপায় আবিষ্কার না হলে "দশমিক স্থানিক অংক পাতন পদ্ধতি"র আবিষ্কার সম্ভব হত না। তাই মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে "দশমিক স্থানিক অংক পাতন পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে ভারতেই 'শূন্য' ও তার প্রতীক আবিষ্কৃত হয়ছে।"

পিঙ্গল কর্তৃক রচিত —"ছন্দসূত্রে" (খ্রীঃ-পূঃ-২০০ অব্দ) শূন্যের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। প্রায় একই সময়ে ব্যবিলনীয় লিপিতেও ফাঁক স্থানে এক প্রকার কৌণিক (≤) প্রতীক ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। যদিও বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত "০" প্রতীকের সদৃশ নয়। তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে টলেমী তাঁর বিশ্ববিস্রুত গ্রন্থ "অ্যাল্মাদেষ্টে" শূন্যস্থান নির্দেশে গ্রীক অক্ষর '০' (ওমিক্রন) ব্যবহার করেন। এটা অবশ্যই খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারতে আবিষ্কৃত '০' প্রতীক সদৃশ।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে দশমিক স্থানিক অংক পাতন পদ্ধতির মাধ্যমে শূন্যের আবিষ্কার এবং পিঙ্গলের 'ছন্দসূত্রে' তার প্রথম ব্যবহারের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা পরবর্তী পর্যায়ে আর্যভট্ট ও বরাহমিহিরের গবেষণালব্ধ ব্যবহারে আরও সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমানে সমগ্র অংক শাস্ত্রকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে।

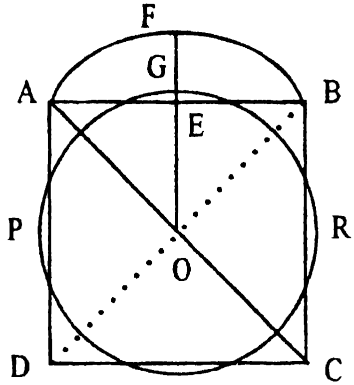
বীজগণিত ও জ্যামিতি ঃ

যজ্ঞানুষ্ঠানে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের একটা অন্যতম অঙ্গ হিসাবে বেদী তৈরী করতে বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্র আঁকার প্রয়োজন হত। ক্ষেত্র আঁকাকে ভিত্তি করেই জ্যামিতির উদ্ভব হয়। এ সকল ক্ষেত্রগুলো জ্যামিতির উদ্ভব ঘটিয়ে থেমে থাকেনি। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতির সংখ্যা থেকে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানের ব্যাপারে বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ দক্ষতাব পরিচয় রেখেছেন। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এসব সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করা হত এবং তা আজও প্রচলিত আছে। শুল্বসূত্রে ও বাখ্শালী পাণ্ডুলিপিতে এরূপ একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ সমীকরণ সমাধানের অনেক নজির আছে।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার ক্ষেত্রের যেমন ব্যবহার পাওয়াযায়, তদ্রূপ একপ্রকার ক্ষেত্রকে অন্যপ্রকারে রূপান্তরিতকরবারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন বর্গক্ষেত্রকে আয়তক্ষেত্রে রূপান্তর, সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ামকে মহাবেদীতে রূপান্তর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানেবেদীকে জ্যামিতিক আকারে রূপান্তরিত করতে গিয়ে বীজ গণিতের উৎকর্ষতা ঘটে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে একটা বর্গক্ষেত্রের বাহু 'a' এর পরিমাণ জানা থাকলে এবং অজানা আয়তক্ষেত্রের একটি বাহুর মান 'b' জানা থাকলে নিম্নলিখিত সমীকরণ $bx = a^2$ থেকে তৎকালীন সময়ের মুণিঋষিরা সহজে অপর বাহু (x) এর মান নির্ণয় করতে পারতেন। মূলতঃ উপরে উল্লেখিত সমীকরণটি একটি একঘাত সমীকরণ।

এভাবে যজ্ঞের প্রয়োজনে কখনও বর্গক্ষেত্রকে রম্বসে বা একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্রে রূপান্তর করতে গিয়ে বীজগণিত ও জ্যামিতি উভয়ই সমৃদ্ধ হয়েছে। এমনকি

তৎকালীন সময়েই জ্যামিতির সাহায্যে π (পাই) এর মান নির্ণয় করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছিল। নীচে একটি প্রদত্ত বর্গক্ষেত্রের সমান একটি বৃত্ত আঁকার চিত্র প্রদর্শিত হল।



(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত History of Science and Technology in Ancient Indiaর সৌজন্যে)।

"যদি 'a' বর্গক্ষেত্রের একটি বাহু হয় এবং 'b' রূপান্তরিত বৃত্তের ব্যাস হয়। তবে তৎকালীন সময়ে ববহৃত সূত্রানুযায়ী লেখা যায় —

$$a = b - \frac{2}{15} d = d - \frac{2}{15} d$$

আবার বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi \frac{d^2}{4}$

সুতরাং উপপাদ্য অনুযায়ী -

$$a^2 = d^2\left(\frac{13}{15}\right)^2$$

$$\therefore \pi \frac{d^2}{4} = d^2\left(\frac{13}{15}\right)^2$$

$$\therefore \pi = 4. \left(\frac{13}{15}\right)^2 = 3.0044"$$

এ'ভাবে আর্যযুগেই π (পাই) এর আনুমানিক মান নির্ণয় পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

তাই বলা চলে যাগযজ্ঞে ব্যবহৃত বিভিন্ন আকারের জ্যামিতিক চিত্র থেকে এটা স্পষ্ট বৈদিক আর্যরা শুধু বীজগণিতেই পারদর্শী ছিলেন না, তারা এক সাথে জ্যামিতিক শাস্ত্রেও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় রাখতে সমর্থ ছিলেন। বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল "শুল্ব"। শুল্বকারগণ ঋজুরেখা ক্ষেত্র তৈরী, ক্ষেত্রফল, সমফল নিরূপণে বৃত্তকে রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয়

রেখেছেন। বৈদিক যুগের শুল্বকারগণের এই নৈপুণ্য বিশ্লেষণ করে হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে, টমাস হীথ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন বর্তমান জ্যামিতি শাস্ত্রের অন্যতম উপাদান পিথাগোরাস সূত্রের মূল উদ্ভাবক পিথাগোরাস নহে। এ সূত্র পিথাগোরাসের অনেক আগেই অর্থাৎ বৈদিক যুগের শুল্বকারগণের উদ্ভাবিত সূত্র —

"একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্রের উৎপন্ন করে, তার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান" এ রূপান্তরিত উপপাদ্য বিশেষ। তবে পরিবেশনের দিকে থেকে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও শুল্বসূত্রে উল্লেখ্য (৫, ১২, ১৩), (৭, ২৪, ২৫), (৮, ১৫, ১৭), (১২, ৩৫, ৩৭) এবং (১২, ১৬, ২০) ইত্যাদি মানগুলো পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী সমকোণী ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সংখ্যার সাথে সংগতিপূর্ণ। এখানে পিথাগোরাসের সূত্রানুযায়ী উপরের মানগুলো যথাক্রমে সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি, সমকোণ সংলগ্ন বাহু ও অতিভূজের পরিমাপ। অপরদিকে শুল্বসূত্র অনুযায়ী সেগুলো হবে যথাক্রমে আয়তক্ষেত্রের সমকোণ বাহুদ্বয় ও কর্ণের পরিমাপ। তাই বলা চলে পরিবেশনের দিক থেকে পিথাগোরাসের সূত্রটি সামান্য পার্থক্য থাকলেও পরিমাপের দিক থেকে কোন পার্থক্য নেই। ডঃ বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের মতে, বৈদিক শুল্বকারগণ পিথাগোরাসের অনেক আগেই এই উপপাদ্যের ব্যবহার জানত। তবে এই সম্পর্কে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

জ্যোতির্বিদ্যা ঃ সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায় সেই সময়ে প্রকৃতি নির্ভর কৃষিকাজ পরিচালনার স্বার্থে জ্যোতির্বিদ্যার চর্চা হত। বৈদিক যুগেও পশুপালন থেকে কৃষিতে রূপান্তরের স্বার্থে বৈদিকরা তদ্রূপ জ্যোতিষ চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তবে যাগযজ্ঞে বিশ্বাসী বৈদিকরা কৃষি কার্যের চেয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, বা অন্যান্য নক্ষত্রের গতিবিধি চর্চায় অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাই বৈদিক যুগের মাঝামাঝি 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যাদি রচনার কাল থেকে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় উৎকর্ষতা লক্ষ্য করা যায়। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে জ্যোতিষকে নক্ষত্র বিদ্যা রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

এখন স্বাভাবিক প্রশ্ন তৎকালীন ভারতে এ'রূপ নক্ষত্রবিদ্যা চর্চার ভিত্তি কি ছিল? তখনও যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশ লাভ করেনি। দূরবীণ বা তদ্রূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। তথাপি ভারতীয় ঋষিরা কিসের ভিত্তিতে জ্যোতিষচর্চায় এত পারদর্শিতা অর্জন করেছিল?

মূলতঃ আকাশ পর্যবেক্ষণই ছিল এ'রূপ জোতিষচর্চার মূল ভিত্তি।

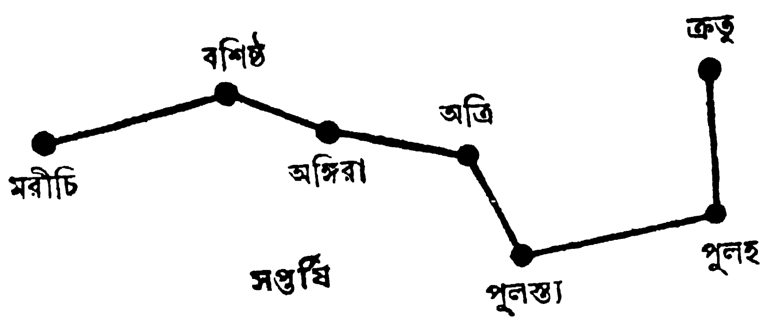
প্রাচীন কালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং আকাশ পর্যবেক্ষকেরা কৌতুহল ভরে লক্ষ্য করলেন আকাশে তারারা স্থির নয় গতিশীল। সততঃ আকাশ পথে আবর্তনরত। সূর্য যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে তদ্রূপ চোখে দেখা তারা ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে অভিমুখে গতিশীল।

সূর্য যেমন দিনের বিভিন্ন সময় আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় বা চন্দ্রকে রাতের বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায় তদ্রূপ তারাদেরও রাতের বিভিন্ন সময় আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। অবশেষে যত সময় পার হয় তারারা তত পশ্চিমে সরে যায়। কিন্তু তারারা অনেক দূরের বস্তু তাই তাদের এ'রূপ সরণ অত্যন্ত ধীর বলে আমাদের মনে হয়। এতধীর যে

একদিন কতদূর সরল তা বোঝা কঠিন। তবে পনের দিন বা একমাস যদি একটি তারাকে লক্ষ্য করা যায় তাব দেখা যাবে যে তারাটা অনেকটা পশ্চিমে সরে গেছে।

এভাবে লক্ষ্য করলে রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় কোন একটি নির্দিষ্ট উজ্জ্বল নক্ষত্রকে আকাশে দেখা যাবে না। অথচ বছরের একটি সময়ে রাতের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আকাশের নির্দিষ্ট অবস্থানে সেটা দেখা যায়। বছরের একই সময়ে একই তারাকে নির্দিষ্ট অবস্থানে দেখে প্রাচীনকালে ঋষিরা ঋতুর হিসেব বাখতেন। এ পদ্ধতিতে তাঁরা নিশ্চয় এ'রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যেকোন নির্দিষ্ট উজ্জ্বল তারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রাতের আকাশে দেখা দিলে পৃথিবীতে বর্ষা নামে। আবার দুমাস পরে একটা উজ্জ্বল তারার আগমনে পৃথিবীর ঘাসে শিশির পড়তে শুরু করে। শিউলীফুল ফোটে। ধানের মাঠ তখন সবুজে ভরে যায়। তার নাম শরৎ। এমনিভাবে তৎকালীন ভারতে ঋতু পরিবর্তন চিহ্নিত হত। আর কৃষিকাজ, পূজাপার্বন সম্পন্ন হত। পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য বৈদিক ঋষিরা সূর্য্যকে ঋতু পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

শুধু একটি তারার অবস্থানই নয় বৈদিক ঋষিরা তারায় তাবায় ভরা এক একটি মণ্ডলেরও কল্পনা করেছেন। এ'রূপ একটা মণ্ডল হল সপ্তর্ষি মণ্ডল। সাতজন ঋষির নামে এক একটি তারা পরিচিত। ফাল্গুন চৈত্র মাসে উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলকে দেখা যায়। তাদের পরিচিতি নিম্নরূপ।

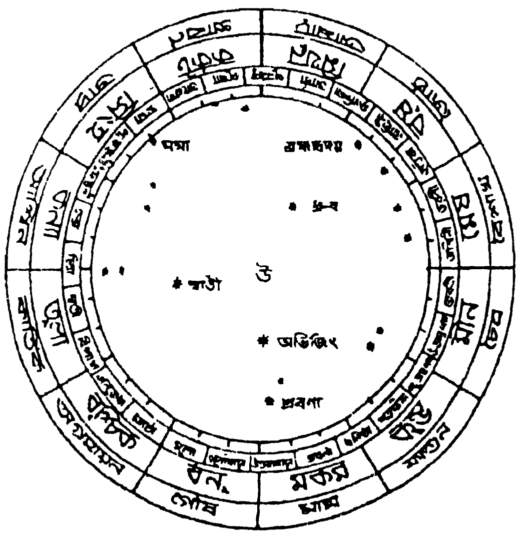


এ সকল সাহিত্য বা শাস্ত্র সম্পর্কীয় বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রথমদিকে বৈদিক হিন্দুরা '৩০' দিনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ দিনের হিসাবে বৎসর গণনা করতেন। আবার বিশেষ ক্ষেত্রে ১৩ মাসে বৎসরের হিসাব ও দেখা যায়। সেই সময়ে ঐ ত্রয়োদশ মাসটি 'মলমাস' হিসাবে পরিচিত হত। ক্ষেত্রবিশেষে আজও মলমাসের ব্যবহার প্রচলিত আছে। বর্তমানেও তিথি বা পূজা সাধনে এ মলমাসের গুরুত্ব বিবেচিত। তাতে অবশ্য ১৩ মাসের বৎসরের হিসাব গণ্য করা হয় না। তবে তৎকালীন সময়ে 'চান্দ্রবৎসর' ও 'সৌরবৎসর' উভয় ধরনের বৎসরের হিসাব করা হত বলে উভয়ের মধ্যে সাযুজ্যের নিয়মেই এই মলমাসের ব্যবহার ছিল বলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

তৎকালীন সময়ে সাধারণত চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হত। পূর্ণিমা (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অমাবস্যা)

হতে মাস আরম্ভ হত। যে পূর্ণিমায় চন্দ্রের অবস্থান পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে আসত সেই দিনকে বৎসরের শেষ দিন হিসাবে গণ্য করা হত। পরের দিন থেকে বৎসর আরম্ভ হত। তাই সাধারণতঃ ফাল্গুন মাস থেকে বৎসর শুরু হত। তবে কোন কোন বৎসর পূর্ণিমায় দিনে পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে চন্দ্রের একমাস পিছিয়ে যেত। তাই সেই বৎসর ১৩ মাসে বৎসর হত। তবে সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বৎসরের দুইটি ভাগ ছিল। 'মকর ক্রান্তি' থেকে 'কর্কট ক্রান্তি'তে আবর্তনকে 'উত্তরায়ন' এবং 'কর্কটকান্তি' থেকে পুনরায় 'মকরক্রান্তি'তে আর্বতনকে 'দক্ষিণায়ন' নামে সূর্যের দুইটি অবস্থানের কথা ' শতপথ' ও 'কৌশিতকি' ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে। তৎকালীন সময়ে জ্যোতির্বিদরা মকরক্রান্তি, কর্কটক্রান্তি, জলবিষুব, মহাবিষুব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করতেন। সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বৎসর গণনা পরবর্তীকালে চান্দ্রমাসের বৎসর গণনা সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো সংশোধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়। তাই সূর্যের অবস্থানের ভিত্তিতে বৎসর গণনা বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবে আজ সর্বজনস্বীকৃত।

ঋক্‌বেদের একটি স্তোত্রে আকাশ পথে সূর্যের আপাত গতিকে বারটি পাকিযুক্ত চাকার সহিত তুলনা করা হয়েছে। টীকাকার সায়নের মতে, চাকার বারটি পাকি রাশিচক্রের প্রতীক। সূর্যের আপাত গতি নির্ধারণের জন্যও প্রাচীনকাল থেকেই রাশিচক্রের ও ক্রান্তিবৃত্তের অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক জ্যোতির্বিদদের মতে খগোলে সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমন পথ প্রায় একই প্রকার। উভয়ে বৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করে থাকে। কারণ রাশিচক্রের অন্তর্গত অশ্বিনী, ভরনী, কৃত্তিকা, রোহিনী, মৃগসিরা, আদ্রা পুর্নবসু, পূয্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাশা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শর্মিষ্ঠা, পূর্ব ভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ ও রেবতী প্রভৃতি সাতাশটি নক্ষত্রের সাহায্যে ভাগ করে চক্রের গতি নির্ণয় করা হত। নীচে বর্ণিত চিত্রে বৈদিক রাশিচক্রের একটি নমুনা তুলে ধরা হল।



সমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত বিজ্ঞানের ইতিহাস গ্রন্থের সৌজন্যে

প্রথমদিকে চক্রের পর্যায়কাল বিশ্লেষণের দ্বারা জ্যোতিষচর্চা হলেও পরবর্তীকালে সূর্যচক্র অথবা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহদের পর্যায়কাল রবিমার্গকে অনুসরণ করে নথিভুক্ত হতে থাকল। এতে রবিমার্গের অন্তর্গত নক্ষত্রের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় এবং কাল নির্ণয় ও পঞ্জিকা প্রণয়ন আরও নির্ভুল হয়। রবিমার্গ অনুযায়ী সৌরমাসের ব্যবহারে কোন কোন বছরে তের মাসের ব্যবহারজনিত জটিলতা কাটানো গেল। তবে চান্দ্র মাসের সূচনা অনুযায়ী বৈদিককালে বৎসরের বিভিন্ন মাসের যে নামকরণ করা হয়েছিল সৌর মাসের ব্যবহারে তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। একটা উদাহরণের সাহায্যে তা পরিষ্কার করা যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে চন্দ্রমাস শুরু হত পূর্ণিমার পরের দিন থেকে। আর শেষ হত পূর্ণিমায়। রাশিচক্রের ২৭টি নক্ষত্রের নামকরণের সাথে সংগতি থাকত মাসের নামকরণ।

ধরা যাক বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হলে পরবর্তী মাসের নাম বৈশাখ রূপে পরিচিত হত। অনুরূপভাবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ। পূর্বষায়া থেকে আষাঢ়, শ্রবনা থেকে শ্রাবণ, পূর্ণভাদ্র পদ থেকে ভাদ্র, আশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক, মৃগশীর্ষ থেকে অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, উত্তর ফাল্গুনী থেকে ফাল্গুন, আর চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নামকরণ হয়েছে।

অপরদিকে সৌরমাস ও সৌরবর্ষ গণনায় দেখা যায় বিশাখা রাশিতে যখন পূর্ণিমা, সূর্য তখন উল্টোদিকে মেষরাশিতে আসে। রাশিচক্রের প্রথম রাশির নাম মেষ। তাই বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুযায়ীই বৈশাখ মাস বৎসরের প্রথম মাস। ফলে সৌরভিত্তিক বছরের প্রথম মাস ও এল বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুযায়ী অর্থাৎ বৈশাখ মাস। এমনিভাবে রাশিচক্রের নক্ষত্রের অবস্থান অনুযায়ী সৌর বছরের অন্যান্য মাসের নামও চন্দ্র মাসের নাম অনুযায়ীই স্থির রয়েছে। তাই মাসের নাম গুলো উভয় ক্ষেত্রে একই রয়ে গেছে।

ঋক্‌বেদের কাল হতেই বৈদিক ঋষিরা সাতটি গ্রহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র গ্রহগুলোর নাম ঋক্‌বেদেও পাওয়া যায়। ঋকবেদে উল্লেখিত ৩৪টি পঞ্জর ও ৩৪ জ্যোতিষ সম্পর্কে লুডউইক, জিমার সহ আধুনিক ভাষ্যকারগণ অনুমান করেন ৩৪টি জ্যোতিষ্ক দ্বারা তৎকালীন সময়ের জ্যোতিবিদরা সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি আটটি গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্রকে একসাথে বুঝানোর চেষ্টা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'পরিমণ্ডল' রূপে বর্ণনায় অনেকে মনে করেন বৈদিক ঋষিরা পৃথিবীকে একটি গোলক হিসাবে জ্ঞান করতেন। চন্দ্রকলার সহিত সূর্যের একাধিক সম্পর্কের উল্লেখ থেকে এটা মনে করা যায় বৈদিক ঋষিরা জানতেন চন্দ্রের নিজস্ব আলো নাই — সূর্যের আলোতে আলোকিত। এছাড়া বিংশ শতাব্দীর বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের অভিমত — পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি সম্পর্কে বৈদিক ঋষিদের জ্ঞান ছিল।

বৈদিক যুগের শেষভাগে (খ্রীঃ পূর্ব ৬০০-২০০ অব্দে) রচিত "বেদাঙ্গ জ্যোতিষ" নামের গ্রন্থটি জ্যোতিষি চক্রের একটি অতি উন্নত সংস্করণ। এতে বৎরের হিসাবে ৩৬০ দিনের স্থানে ৩৬৬ দিনের কথা বলা হয়েছে। এবং একটি পঞ্চবার্ষিক চান্দ্র সৌর পর্যায়কালের উল্লেখ আছে। এর পর্যায়কালের মধ্যে ১৮৩০টি সায়নদিন, ১৮৩৫টি নক্ষত্রদিন, ৬২টি চান্দ্র, ১৮০০টি সৌরদিনে সূর্যের পরিক্রমণ (৫) এবং চন্দ্রের পরিক্রমণ (৬৭) এর উল্লেখ আছে। এর সাহায্যে দিনকে সূর্যের পরিক্রমণ কাল দিয়ে ভাগ করে (১৮৩০ ÷ ৫) বৎসরের মোট দিন সংখ্যা ৩৬৬ পাওয়া যায়। এ

হিসাবটি বর্তমানে ব্যবহৃত ৩৬৫ দিনে বৎসরের হিসাবের সাথে অনেক সংগতিপূর্ণ। এছাড়া শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে অশ্লেষা নক্ষত্রের অবস্থান, গ্রহ ও নক্ষত্র একজাতীয় জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি আধুনিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে দিনকে অনেকগুলো ছোট ছোট এককে ভাগ করার কথাও বলা হয়েছে। যেমন ঃ

" ১দিন = ৩০ মুহূর্ত
১ মুহূর্ত = ১৫ ক্ষিপ্র
১ ক্ষিপ্র = ১৫ ইতর্হি
১ ইতর্হি = ১৫ ইদানী
১ ইদানী = ১৫ প্রাণ।

অর্থাৎ এক প্রাণ হল দিনের $\frac{১}{১৫ \times ১৫ \times ১৫ \times ১৫ \times ৩০}$ অংশ

বর্তমান হিসাবে প্রায় $\frac{১}{১৮}$ সেকেন্ড।"

তবে তৎকালীন সময়ে ভারতসহ অন্যান্য সভ্যদেশেই এত ক্ষুদ্র সংখ্যা পরিমাপের কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না। তাই তারা সাধারণত এরূপ ভগ্নাংশের জটিলতা এড়িয়ে চলার জন্য ছোট ছোট এককের ব্যবহার করতেন।

ক্রান্তি বিন্দুর অয়ন চলন বিষয়ে বৈদিক ঋষিদেব জ্ঞান সম্পর্কে কোন প্রমাণিত তথ্য পাওয়া যায় না। ইহা জ্ঞানের সীমিত রূপ সম্পর্কে আলোকপাত করলেও ঐ তথ্যের ব্রাহ্মণে পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থানগত দিন থেকে যজ্ঞাদি শুরু করার রীতি প্রচলিত ছিল। সেই দিনটি বস্তুতঃ মহাবিষুব নামে পরিচিত। মহাবিষুব পরবর্তীকালে ক্রমশঃ মৃগশিরা, রোহিনী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের দিকে সরে যায়।

যন্ত্রপাতি ব্যতীত খালি চোখে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের পর্যায়কাল পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে এটা অবশ্যই প্রমাণিত যাগ-যজ্ঞের স্বার্থে হলেও বৈদিক যুগে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা মহা জাগতিক বস্তুর ভৌত আচরণ সম্পর্কে বর্তমানেও অনেক পাথেয় যুগিয়ে চলেছে।

চিকিৎসাবিদ্যা ঃ জীবদেহে রোগ থাকবে এটা চিরন্তন সত্য। তাই রোগ মুক্ত হতে সব প্রাণীর আচরণে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আদিকালে মানুষ যখন পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করত, তখনও সে অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে লতাপাতা, গাছের ছাল, মূল প্রভৃতি চিবিয়ে খেয়ে রোগমুক্ত হতে চেষ্টা করত।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার নগর পরিকল্পনায় পয়ঃপ্রণালী ও জলনিষ্কাষণ সম্পর্কে যে উন্নত স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, সে সময়ের অধিবাসীগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে বেশ সচেতন ছিলেন। তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিচার বিশ্লেষণে এটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে, সে সময়ে উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তারা রোগ যন্ত্রণা

থেকে মুক্ত হতে সচেষ্ট ছিলেন।

তবে বৈদিক যুগে চিকিৎসা সম্পর্কীয় জ্ঞানের যে গোড়া পত্তন ঘটে সে সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। অথর্ববেদ ও তাহার অনুষঙ্গ আয়ুর্বেদ বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকৃষ্ট হলেও আয়ুর্বেদোক্ত কালেই রোগের ত্রিদোষবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্‌বেদ সংহিতায়।

অথর্ববেদের নানা মন্ত্রে ও স্তোত্রে শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। এমনকি ঋষি নারায়ণ মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে যে আলোচনা করেন, তা অথর্ব বেদোত্তর পর্বে আত্রেয় চরক সুশ্রুত প্রবর্তিত হিন্দু শারীর বিদ্যা (অ্যানাটমি) সাথে গুরুত্বপূর্ণ। তক্মন (জ্বর), আস্রাব (পেটের অসুখ), কাসিকা (কাশ), বলাস (যক্ষ্মা), জলোদর, অপচিৎ (ক্ষত), বিদ্রধ (ফোড়া), কিলাস (কুষ্ঠ), শীর্ষক্তিশ্র (শিরঃপীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা), অলহী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপস্মার, গ্রাহী (ভুতে ধরা) অক্ষত (ব্রন বা টিউমার) প্রভৃতি রোগের উল্লেখ আছে। অথর্ববেদের ঋষিগণ বংশগতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ইহা ক্ষেত্রীয় নামে পরিচিত ছিল।

শুস্ক, সিক্ত, সঞ্চারী নামক তিন ধরনের পদার্থের আক্রমণে বিভিন্ন রোগের উৎপত্তি হয় বলে অথর্ববেদে বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে রোগের কারণ সম্পর্কে সায়নাচার্যগণের প্রবর্তিত "বায়ু, পিত্ত, কফ" অথর্ব বেদে উল্লিখিত পদার্থের বিবর্তিত ধারণা বলে অনেকে মনে করে থাকেন। তবে অথর্ববেদে রোগের কারণ হিসাবে উল্লিখিত তিন ধরনের পদার্থের কথাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রোগাচার্যগণ মনে করতেন, বিভিন্ন প্রকার অপদেবতার আক্রমণে মানব শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার সময়ে সময়ে দেবতাগণ রুষ্ট হলেও মানবদেহে রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন জলোদর রোগের কারণ বরুণদেব। তাই অথর্ববেদে অপদেবতাদের বিতারণ ও দেবতাদের সন্তুষ্টি করার জন্য নানা মন্ত্র, স্তোত্র বা মাদুলি ধারণের উল্লেখ আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার আজও অনেকে এরূপ কুসংস্কার দ্বারা পরিচালিত। মূলত বোগের সঠিক কারণ ব্যাখ্যায় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাই এ সব আচরণের জন্য দায়ী। এ সত্যটা আমরা অনেকেই মেনে নিই না। তবে অথর্ববেদে মন্ত্র ও মাদুলী ব্যবহারের সাথে নানাবিধ উদ্ভিদ ও ভেষজের ব্যবহারের কথাও বর্ণনা আছে। গাছ গাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসার ও প্রচলন ছিল। গাছ গাছড়ার সাহায্যে যাহারা চিকিৎসা করতেন তাদের বলা হত 'ভিষক'। অথর্ববেদে এ রকম শত শত 'ভিষক' ও ভেষজের উল্লেখ আছে। কৌশিক সূত্রে ও অনেক বিষয়, যেমন হরিদ্রা, পলাশ, কাম্পিল, তিল, মুণ্ডুও, ক্রিমুক, হরতকী, পুতিকী ইত্যাদি বহুবিধ ভেষজের উল্লেখ পাওয়া যায়। উদ্ভিদ ও লতাগুল্মের ভেষজগুণ নিয়েই আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষের সাথে গাছপালাব যেখানে পরিচয় তাদের শরীরতত্ত্ব, বৈশিষ্ট, শ্রেণীবিভাগ প্রভৃতি আধুনিক জ্ঞানেরও প্রসূতি কাল বৈদিক যুগ।

(৪০০০-২০০০) খ্রীষ্টপূর্বে প্রণীত তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়ী সংহিতাতে উদ্ভিদের দুটি প্রধান অংশ মূল ও তুলের কথা বলা হয়েছে। তুল আবার কাণ্ড, বৎস, পুষ্প আর ফল এ'চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এ'ছাড়া স্কন্দ, শাখা ও পাতার কথাও আছে। বীজকোষ, বীজপত্র, শস্য এ'রূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল বীজ। উদ্ভিদ দেহের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কেও বৈদিক ঋষিদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন ত্বক (Skin), মাংস (Soft tissues), অস্থি (Wood bone), মজ্জা (Puls), স্নায়ু (Fibres) ইত্যাদি।

বৈদিক যুগে উদ্ভাবিত উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ও প্রয়োগিক দিক থেকে যথোপযুক্ত বলে আজও অনেকে মনে করেন। এ'শ্রেণী বিভাগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১) প্রকৃতি অনুসারে

মনু সংহিতায় (১/ ৪৬-৪৮) এরূপ শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আছে। যেমন ঃ

"বৃক্ষ — যার ফুল ও ফল দুইই হয়।

গুচ্ছ — যারা গুচ্ছ আকারে জন্মে।

গুল্ম — ঝাড়যুক্ত ছোট গাছ।

তৃণ — ঘাস।

প্রতান — বিস্তারিনী লতা।

বল্লী — অন্য গাছকে বেষ্টন করে যারা থাকে।

বনস্পতি — যার ফুল হয় না কিন্তু ফল হয়।

ঔষধি — যে গাছ একবার ফল দিয়ে মরে যায়" এ'ছাড়া ফেনিল, চর্মিন, বহুপাদ প্রভৃতি নামের উদ্ভিদগুলোও তাদের গ :পরিচায়ক।

২) গুণ অনুসারে

গুণ অনুসারে চরক উদ্ভিদকে (সূত্রস্থান -৪) বিরেচন ও কষার এ'ভাবে ভাগ করেছেন। চরকের মতে প্রথম ধরনের গাছের সংখ্যা ৬০০ এবং দ্বিতীয় ধরনের গাছের সংখ্যা ৫০০ ।

গুণ অনুসারে সুশ্রুত সমস্ত উদ্ভিদ জগতকে ৩৭ ভাগে ভাগ করেছেন।

৩) আহারের উপযোগিতা অনুসারে ঃ চরক (সূত্রস্থান ২৮) খাদ্যমূল্য হিসাবে উদ্ভিদকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।

"ধান্য বর্গ ঃ খোসাযুক্ত খাদ্য । যেমন ধান, যব, গম ইত্যাদি।

শমীধান্য বর্গ ঃ মুগ, মাষ প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য।

শাক বর্গ ঃ বিভিন্ন ধরনের শাক।

ফল বর্গ ঃ বিভিন্ন ফলের উদ্ভিদ।

হরিৎ বর্গ ঃ আর্দ্রতা মূলক প্রভৃতি (সবুজ শ্রেণী)।

আহার যোগী বর্গ ঃ তিল, সর্ষপ প্রভৃতি।"

৪) নামানুসারে ঃ যেমন অশোক, বোধিদ্রুম, শিবশেখর, যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি।

৫) ভেষজ গুণানুসারে ঃ যেমন দদ্রুঘ্ন, অর্শোঘ্ন প্রভৃতি।

৬) নিত্যপ্রয়োজনানুসারে : লেখার জন্য ব্যবহৃত যেমন 'লেখন' তদ্রূপ দাঁতনের জন্য দন্তধাবন ইত্যাদি ।

৭) গঠন বৈচিত্রানুসারে : যেমন ত্রিপত্রী, পঞ্চাঙ্গুল, শতমূলী ইত্যাদি।

৮) ভৌগলিক সংসর্গানুসারে : যেমন মাগধি, ওড্রপুষ্প, চাম্পেয় প্রভৃতি।

৯) প্রাকৃতিক সংসর্গানুসারে : যেমন জলজ, নদীসর্জ, মরুবকের প্রভৃতি।

১০) ঋতু সংসর্গানুসারে : যেমন শীত ভীরুতে, মাঘ্যতে, শারদীতে প্রভৃতি।

এ'ছাড়া বৃহদারণ্যক উপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায় নবম ব্রাহ্মণ) মানুষের শরীরের সাথে উদ্ভিদের তুলনা করা হয়েছে। বৃক্ষের মূলকে মানুষের মুখের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা সংস্কৃতে বৃক্ষকে 'পাদপ' বলা হয়। যে পার সাহায্যে পান করে তাকে পাদপ বলে। বৃক্ষ মূলের (পদ) সাহায্যে পান করে বলে বৃক্ষকে পাদপ বলা হয়। এছাড়া আমাদের শরীরের অস্থি, মাংস, মজ্জা ও স্নায়ু, বৃক্ষের কাঠ, ত্বক, মজ্জা আর স্নায়ুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব প্রমাণ করার আগেও প্রাচীনকালের ভারতীয় মনীষীরা উদ্ভিদের প্রাণের কথা বলে গেছেন। এ'সম্পর্কে ভাগবত গীতার একটি শ্লোক প্রণিধানযোগ্য।

পশুবৃক্ষাদিভেদেন জীব এব স্বতঃ স্থিতিঃ ।
সংসৃতৌ ব্যতায়স্তেষাং মুক্তৌ তত্তৎসবরূপতা
তত্র স্থাবরমুক্তেভ্যো বরা জঙ্গমমুক্তকাঃ ।
তেভ্যো মানুষ মুক্তশ্চ বিপ্রমুক্তাস্ততোহধিকাঃ ।।

অথর্ব সংহিতায় (৯/১০) মানুষের শরীরের মাথা, ললাট, ঘাড়ের গাঁট, হনু, অধরহনু, জিভ, দাঁত, গ্রীবা, কাঁধ, কাঁধের হাড়, বিধরন (মেরুদণ্ড), ক্রোড় পেট, পাজরা, প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনা তৎকালীন ভারতে শারীর বিদ্যার উৎকর্ষতাই প্রমাণ করে। এছাড়া ১০/২ সূত্রে উল্লিখিত তালিকা থেকেও "অঙ্গুলি, জঙঘা, সন্ধি, উরু, শ্রেণী, গ্রীবা, কবন্ধ, স্তন, বাহু, পদ, কর্ণ, নালিকা, চক্ষু, জিহ্বা, ললাট প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা উল্লেখের দাবী রাখে। প্রাচীন ভারতে আঠার প্রকার ইঁদুরের কথা বলা হয়েছে এবং ইঁদুরে কামড়ালে যে বিষক্রিয়া হয় তার চিকিৎসা সম্পর্কেও সুশ্রুতে (কল্পস্থান ৬) বলা হয়েছে। তাছাড়া ছয় প্রকার পিপড়ে, ছয় প্রকার মাছি, পাঁচ প্রকার মশা এবং বার প্রকার জোঁকের কথা সুশ্রুতে (সূত্রস্থান ১৩, কল্পস্থান ৮) উল্লেখ আছে। এ'সকল প্রাণীদের হানিকর ক্রিয়াকর্মের কথা এবং তার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও আলোচনা আছে।

কৌশিক সূত্রে ক্ষতস্থানে জলৌকা সর্পদিষ্ট স্থান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বিষমুক্ত করা ইত্যাদি চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ আছে। আবও উল্লেখ্য যে, কৌশিক ঋজাত্ব, পরাবৃজ, কন্ব ও কক্ষিবতের অন্ধত্ব দুর করতে এবং বহু বন্ধ্যানারীকে সুপ্রজ্ঞা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এসব ঘটনার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও এটা সহজেই অনুমেয় যে বৈদিক যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রণালীবদ্ধ রূপ পরিগ্রহীত হয়েছিল। কালক্রমে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ঘটতে

থাকে। অথর্ববেদে উল্লেখিত শারীরবৃত্তীয় পরিচর্যাদি এবং রোগ চিকিৎসায় ভেষজের ব্যবহারে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে অথর্ববেদে উল্লেখিত চিকিৎসাবিদ্যার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী যুগে 'আয়ুর্বেদ' নামে আর একটি গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে। বৈদিক ঋষিদের কারও কারওমতে ইহা একটি অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ। তবে লক্ষ শ্লোকে আয়ুর্বেদ, ছয় হাজার শ্লোকে রচিত অথর্ববেদের উপাঙ্গ না হলেও বহু ক্ষেত্রেই উভয়ের মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যাই হোক অথর্ববেদের তুলনায় আয়ুর্বেদ অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ এবং রোগ চিকিৎসায় অনেক বেশী উৎকর্ষতার দাবী রাখে।

আয়ুর্বেদ মোট আট ভাগে বিভক্ত, যথা (১) কায়তন্ত্র (সাধারণ চিকিৎসা), (২) শল্যতন্ত্র (শল্যবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা), (৩) শালাক্যতন্ত্র (চক্ষুকর্ণ, নাসিকা, গলদেশের চিকিৎসা), (৪) ভূতবিদ্যা (মনোবিকার বাতুলতা প্রভৃতি রোগের আলোচনা ও চিকিৎসা), (৫) কৌমার ভুত (শিশু চিকিৎসা), (৬) অগদ তন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়া সম্পর্কীয়), (৭) আরষ্যানি (রসায়ন বা বার্ধক্যের স্বাস্থ্যবিধি) এবং (৮) বাজীকরণ তন্ত্র (কামজ ও পুনর্যৌবন প্রাপ্ত) ইত্যাদি।

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে শারীর বৃত্ত ও প্রণালী বদ্ধ চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার দিক থেকে ভারত শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তবে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বা একক রচয়িতা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কিংবদন্তীরূপে ব্রহ্মাকে আয়ুর্বেদের জনক ধরে নিলেও পরবর্তী সময়ে নানা বৈদিক ঋষিদের সহযোগিতায় এ শাস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাই অধ্যাপক সেনের মতে আয়ুর্বেদের ঋষিদের বিবর্তনের ইতিহাস নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়।

"গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আর্যরা পারদর্শিতা অর্জন কবতে থাকলেও বশিষ্ঠ, বিশ্বমিত্র ও ভরদ্বাজ প্রমুখ ঋষিরা সমাজে বিশেষ করে পাঞ্চালভূমিতে রাজন্যবর্গের কূল পুরোহিত রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। তাঁরাই মূলতঃ বেদের বিভিন্ন শ্লোকগুলো রচনা করেছিলেন। এ সকল আর্য পুরোহিতদের সাহায্যে রাজন্যবর্গ সে সময়ে প্রচলিত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মূলে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিলেন। তারাই প্রথম আর্য সমাজে দাস প্রথার প্রবর্তন কবেন। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ দাসপ্রথা ক্রীতদাস ব্যবস্থায়ও পরিণত হয়েছিল। তাই এ সময়কেই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রসূতিকাল রূপে চিহ্নিত করা অন্যায় হবে না"।

(চ) লিপি ও বর্ণমালা আবিষ্কার

লিপি হল সভ্যতা বিকাশ ও সঞ্চালনের অন্যতম পাথেয়। তাই লিপির উদ্ভাবনা মানুষের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারগুলোর অন্যতম। যে উন্নত মস্তিষ্ক নিয়ে আপনারা গর্ব করছেন তা অবশ্যই অকেজো হয়ে থাকত যদি লিপি আবিষ্কার না হত। যদিও লিপি আবিষ্কার আপনাদেরই কৃতিত্ব তথাপি আমি শুধু সাক্ষী হিসাবে তার বিবর্তনের কিছু তথ্য তুলে ধরব।

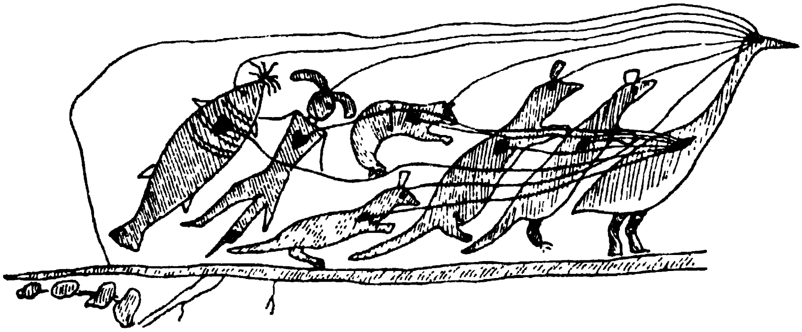
লিপি হল বক্তার বক্তব্যের লৈখিক প্রতিরূপ। বক্তব্যের ধ্বনি ও ভাব লিপির মধ্যে চিরস্থায়ী রূপে প্রকাশ পায়। উচ্চারিত শব্দের ধ্বনি বৈচিত্র ও ভাব পাথর, ধাতু, কাঠ, চর্ম, বস্ত্র, কাগজ বা অনুরূপ বস্তুর উপর বিশেষ বিশেষ সংকেতের সাহায্যে পাকাপাকিভাবে খোদিত বা চিহ্নিত করার মাধ্যমে যে প্রতিরূপ ফুটে তাহাই লিপি নামে পরিচিত। মূলত খ্রীষ্টঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমভাগে লিপির আবিষ্কার হয়েছিল। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কালের তুলনায়, লিপির আবিষ্কার কাল নিতান্তই সাম্প্রতিক। লিপির আবিষ্কার হল পাঁচ-ছয় হাজার বছরের বেশী নয়। এমনকি পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক লিপির ইতিহাস আরও সাম্প্রতিক। লিপির অনাবিষ্কারে প্রস্তর যুগ থেকে মানুষের নব্য প্রস্তর যুগে উত্তরণে হাজার হাজার বছর লেগেছিল। কারণ মানুষ সভ্যতা বিকাশের ঊষালগ্নে প্রয়োজনের তাগিদে যা শিখেছিল তা লিপিবদ্ধকরণের অভাবে এক সময়ের তথ্য ও অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্য সময়ে এসে থমকে যেত। তাকে আবার প্রয়োজনের তাগিদে পূর্ববর্তী উদ্ভাবনায় সচেষ্ট হতে হত। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাফল্য আসলেও প্রচুর সময়ও শ্রমের প্রয়োজন হত। এমনিভাবে লিপি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত 'ভুল সংশোধন' পদ্ধতিতে মানুষ হয়তো একই উদ্ভাবনা কালে কালে করে এসেছিল। তাই প্রস্তর যুগ থেকে নব্য প্রস্তর যুগে প্রবেশ কাল ছিল হাজার হাজার বছরের এক বিরাট ব্যাপ্তি। অথচ মাত্র পাঁচ হাজার বছরের ব্যবধানে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে সভ্যতার চরম শিখরে উত্তরণের পেছনে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হল লিপির ব্যবহার। লিপির বিবর্তন ছিল একটি ধীর প্রক্রিয়া। ধাপে ধাপে ঐ বিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। এখনও এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা অব্যাহত আছে।

লিপির উদ্ভাবনে বিভিন্ন ধাপগুলি নিম্নরূপ ঃ ধ্বনি ব্যতীত শুধু ভাব প্রকাশের জন্য প্রাগৈতিহাসিক কালে ব্যবহৃত চিত্রাঙ্কন মূলতঃ এক ধরনের লিপি। প্রস্তর যুগেও গুহাবাসী মানুষ পাথরের দেয়ালে আঁচড় কেটে যে জন্তু জানোয়ারের বা প্রাকৃতিক বস্তুর চিত্র এঁকে গিয়েছিল তা মূলতঃ লিপির উদ্ভাবনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। বস্তুতঃ চিত্রাঙ্কন লিপির শৈশব অবস্থা। আজও অনেক শিশু ছবি আঁকার মাধ্যমেই লিখতে শিখে।

একসময়ে সারা পৃথিবীতে স্মৃতি ভিত্তিক লিপির ব্যবহার ছিল। ভারতবর্ষের আসাম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চলে আদিবাসীরা দড়িতে গিট বেঁধে বা লাঠির গায়ে দাগ কেটে লোক মারফৎ একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করত। দড়ির গিট বা লাঠির দাগ লিপির সংকেত রূপে ব্যবহৃত হত। প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী উভয়ে গিট বা দাগের সংখ্যা বা প্রকৃতির ভাষা সম্পর্কে অবহিত থাকতেন। তাই প্রেরিত সংবাদের অর্থ পুনরুদ্ধারে গ্রাহকের কোন অসুবিধা হত না। দড়ির গিট, লাঠির দাগ ব্যতীত পুঁতির মালা ও লিপি হিসাবে ব্যবহৃত হত। পুঁতিগুলো গাঁথার কৌশল বৈচিত্রেই বক্তব্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকত। এ ধরনের সংকেতকে স্মৃতি সহায়ক লিপি নামে অভিহিত

করা হত। তবে কেবল স্মৃতি ভিত্তিক হওয়ায়, বিস্মৃত হলে পুনরুদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ত।

একসময়ে চিত্রও লিপির সংকেত রূপে ব্যবহৃত হত। একটি মানুষের চিত্রে সাধারণতঃ একজন মানুষকেই বুঝানো হয়। আবার একটি বৃত্তের সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য, চাকা বা অনুরূপ কোন গোলাকার বস্তুকে প্রকাশ করা হত। তবে একাধিক চিত্রের সমাবেশে ভাব প্রকাশ জটিল হয়ে পরাটাই স্বাভাবিক। তবু কালক্রমে চর্চার মাধ্যমে জটিল বিষয় ও ঘটনার ও প্রাঞ্জল প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে। এ' ধরনের ব্যবস্থাপনাকে বিশেষজ্ঞগণ ভাবব্যঞ্জক লিপি বা চিত্রলিপি নামে অভিহিত করে থাকেন। নীচের চিত্রে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান সাতটি উপজাতি কোন হ্রদে তাদের মাছ ধরার অধিকার আদায়ে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কাছে প্রেরিত একটি আবেদনপত্রের নক্সা দেখানো হল।



দলের পুরোভাগে সারস পাখীটি হল নেতৃস্থানীয় 'অস্‌কাবাওইস' উপজাতির প্রতীক। সাতটি প্রাণীর চোখ ও হৃৎপিণ্ড রেখার দ্বারা যুক্ত করার মাধ্যমে মাছ ধরার দাবীতে সাতটি উপজাতি গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রয়াসের প্রতীক। তবে ধ্বনি সংযুক্ত নয় বলে চিত্র লিপি উচ্চারণে ভাষার প্রতিধ্বনি ফুটে উঠে না। এটা চিত্র লিপির একটা বড় দুর্বলতা।

বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে কথা বলার সময় মানুষ হ্রস্ব, দীর্ঘ নানা প্রকার ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকে। এ'রূপ ধ্বনি একত্রিকরণের ফলে বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ পায়। এ'রূপ নির্দিষ্ট অর্থ সম্বলিত ধ্বনি সমূহ যখন একদল লোকের বা মানব গোষ্ঠীর সাধারণ স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে, তখন সে ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি সেসব মানব গোষ্ঠীর ভাষা নামে পরিচিতি লাভকরে। এরূপ ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টির অর্থকরণ মানুষের ইচ্ছাধীন। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভাষা বিভিন্ন। এখন এ ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি যদি সর্বসম্মতিক্রমে উচ্চারণের একটি লৈখিক প্রতিরূপ হয়ে গড়ে উঠে, তখন এরূপ ধ্বনি ভিত্তিক লিপি ধ্বনি লিপি নামে পরিচিত হয়।

ধ্বনি লিপি দু'প্রকারের হয়ে থাকে। শব্দাংশ বা অক্ষরের প্রতীক এবং বর্ণমালার বর্ণ। যেমন ইংরেজী 'together' (to-ge-ther) কে তিনটি শব্দাংশ বা অক্ষরে সহজে ভাগ করা যায় এবং এ তিনটি অক্ষরকে তিনটি প্রতীক ব্যবহার করে সহজে উচ্চারণ করা যায়। অক্ষরের অন্তর্গত প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের সাহায্যে সাজানো হয়েছে। তিনটি শব্দাংশ 'মোট আটটি বর্ণ থাকলেও মুলতঃ ছয়টি বর্ণ মৌলিক। এখানে 't' ও 'e' বর্ণ দ্বি-উচ্চারিত। ফলে ছয়টি বর্ণের দ্বারাই তিনটি শব্দাংশের আটটি বর্ণ সমষ্টিতে together অক্ষর তৈরী হল। এভাবেই উচ্চারণের ভিত্তিতে বিভিন্ন বর্ণের সমন্বয়ে শব্দাংশ বা অক্ষর বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে

আসছে এবং আধুনিক গবেষণায় প্রায় সব দেশেই সর্বজন স্বীকৃত কিছু ভাষা তৈরী হয়েছে। এ'সম্পর্কে আধুনিক গবেষণায় আজও নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ভাবিত হচ্ছে।

তবে চিত্রলিপি থেকে আক্ষরিক লিপিতে বিবর্তন সরাসরি হয়নি বলেই বিশেষজ্ঞদের অভিমত। 'কিউনিফর্ম" নামে মাঝে আরও ওএকটি লিপির ব্যবহার প্রত্নতাত্ত্বিকরা উদ্ভাবন করেছেন। "কিউনিফর্ম" শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন শব্দ Cuneus থেকে। Cuneus এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'wedge' আর বাংলা প্রতিশব্দ কীলক। নরম মাটির চাকতি বা সিলিণ্ডার বা প্রিজমের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগ দ্বারা দাগকেটে লিখলে লিপি চিহ্নগুলো অনেকটা কীলকের মত দেখায় বলে লিপিবিদ্ টমাস হাইড এ'রূপ নামকরণ করেন। তবে যদিও খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ মিলেনিয়মের মাঝামাঝি সময় থেকে কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার দেখা যায়, তথাপিও এ লিপির উদ্ভাবন কাল ও স্থান সম্পর্কে লিপিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সুমেরিয়াসরাই এ'লিপির আবিষ্কর্তা। আবার কেহ কেহ বলেন, মেসোপটেমিয়া হল এ'লিপির জন্মস্থান। তবে মত যতই থাকুক না কেন 'উরুক' বা বাইবেল বর্ণিত 'ইরেক' থেকেই প্রাচীনতম "কিউনিফর্ম" লিপির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তু ও প্রাণীর চিত্র প্রতীক সম্বলিত চিত্র লিপি ক্রমশ ভাব-ব্যঞ্জক হয়ে ধ্বনি প্রতীকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে উচ্চারণের সাথে সংগতিরেখে ধ্বনি প্রতীকগুলো অক্ষর প্রতীকে রূপ নেওয়াই হল কিউনিফর্ম লিপির শেষ পরিণতি। নীচের চিত্রে চিত্রলিপি-কিউনিফর্ম লিপি- আক্ষরিক লিপিতে বিবর্তনের কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল—

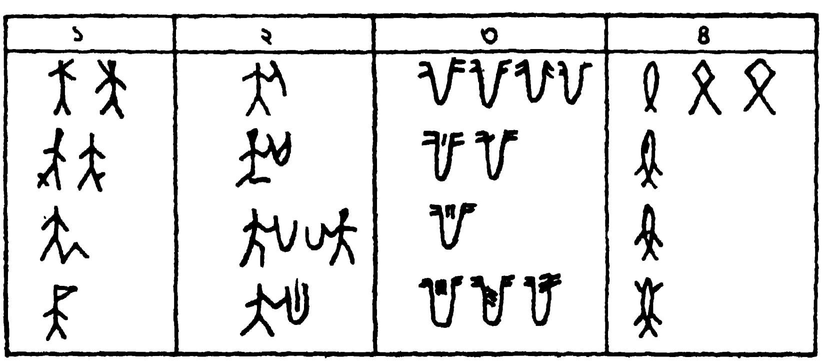


চিত্রে উল্লিখিত কিউনিফর্ম লিপির চিহ্নগুলো লেখার দিক থেকে কঠিন বলে মনে হলেও ধ্বনি বিশিষ্ট চিহ্নে রূপান্তরের এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলেই বিশারদ্‌রা মনে করেন।

কিউনিফর্ম লিপির সমসাময়িক আরও কয়েকটি লিপির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে নীলনদের উপত্যকায় জন্ম 'হায়রোগ্লিফিক' লিপি অন্যতম। আনুমানিক খ্রীঃপূঃ তিন হাজার অব্দে মিশরের একত্রীকরণের সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশব্যাপী একটি সাধারণ লিপির ব্যবহারের স্বার্থেই এ'লিপির আত্মপ্রকাশ বলে অনেকে মনে করেন। ব্যঞ্জন ধ্বনির ব্যবহারই এ'লিপির প্রধান বিশেষত্ব। এতে একক ব্যঞ্জন ধ্বনি বিশিষ্ট ২৪টি প্রতীক এবং দুই প্রকার ব্যঞ্জন ধ্বনি বিশিষ্ট ৭৫টি প্রতীকের ব্যবহার পাওয়া যায়। এ'লিপি সাধারণতঃ ডানথেকে বামে লেখা হত। তবে মিশর ব্যতীত অন্য কোথাও এ'লিপি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়নি। অর্থাৎ কিউনিফর্ম লিপির মত এরাও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত লাভে সমর্থ হয়নি।

রাজকীয় বা ধর্মীয় ক্ষেত্রে হায়ারোগ্লিফিক লিপির ব্যবহারের ফলে ইহাদের আকৃতি গত ও সৌন্দর্য্য বজায় রাখার স্বার্থে ইহা জনসাধারণের লিপিতে পরিণত হতে পারেনি। তাই পরবর্তী সময়ে এ'লিপি অপভ্রংশ 'হায়ারোটিক' ও 'ডিমোটিক' লিপি নামে দুটি লিপিতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে হায়ারোটিক লিপিও প্রথমদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হত বলে সাধারণের ব্যবহারের উপযোগী লিপি রূপে স্বীকৃত লাভে সমর্থ হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে 'হায়রোটিক' লিপি অপেক্ষাকৃত সহজ 'ডিমোটিক' লিপিতে রূপান্তরিত হয়ে সর্বসাধারণের লিপি রূপে গৃহীত হয়। এ'হ'ল বহির্ভারতে প্রাচীনকালে লিপি বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সিন্ধু সভ্যতাকালে ব্যবহৃত লিপির বিশ্লেষণে দেখা যায় সিন্ধু সভ্যতার লিপি ছিল কিউনিফর্ম লিপির ন্যায় চিত্র লিপি ও আক্ষরিক লিপির এক মধ্যবর্তী অবস্থা। এ'লিপিতে প্রায় ৩০০ বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায়। যদিও প্রতীক সংখ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশারদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। গ্যাণ্ড ও স্মিথের মতে ৩৯৬, ল্যাংডলের মতে ২৪৪, হান্টারের মতে ২৫৩ ইত্যাদি। নীচে সিন্ধু উপত্যকায় ব্যবহৃত লিপির কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ



এ'লিপি সমূহের পাঠোদ্ধার আজ অবধি সম্ভব না হলেও লিপিগুলোর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে সিন্ধু লিপি সমূহকে আংশিক চিত্রলিপি ও আংশিক ধ্বনি লিপিরূপে গ্রহণ করতে অনেক লিপিবিশারদ সহমত পোষণ করেন। তবে সিন্ধু লিপি নিজ থেকেই উদ্ভূত না পরদেশীয় লিপির প্রভাবে সৃষ্ট এ

বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটা অনুমেয় যে 'কিউনিফর্ম', এলামাইট ও সিন্ধুলিপি ইহাদের প্রত্যেকের প্রাচীনতম অন্য কোন লিপি থেকে উৎপত্তি। এদের যে কোন একটি আগে আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্য দুটি বিকাশ লাভ করে।

আর্যদের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতে যে কয়েকটি লিপি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপি অন্যতম এবং প্রাচীনতম। তবে সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কোথাও লিপির উল্লেখ পাওয়া যায় না। তার জন্য অনেকে মনে করেন, আর্যদের কোন ব্যবহারিক লিপি ছিল না। অধ্যাপক ডেভিডস্ অবশ্য "বৈদিক সাহিত্যে লিপির অনুল্লেখই ইহার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ বলে মনে করেন।" তবে বৌদ্ধ সাহিত্যেই প্রথম লিপির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। খ্রীঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর এক বৌদ্ধগ্রন্থে আক্ষরিক শব্দের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ জাতকে 'লেখ' ও 'লেখক' শব্দের ব্যবহার বহু জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। "ললিত বিস্তারে" বাল্যকালে বুদ্ধ কর্তৃক লিপি অভ্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। গোরখপুর জেলায় প্রাপ্ত তাম্র পাত্রে লিপির ব্যবহার অথবা সৌগর জেলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় লিপির ব্যবহার প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে এটা অনুমান করা যায় খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই ভারতে লিপির ব্যবহার প্রচলিত হয়। অনেকের মতে কালটা মূলতঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম অব্দ। এ'রূপ মনে করার পেছনে যুক্তি হল খ্রীঃ পূঃ দশম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বহির্বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে ভারতে কৃষি নির্ভর উন্নত অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। রাজা বিম্বিসার সমগ্র উত্তর ভারতে এক বিরাট রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও রাজনৈতিক স্বার্থে অনুশাসন জারী অবশ্যই প্রশাসনিক কর্মসূচীর অঙ্গ। এ'অর্থে তৎকালীন সময়ে ভারতে লিপির ব্যবহার অবশ্যই যুক্তিযুক্ত।

খ্রীঃ পূর্ব ১৭৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বহু ইন্দোগ্রীক ও ইন্দোসাইদীয় মুদ্রায় খরোষ্ঠী লিপির নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। 'শাহরাজগারহি' নামক স্থানে ১৮৩৬ সালে আবিষ্কৃত অশোকের শিলালিপিতে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া পূর্ব তুর্কীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলেও খরোষ্ঠী লিপির প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালে আরামিক ভাষী সেমিটিক জাতিদের সাথে ভারতীয়দের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। অপরদিকে গবেষণা লব্ধ বিশ্লেষণে আরামিক বর্ণমালার সহিত খরোষ্ঠী বর্ণমালার বাহ্যিক ও ধ্বনিগত অনেক সাযুজ্য দেখে অনেকে মনে করেন আরামিক বর্ণমালা থেকেই খরোষ্ঠী বর্ণমালার উদ্ভব। খরোষ্ঠী লিপি ও ডান থেকে বামে লেখা হয়ে থাকে।

অপরদিকে ব্রাহ্মী লিপিই বিভিন্ন ভারতীয় বর্ণমালার পূর্বরূপ বলে বর্তমানে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এ'লিপি আবিষ্কারের ইতিহাস আজও রহস্যাবৃত হয়ে আছে। ব্রাহ্মী লিপির সাথে সিন্ধু উপত্যকার লিপির নিবিড় সম্পর্ক থাকায় একে স্বাধীন ভারতীয় লিপি রূপেই কেহ কেহ মনে করেন। জেমস্ প্রিন্সেপ রাউল দ্য রোশেত, ওটফ্রিড মূলে প্রমুখ লিপিবিদরা মনে করেন গ্রীক লিপি থেকেই ব্রাহ্মীর উদ্ভব। আবার জোসেদ আমেভি, উইলসন প্রমুখ বিশারদরা ব্রাহ্মী লিপিতে হেলেনীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ভারতে গ্রীক সংস্কৃতি প্রভাবের কয়েকশত বৎসর আগেই ব্রাহ্মী লিপির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। অপরদিকে বেনফি, ওয়েবার, বুহলের প্রমুখ লিপিবিদরা মনে করেন ফিনিশীয়

লিপি ব্রাহ্মী লিপিকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে ভারত ও ফিনিশিয়ার মধ্যে এমন কোন ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা জানা যায়নি, যার মাধ্যমে ব্রাহ্মী লিপিতে ফিনিশীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে। অপরদিকে অধ্যাপক ডীক্, ক্যানন টেলর, সেঠি প্রমুখ বিশারদগণের মতে ব্রাহ্মী বর্ণমালা দক্ষিণ সেমিটিক বর্ণমালা থেকে উদ্ভুত। এ'মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করে উল্লিখিত বিশারদদের অভিমত Encyclopaedia Britanica তে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

Its origin is obscure; but there seems little doubt that it derives from the south semitic group of allphabets through contact with sabataean traders (vol. 1.1947. p. 683)

তবে যে ভাবেই উদ্ভূত হউক না কেন এ'লিপি গঠন ও চর্চায় যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কৃত সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রকাশের উপযোগী হয়ে এ'লিপি আরও নিখুঁত ও সুন্দর হয়ে উঠে। পরিশেষে বলা যায় যে, ব্রাহ্মীই হল ভারতীয় লিপি সমূহের

বর্ণমালার উদ্ভব

লিপির ন্যায় বর্ণমালার উদ্ভব সম্পর্কেও লিপি বিশারদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মধ্যে হায়রোগ্লিফিক মতবাদ, সিনাইটিক মতবাদ, ক্রীটান মতবাদ, ইউগারিট কিউনিফর্ম মতবাদ, সেমিটিক মতবাদ উল্লেখযোগ্য।

অনেক বিশারদই মিশরকে সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন প্রাণ কেন্দ্র রূপে ধরে নিয়ে মিশরকেই হাররোগ্লিফিক বর্ণমালার আদি জন্মস্থান রূপে চিহ্নিত করেছেন। তবে এ'মতবাদ সর্বজন স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়নি। কারণ হায়রোগ্লিফিক, অথবা সেমেটিক বর্ণমালায় ব্যঞ্জনধ্বনি বিশিষ্ট নানা প্রতীক থাকলেও এ'গুলো ব্যবহারে একাধিক প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া উচ্চারণের দিক থেকে অর্থহীন আরও চিহ্নের ব্যবহার লিপিগুলোর জটিলতাই সৃষ্টি করেছে। অথচ সাধারণ নিয়ম অনুসারে বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণ বাগ্‌যন্ত্রে নিঃসৃত এক একটি বিশুদ্ধ শব্দকে প্রকাশ করে। এ'সব কারণে হায়রোগ্লিফিক বর্ণমালাকে আদি বর্ণমালা রূপে গ্রহণ করা যায় না।

১৯০৬ সালে সিনাই উপদ্বীপে ফ্লিনডার্স পেত্রি আবিষ্কৃত প্রাচীন সিনাইটিক লিপিকে লিপি বিশারদরা হায়ারোগ্লিফিক ও সেমিটিক বর্ণমালার মধ্যবর্তী অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। ইহাই বর্ণমালা সম্পর্কীয় সিনাইটিক মতবাদ নামে পরিচিত। গার্ডিনার মতে সিনাইটিক লিপি সেমিটিক বর্ণমালার পূর্বসূরী এবং এ'হিসাবে মিশরের হায়ারোগ্লিফিক লিপি থেকেই বর্ণমালার লিপি উদ্ভূত হয়েছে। তবে সিনাইটিক লিপির পাঠোদ্ধারের অপর্যাপ্ততা এবং ইহার ভিতরকার অসংগতির ফলে মঁসিয়া দুনার ন্যায় লিপি বিশারদরা ইহাকে বর্ণমালার লিপি উদ্ভাবনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা রূপে মেনে নিতে পারছেন না।

স্যার আর্থার ইভান্সের মতে ফিলিষ্টিনরা কীটস থেকে বর্ণমালার লিপি প্রথমে প্যালেষ্টাইনে আনেন এবং পরবর্তীকালে ফিনিশীয়েরা ইহার উন্নতি ও সংস্কার সাধন করেন। সেমিটিক বর্ণের

সহিত ক্রীটান হরফের কিছু আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্য এ'রূপ মতবাদ প্রবর্তিত হলেও খ্রীঃপূঃ ১২২০ সালের ফিনিষ্টিট কর্তৃক প্রথম প্যালেষ্টাই আবিষ্কারের অনেক আগেই মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটেছিল।

সিরিয়ার রাস শামরায় ১৯২৯ সালে শেফার, শনে ও ডিরোলা কিছু প্রাচীন বর্ণমালার লিপি আবিষ্কার করেন। এ'লিপির হরফগুলো কিউনিফর্ম লিপির প্রতীকের মত। এ'গুলো লিখবার রীতি হল বাম থেকে ডানে। প্রাচীনকালে রাস শামরায় ইউগারিট নামে পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলের প্রাচীন নাম অনযায়ী এরা ইউগারিট বর্ণমালা নামে পরিচিত ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার সাথে ইউগারিট বর্ণমালার মিল আছে। তবে বর্ণমালাগুলোর প্রতীক উদ্ভাবনে কিউনিফর্ম চিহ্নের প্রভাব রয়েছে। ইহাতে মোট ৩২টি বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়। এ থেকে মনে হচ্ছে কিউনিফর্ম ও উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার মিশ্রণে ইউগারিট বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে। এ'রূপ সিদ্ধান্তের ফলে ইউগারিট বর্ণমালাকে আদি বর্ণমালা রূপে গ্রহণ করা যায় না।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত খ্রীঃপূঃ নবম শতাব্দীর মোয়াবাইট প্রস্তর ফলক সাইপ্রাসে আবিষ্কৃত মোয়াবাইট ফলকের সমসাময়িক পাত্রের গায়ে খোদিত ফিনিশীয় লিপির কিয়দংশ সিরিয়ার জেন্‌জিরলি নামে স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন আরামিক লিপির কয়েকটি নমুনা থেকে এটা স্পষ্ট অনুমেয় যে খ্রীঃ পূঃ নবম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই উত্তর সেমিটিক লিপির প্রচলন ছিল। তাছাড়া এলিবান লিপি (খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দী), আবিবাল লিপি (খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দী), ইয়োখিমিল্‌ক লিপি (খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী), অখিরাম লিপি প্রভৃতিও উত্তর সেমিটিক লিপি সদৃশ।

উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার প্রাচীনত্ব ও স্থান সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এদের থেকেই পরবর্তী বিবর্তনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ও ভারতসহ এশিয়া মহাদেশের প্রায় সব বর্ধিষ্ণু ভাষার বর্ণমালা ও লিপির উদ্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্তমানে প্রায় সব লিপি-বিশারদরা সহমত পোষণ করেন এবং সময়ের সাক্ষী হিসাবে আমিও এ মতই সমথন কবি।

(ছ) প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চার অবনতি

খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ অব্দের অনুরূপ সময় অর্থাৎ নিওলিথিক যুগে ভারতে মহেঞ্জোদাড়োর কাল থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগ পর্যন্ত সমাজ বিবর্তনে বিজ্ঞানের প্রগতির কিছু তথ্য পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে। এ সকল আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সিন্ধু সভ্যতাকালে প্রয়োজনের তাগিদে অভিজ্ঞতার আলোকে ফলিত বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। অপরদিকে আর্যরা জ্ঞান-চর্চায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হয়েও ফলিত বিজ্ঞানে আশানুরূপ উৎকর্ষতা বজায় রাখতে বা বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়নি। এটা বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নেতিবাচক দিক। এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে বিজ্ঞানের প্রাথমিক ভিত্তি মজবুত হওয়ার শুরু মুহূর্তে প্রাচীন ভারতীয়রা বিজ্ঞানে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে বিজ্ঞান চর্চায় স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে ছেদ পড়তে থাকে।

এর কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও গর্ডন চাইলড, পটিংটন, ফারিংটন প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে "ফলিত বিজ্ঞানের চর্চায় ছেদ পড়ার মূল কারণ হল সমাজে শ্রেণী বিভাজনের উদ্ভব।" মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত ইটের কাজের ধ্বংসাবশেষে এবং ধনবান ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন বাসস্থানের অস্তিত্বেও দুই শ্রেণীর মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের তারতম্য দারুণভাবে প্রকাশ পায়।

গর্ডন চাইলডের মতে খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দ অবধি ফলিত বিজ্ঞানের মাত্র চারটি আবিষ্কার "এক-দশমিক সংখ্যা পাতন পদ্ধতি (খ্রীঃ পূঃ ২০০০) দুই - লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি (খ্রীঃ পূর্ব ১৪০০ অব্দ), তিন বর্ণমালার লিপি (খ্রীঃ পূর্ব ১৩০০ অব্দ), চার নগর ও জনপদে উন্নত জল সববরাহ ব্যবস্থা (খ্রীঃ পূর্ব ৭০০ অব্দ), নগর সভ্যতা বিকাশে সহায়ক হলেও ফলিত বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলো যেমন মৃৎশিল্প, কৃত্রিম উপায়ে সেচ ব্যবস্থা, চাকার আবিষ্কার, পাল তোলা নৌকা, লাঙ্গল, কৃষিকাজে গবাদি পশুর ব্যবহার প্রভৃতিতে তেমন উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়নি।" সমাজে শ্রেণী বিভাজন উদ্ভাবনের ফলে বণিক শ্রেণীর লোক নগরে বাস করত এবং বাহু বলে দখলীকৃত ভূমিতে শ্রমদাসের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলের সুফল ভোগ করত। ফলে কৃষি কাজে এবং পশুপালনে অর্থাৎ অর্থনীতি বিকাশে ফলিত বিজ্ঞানের চর্চার ঘাটতি শুরু হল। এছাড়া পরবর্তী বৈদিক যুগে যারা লেখাপড়ার চর্চা করত তারা অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। তারা জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারক, বাহক ও পরিপোষক রূপে সমাজে নিজেদের শুধু প্রতিষ্ঠিতই করল না, যুদ্ধবিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও নানা বুজরুকির মাধ্যমে সরলপ্রাণ অজ্ঞ দরিদ্র ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করার চর্চায় মগ্ন হয়ে পড়ল। তারা সমাজে নিজেদেরকে পুরোহিত (পরের হিত যিনি করেন) নামে একটি ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে নিল। লেখাপড়া জানত বলে তারা নিজেদেরকে সমাজে রাজাদের তথা ধনিকদের পরেই প্রতিষ্ঠিত করে নিল। লিপির আবিষ্কার তাদেরকে এ কাজে দারুণভাবে সহায়তা করল। লিপি আবিষ্কারের ফলে রাজকার্য থেকে শুরু করে ধর্মকার্য ও ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রেই পুরোহিত বা লিপিকারদের মর্যাদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে পুরোহিত ব্যতীত কিছু কিছু লোক 'লিপিকার' রূপে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন ধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। পরবর্তী পর্যায়ে আবির্ভূত মধ্যবৃত্তীয় ঐ লিপিকাররা সমাজ পরিচালনায় অংশীদার হয়ে উঠল। অনেকের

মতে সমাজে তারাই পুরোহিত সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত হতে লাগল। তাই পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই রাজা, পুরোহিত লিপিকার, বণিক ও দাস নামক চার শ্রেণীতে তৎকালীন সমাজের লোক বিভক্ত হয়ে পড়ল। লিপির ব্যবহারিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ লোকেরা বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক থেকে সমাজে অগ্রণী সম্প্রদায় হিসাবে চিহ্নিত হলেন। রাজন্যবর্গ এবং বণিক শ্রেণীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে তারা কৃষক, শ্রমিক, কারিগর শ্রেণী থেকে আলাদা হয়ে পড়ল। ফলে শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার্থে পুরোহিত বা মুনি ঋষিদের গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কীয় বক্তব্য বা আলোচনা লিপিতে প্রকাশ পেলেও শত সহস্র কুম্ভকারের মৃৎশিল্প, তাম্রকারের ধাতুবিদ্যা অথবা কৃষকদের কৃষিকাজ ও পশুপালনের নানা অভিজ্ঞতা অর্থাৎ ফলিত বিজ্ঞানকে লিপিতে ধরে রাখার জন্য উদ্যোগে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়।

লিপিকার বা পুরোহিতরা সমাজে এতই শক্তিমান হয়ে উঠলেন যে রাজন্যবর্গও তাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে দ্বিধাবোধ করতেন। ফলে সুযোগ বুঝে পুরোহিত সম্প্রদায় যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ, বুজরুকি ও নানাবিধ কুসংস্কারের আবহাওয়া সৃষ্টি করে শত সহস্র মানুষের অন্ধ বিশ্বাসকে শোষণের চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত করে নেয়। ফলে প্রাচীন যুগে সদ্য বিকশিত ফলিত বিজ্ঞানের প্রসার এ সময়ে অর্থাৎ বৈদিক যুগে এসে দারুণভাবে থমকে দাঁড়ায়।

বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়

ক) বুদ্ধ ও পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান চর্চা

বৈদিক আচরণের বাড়বাড়ন্তে ফলিত বিজ্ঞান চর্চা কিভাবে ব্যাহত হয়েছিল তার কিছু তথ্য পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে। তবে থমকে দাঁড়ালেও একই নির্দেশিকা কাঠামোয় বিকাশের অগ্রগতি কেহ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পারে না। তাই ঘটল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। প্রচলিত মতবাদে চরম আঘাত আনলেন দুই ধর্মগুরু, মহাবীর জৈন ও গৌতমবুদ্ধ। তাঁরা শুধু ভারতীয় সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনতেই সচেষ্ট ছিলেন না — তাঁরা লুপ্ত প্রায় বিজ্ঞান চর্চাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে আরও উন্নত স্তরে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করেছিলেন। তার জন্য বিদ্যা চর্চার বাড়াবাড়িতে আঘাত হেনে শিক্ষাকে প্রায় সার্বজনীন রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। মূলতঃ তাঁরাই ভারতে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। দু'জন মহাপুরুষের প্রভাবে ভারতে সভ্যতা কিভাবে আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিকাশ লাভ করে তার তাত্ত্বিক ও তথ্যগত দিক সম্পর্কে সাক্ষী দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

ভারতীয় সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে কালের পর্যায় সম্পর্কে বাঁধাধরা ঐতিহাসিক প্রমাণাদির ঘাটতি থাকলেও অনেকেই সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে ৬০০/৭০০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সময়কে ভারতের প্রাচীন যুগ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তবে বর্তমানে ঐতিহাসিকগণ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টাকে প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় অধ্যায় রূপে আখ্যায়িত করেছেন। এর মধ্যে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সাত আটশ বছরে ভারতের ধর্মীয় তথা সমাজ জীবনে ভিন্ন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তী বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে পুরোহিত বা লিপিকারগণ ধর্মের নামে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখতে সচেষ্ট থাকতেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অনেকে পুরোহিত তন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়বাড়ন্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। ধর্মীয় সংস্কার তথা সমাজ সংস্কারে নতুন মতামত প্রচারে এগিয়ে আসেন। তাদের অন্যতম দুইজন হলেন জৈনধর্মের প্রবর্তক "মহাবীর জৈন" এবং বুদ্ধধর্মের প্রবর্তক "গৌতমবুদ্ধ"।

মহাবীর জৈন মূলতঃ বৈদিক আচার আচরণে কিছুটা শিথিলতা আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। অপরদিকে গৌতম বুদ্ধ বৈদিক ধর্ম বা আচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাদর্শ প্রবর্তন করেন। ফলে বুদ্ধের মতাবলম্বীরা বুদ্ধ ধর্ম নামে একটি ধর্মীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়ে যায়। ইতিহাস পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে সেই সময় ব্রাহ্মণ প্রভাবাধীন সমাজে বৈশ্যরা তৃতীয় স্থানে ছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়বাড়ন্ত তাদেরও আঘাত করত। তাই স্বীয় স্বার্থ রক্ষার্থেই বৈশ্যরা মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ উভয়কে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিল। এছাড়া মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়ে ক্ষত্রিয় বংশীয় ছিলেন বলে ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও উভয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়েন।

মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মীয় সংস্কারে ভারতীয় সমাজের অনেকেই নতুন ধর্মমতে আকৃষ্ট হলেও বৈদিক আচার-আচরণ কিন্তু থেমে যায়নি। ফলে উল্লিখিত কালকে মূলতঃ বৈদিক ও বুদ্ধ ধর্মের মিশ্রকাল রূপে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

তবে এটা ঠিক যে বুদ্ধধর্মের আবির্ভাবে ধর্মীয় সংস্কার ঘটার সাথে সমাজ জীবনেও পরিবর্তন

ঘটে। এ সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়বাড়ন্ত যেখানে ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় দারুণভাবে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে সমাজ জীবন পরিবর্তনে বিজ্ঞান কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার বিশ্লেষণই এ পরিচ্ছদটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

পালি গ্রন্থাদি, সংস্কৃত সুর সাহিত্য এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে দেখা যায় ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় আশানুরূপ উৎকর্ষতা বৃদ্ধি না পেলেও এ সময়েই ভারতবর্ষে বিশেষত উত্তর ভারতের সমাজ জীবনে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো ঘটেছিল।

এক	ঃ	রাজনৈতিক প্রাধান্য
দুই	ঃ	দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ন ও লৌহনির্ভর নতুন কারিগরি বিদ্যার উদ্ভব।
তিন	ঃ	কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব।
চার	ঃ	বৈদেশিক প্রভাব।
পাঁচ	ঃ	মুদ্রা ও লিপির প্রচলন।
ছয়	ঃ	উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা।
সাত	ঃ	চিকিৎসা বিদ্যার উৎকর্ষতা।

রাজনৈতিক প্রাধান্য ঃ

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ জন্মের কিছু পূর্বে কাবুল থেকে গোদাবরী নদী পর্যন্ত আর্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ষোলটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ এ চারটি রাজ্য প্রধান হয়ে উঠে। তন্মধ্যে পূর্ব ভারতের মগধের অভ্যুত্থান আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে আর্যাবর্তের প্রান্তদেশে অবস্থিতি অপরদিকে যুদ্ধপ্রিয় মিশ্রজাতির বসতি স্থান মগধের উপর উত্তর ভারতের আর্য ব্রাহ্মণেরা প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

শিশুনাগ বংশীয় নৃপতি বিশেষতঃ বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে মগধের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে মর্যাদা বৃদ্ধি পরবর্তী সময়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনে এক দারুণ ভূমিকা পালন করেছিল। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়াবাড়ি না থাকায় জৈন ও বুদ্ধধর্ম প্রচারে ও প্রসারে মগধ সহায়ক রাজশক্তি জুগিয়েছিল। রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায়ও প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। তার প্রমাণ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ন্যায় এক যুগান্তকারী গ্রন্থের প্রণয়ন। এ সময়ে পুনরায় ফলিত বিজ্ঞানের যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। আর্য ঋষিদের ন্যায় গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনায় ঘাটতি দেখা গেলেও ব্যাকরণ ও সাহিত্য, কাব্য সৃষ্টির দিক থেকে এ যুগ স্মরণীয়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে পানিনি ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পতঞ্জলিও সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধির চরমে পৌঁছে দেন।

মৌর্য আমল থেকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে ঊর্দ্ধগতি পরিলক্ষিত হয় তার পরবর্তী সাত বাহন ও কুষাণ সম্রাটদের কালেও অব্যাহত ছিল। বিজ্ঞানের এ অগ্রগতির রেশই পরবর্তী

গুপ্তযুগকে সুবর্ণ যুগের মর্যাদায় পৌঁছাতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

দ্বিতীয় পর্বের নগরায়ন ও লৌহ নির্ভর নতুন কারিগরি বিদ্যার উদ্ভব ঃ ১৫০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ সিন্ধু সভ্যতার শহরগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে নগরের তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে নগরের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে ভারতে দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ন আরম্ভ হয়। পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, অযোধ্যা, কপিলাবস্তু প্রমুখ যে সকল নগরের উল্লেখ আছে, খনন কার্যের দ্বারা প্রতিটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের মাধ্যমে তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মেলে। এ নগরগুলো সম্ভবতঃ মৌর্য বা মৌর্য পরবর্তী যুগের।

বাড়িগুলো নির্মিত হত মাটির তৈরী ইট ও কাঠ দিয়ে। কোনকোন ঐতিহাসিকের মতে এ নগরগুলো ছিল রাজাদের সদর কার্যালয়। উদ্ভবের কারণ যাহা হউক না কেন এগুলো ক্রমশ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে উঠে। প্রধানত ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা এ সকল নগরগুলোতে বসবাস করতেন বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। কোথাও কোথাও কারিগররা বাস করত সংঘবদ্ধভাবে। নিজ নিজ দলপতির নেতৃত্বে ব্যবসায়ী ও কারিগররা নিজেদের সংঘ তৈরী করেছিল। কর্মকার, দারুশিল্পী, চর্মকার প্রভৃতি ১৮টি সংঘের পরিচয় পাওয়া যায়। শহরের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট অঞ্চল বা যাতায়াতের রাস্তাঘাট ব্যবসায়ী বা কারিগর শ্রেণীর নামে পরিচিত ছিল। বারাণসীতে এ রূপ গজদন্ত শিল্পীদের নামে একটি রাস্তার পরিচয় পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ জীবিকা ছিল বংশপরম্পরাগত। পিতার কাজে পুত্র পারিবারিক পেশায় শিক্ষা নিত।

এ যুগে কারিগরদের অধ্যাবসায় ও শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলোর মাথায় শোভা পেত সিংহ বা বৃষের প্রতিকৃতি। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্র এ রূপ স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়, তাছাড়া পোড়া ইটের ব্যবহার নগরায়নের দ্বিতীয় পর্বের তথ্য প্রমাণে সহায়ক। বিহার ও উত্তরপ্রদেশে মৌর্য যুগের পোড়া ইটের তৈরী দালানের ধ্বংবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পোড়া ইটের পাশাপাশি কাঠের তৈরী বাড়ীঘরের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যায়। বাড়ীতে তৈরী কুয়োর জল ব্যবহারের অভিজ্ঞতা অর্জন, নদীর তীর ব্যতীত অন্যত্র বাসস্থান নির্মাণে একটা পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। দক্ষিণ বিহারে আকরিক লোহা সুলভ ছিল বলে মানুষ ক্রমশ লৌহ সরঞ্জাম ব্যবহারে ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। খাপে ভরা কুঠার, কাস্তে, লাঙ্গলের ব্যবহারে ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। তবে অস্ত্রশস্ত্রের একচেটিয়া অধিকার ছিল রাষ্ট্রের।

কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভব ঃ

কৃষি প্রধান ভারতে উদ্বৃত্ত কৃষি ব্যবস্থাই নগরায়নের মূল ভিত্তি। তাই এটা অনুমেয় যে গ্রামগুলো ছিল কৃষি সম্পদের দিক থেকে বর্ধিষ্ণু। বিশেষ করে মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চলের পাললিক জমির উর্বরশীলতা এবং লোহার তৈরী লাঙ্গলের ব্যবহারের ফলে কৃষিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

অপরদিকে সিংভূম ও ময়ূরভঞ্জ থেকে আহরিত আকরিক লোহা ব্যবহারের লক্ষ্যে নগরায়ন বা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠতে সাহায্যে করে। আকরিক থেকে কাঁচা লোহা নিষ্কাষণ করে লোহার শক্ত জিনিষপত্র তৈরীর কলা কৌশল এর মধ্যে কর্মকারগণ আয়ত্ত করে নিয়েছে। এ সকল লোহার শক্ত

হাতুরি দিয়ে মানুষ জলা জঙ্গল পরিষ্কার বা রুক্ষজমি কেটে চাষ বা বসবাসযোগ্যকরে তুলল এবং ক্রমশ চাষের জমির সীমা বাড়াতে লাগল। এ সময়ে এ অঞ্চলে প্রধান ফসল ছিল ধান। ধান রোয়ার অর্থবহ একটা শব্দ পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে বার বার ব্যবহারে মনে হচ্ছিল সে সময় ব্যাপকভাবে ফসল রোয়া শুরু হয়েছিল। তবে ধান ব্যতীত ডাল, বাজরা, তুলা ও আখের চাষও করতেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

এছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেও জানা যায় মৌর্যযুগে কৃষি ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ব্যবহারে একটা নতুনত্ব দেখা দিয়েছিল। লোহার তৈরী লাঙ্গলের ব্যবহার ব্যতীত রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমি পরিমাপের ব্যবস্থা ছিল। এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী এ কাজগুলো তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রীস বা রোমের ন্যায় যদিও ভারতে মৌর্য পূর্ব যুগে ক্রীতদাস নিয়োগ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবুও ভারতে মৌর্যযুগে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন হয়েছিল বলে অর্থশাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায়। তবে রাষ্ট্রের নিজস্ব খামারগুলোতেই এ রূপ ক্রীতদাসরা ভাড়াটে ক্ষেত মজুর হিসাবে নিয়োগ হত বলেই অনুমেয়। অনেকের মতে কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক যে দেড় লক্ষ লোককে বন্দী করে নিজ রাজ্যে এনেছিলেন তাদেরকেই ক্রীতদাস রূপে ব্যবহার করা হত।

খাদ্যশস্য মজুতের স্বার্থে গ্রামেগঞ্জে যে খাদ্যভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। তাতে মনে হয় কর আদায় করা হত দ্রব্যে। দুর্ভিক্ষ, খরা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এ মজুত শস্য ভাণ্ডার থেকে গ্রামবাসীদের সাহায্য করা হত।

বৈদেশিক প্রভাব ঃ

এ ভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপটে লুপ্ত প্রায় বিজ্ঞানচর্চা বুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। তৎকালীন ভারতের সামাজিক অবস্থাই ফলিত বিজ্ঞান চর্চার মূলহেতু হলেও বিদেশী সংস্কৃতির প্রভাবও তাকে উৎসাহিত করেছিল।

তার মধ্যে ৫১৬ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে ইরাণের দারায়ুসের ভারত আক্রমণ এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধু নদের পশ্চিমাঞ্চলে ইরাণের উপনিবেশ পত্তন এবং সর্বোপরি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ভাবতবর্ষে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার ইরাণী লিপিরই ভারতীয় সংস্করণ। এ লিপি তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বহুল ব্যবহৃত হত। অশোকের লিপিগুলোও ছিল খরোষ্ঠী ভুক্ত। এছাড়া বহিঃদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও ভাস্কর্য শিল্পে ইরাণী সভ্যতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্রীক পণ্ডিতদের রচিত আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ থেকে ভারত সম্পর্কীয় ভৌগোলিক তথ্য ভারতীয় পণ্ডিতদের ভূগোল চর্চায় উৎসাহিত করেছিল। শুধু আলেকজাণ্ডারের বিভিন্ন আক্রমণের তারিখ থেকে গ্রীক পণ্ডিতরা যে ঘটনাপঞ্জী তৈরী করেছেন, তাকে ভিত্তি করে ভারতীয় পণ্ডিতরা ভারতে পরবর্তী ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী তৈরী ও লিপিবদ্ধকরণে সমর্থ হয়েছিলেন।

জৈন ও বুদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বিদেশী সংস্কৃতির সমন্বয়ে ফলিত বিজ্ঞান চর্চার পুনরুত্থান উত্তর ভারতে মৌর্যদের শাসনকালে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে দেখা যায় যে ৩২১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহযোগিতায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নামক

জনৈক ক্ষত্রিয় মগধের শেষ রাজবংশ নন্দদের ক্ষমতাচ্যুত করে মৌর্য শাসনের গোড়া পত্তন করেন।

এ'বিবরণ থেকে আরও জানা যায়, কেরালা, তামিলনাড়ু ও উত্তর-পূর্ব ভারত ছাড়া প্রায় গোটা উপমহাদেশে মৌর্যদেব সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। স্বাভাবিকভাবেই এ ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য পরিচালনায় মৌর্য শাসকরা দক্ষতার পরিচয় রেখেছিল। মেগাস্থিনিসের বিবরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং অশোকের শিলালিপি থেকে মৌর্যদের সামাজিক ও শাসন ব্যবস্থার বিবরণের যেমন তথ্য পাওয়া যায় তার পাশাপাশি বিজ্ঞানে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মুদ্রা ও লিপির প্রচলন ঃ

বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার ব্যবহার বুদ্ধযুগের একটি ক্রান্তিকারি পরিবর্তন। কেননা, বৈদিক যুগে বিনিময়ের মাধ্যম ছিল গরু। ভারতে ধাতুর তৈরী মুদ্রার প্রথম আবিষ্কার ঘটে বুদ্ধ যুগে। একেবারে প্রথম দিককার মুদ্রাগুলো ছিল রূপার। তবে কিছু তাম্র মুদ্রার নিদর্শনও পাওয়া গেছে। মুদ্রাগুলোর উপর পাহাড়, গাছপালা, মাছ, হাতী ইত্যাদির প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকত। তাই এগুলোকে 'খোদাই মুদ্রা' বলা হত। পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং মগধে এ'রূপ মুদ্রার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে মৃত মুষিকের দাম মুদ্রায় নির্ধারিত হত।

সম্ভবতঃ অশোকের জন্মের দুই শতাব্দী আগে থেকেই মানুষ লিখতে জানত। তবে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে লিপির রূপ সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যাচ্ছে না।

তবে লিখতে জানা জ্ঞান-আইন, ধর্মীয় অনুশাসন, হিসাব নিকাশ করা, সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ব্যবহৃত হত। এ যুগে 'সুলভ সূত্র' রচিত হয়েছিল। এর দ্বারা জমির সীমারেখা নির্ণয় অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন সময়ে 'সুলভ সূত্র' ছিল পরিমাপ গণিতের ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অবদান।



অশোক হলেন প্রথম ভারতীয় রাজা যিনি শিলালিপির মাধ্যমে প্রজাদের খুব কাছে এসেছিলেন। পাথরের উপর বা গুহার গায়ে এ'শিলা লিপিগুলো খোদাই করা হয়েছিল। শিলালিপিগুলো ৪৪টি রাজকীয় আদেশ বহন করে আছে। ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী ভাষায় শিলা লিপিগুলো খোদিত ছিল। ভারতে সর্বত্র এ'রূপ শিলালিপির নিদর্শন পাওয়া যায়। অমরাবতী ও অন্ধ্রের এররাগুড়ি এবং কর্ণাটকের কয়েকটি স্থানে মৌর্য যুগের ও অশোকের শিলালিপির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

এছাড়া অশোকের সময় তৈরী পাথর বা লৌহার তৈরী স্তম্ভগুলো ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ' সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভি এ স্মিথ-এর বক্তব্য "অশোক স্তম্ভে খোদিত পশুর প্রাচীন ভাস্কর্যের সমতুল্য বা উন্নত ভাস্কর্য আর কোন দেশে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলো শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে এত নিখুঁত ছিল যে তাদের ছাঁচে কল্পনাপ্রবণ শিল্পীর শ্রম মর্যাদা প্রস্ফুটিত।" এছাড়া অশোক ভারত ও আফগানিস্তানে প্রায় ৮৪,০০০টি স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এদের অধিকাংশই আজ ধ্বংস হয়ে গেছে। তবে ভূপালের সাঁচীতে এরূপ একটি স্তূপের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া

যায়। ঐতিহাসিকদের মতে অশোক নির্মিত সমস্ত স্তূপগুলোর মধ্যে এটিই ছিল বৃহৎ। বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের ব্যাস ১২১.৫ ফুট, উচ্চতা ৭৭.৫ ফুট। এ স্তূপটি ১১ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বড় বড় পাথরের চাই দিয়ে তৈরী।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ

ভারত উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্র মৌর্য যুগের মুদ্রা, শিলালিপি ও ভাস্কর্য শিল্পের নিদর্শন প্রাপ্তির মাধ্যমে এটা প্রমাণ করে যে তৎকালীন সময়ে একটি সড়ক পাটলিপুত্র থেকে বৈশালী ও চম্পারনের মধ্য দিয়ে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হিমালয়ের পাদদেশেও একটি সড়ক ছিল। সর্বোপরি বৈশালী, চম্পারণ, কপিলাবস্তু, কলসী, পেশোয়ার, সাসারাম, মির্জাপুর, কলিঙ্গ প্রভৃতির সাথে সড়ক পথে পাটলিপুত্রের যোগাযোগ ছিল। যোগাযোগ ও পরিবহণ কাজে অশ্বের ব্যবহার সে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

এছাড়া খননকার্যে প্রাপ্ত সব কয়টি বড় শহরের নদীর তীরে অবস্থিতি দ্বিতীয় পর্বের নগরায়নে ভিন্ন ধরনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে জল ও স্থল উভয় পথের গুরুত্ব সম্পর্কীয় তথ্য প্রমাণিত হয়। ব্যবসায়ীরা শিল্প সামগ্রী, এ সকল পথে বহু দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূক্ষ্ম সুতী বস্ত্র, হাতীর দাঁতের তৈরী অলংকার, মাটির পাত্র ইত্যাদি। বারাণসী, শ্রাবস্তী, বৈশালী, উজ্জয়িনী ও গুজরাট উপকূল অঞ্চল পর্যন্ত নদী ও সড়ক পথে আন্তঃ যোগাযোগ ছিল।

চিকিৎসা বিদ্যার উৎকর্ষতা ঃ

আর্য ঋষিদের সহযোগিতায় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিবর্তনে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেলেও মূলতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উল্লিখিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আত্রেয় ও সুশ্রুতের অবদান বহুলাংশে বিজ্ঞানসম্মত বলে বর্তমানেও অনেক গবেষক মনে করেন। তাই আত্রেয় ও সুশ্রুতকে 'ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক' রূপে আজও অনেকেই মেনে নিয়েছেন।

অত্রিয় পুত্র আত্রেয়। তাঁহার পুরা নাম আত্রেয় পুনর্বসু। আত্রেয় নামে অনেক ঋষি বৈদিক যুগে বা বৌদ্ধ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন বলেই আত্রেয়ের পুরানাম উল্লেখকরা হল। বৌদ্ধজাতকের নজির থেকে আত্রেয়কে অনেকেই তক্ষশিলার বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যাপক হিসাবে অনুমান করে নিয়েছিলেন। তিনি চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদের মধ্যে পাঁচখণ্ডে রচিত 'আত্রেয় সংহিতা' সুবেদিত। ব্যাধিভেষজ এবং চিকিৎসা পদ্ধতিই আত্রেয় সংহিতার মূল আলোচ্য বিষয়। পরবর্তীকালে তাঁহার যোগ্য শিষ্যগণের মধ্যে অগ্নিবেশ, চরক, চিকিৎসা শাস্ত্রকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থ রচনাও করেন। এদের মধ্যে চরক সংহিতা, ভেল ও হারীত সংহিতা ও মূল্যবান গ্রন্থ। এ সমস্ত গ্রন্থ থেকে আত্রেয় চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

সুশ্রুত ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র বলে পরিচিত। কাশীরাজ দিবোদাসের নিকট তিনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলে অনেকে মনে করেন। কিংবদন্তী তিনি কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে থাকবেন। আত্রেয় চিকিৎসা বিদ্যায় যে রূপ পারদর্শী ছিলেন, তদ্রূপ সুশ্রুত শল্য চিকিৎসায় পারদর্শিতার পরিচয় রেখে গেছেন। বৈদিক যুগের শেষভাগই সুশ্রুতের কাল হিসাবে ঐতিহাসিকরা

অনুমান করেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সুশ্রুতের মতামুত নিয়ে আলোচনা আছে। আত্রেয়ের ন্যায় সুশ্রুত ও তাঁর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তা সুশ্রুত সংহিতা নামে পরিচিত। তবে সুশ্রুত সংহিতার মৌলিকত্ব নিয়ে মতবেদ আছে। পরবর্তীকালে নাগার্জুন এ গ্রন্থের পরিবর্তন ও প্রতিসংস্কার করেন। ফলে সুশ্রুত সংহিতার মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয় এবং সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে বিভিন্ন ভাষায় সুশ্রুত সংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। অষ্টম শতকের শেষে ইবন আবি্‌ল সৈবিয়াম "কিতাব-ই-সুসরুদ" নামে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আলরাজি নামে জনৈক আরবী পণ্ডিত "সুশ্রুতকে" শল্য বিদ্যার প্রাথমিক গ্রন্থকার বলে মনে করতেন। আনন্দের ব্যাপার যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুশ্রুত সংহিতা ল্যাটিন, জার্মান ও ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়ে শল্য চিকিৎসায় প্রাথমিক জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করতে এক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব (৫৬৬-৪৮৬) সালে অর্থাৎ বুদ্ধের সমসাময়িককালে 'জীবক' নামে জনৈক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি তক্ষশালীয় অধ্যয়ন করেছেন এবং আত্রেয় শিষ্য ছিলেন। তবে পুনর্বসু আত্রেয় শিষ্য ছিলেন কিনা এ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণের অভাব আছে। তাছাড়া তক্ষশিলায় কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষাত্রেয় নামে আরও অনেক আত্রেয়ই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। যাই হউক জীবক তক্ষশীলার অধ্যয়নকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এত বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন যে সে সম্পর্কে বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীতে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। গুরুর আদেশে তক্ষশীলার চতুর্দিকে এক যোজনের মধ্যে কোন উদ্ভিদকেই নির্গুণ হিসাবে চিহ্নিত করার মধ্য দিয়ে উনার ভেষজ বিদ্যার পারদর্শিতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে তিনি শল্য চিকিৎসায়ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সেই সম্পর্কেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শিশু চিকিৎসায়ও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তবে চিকিৎসার জন্য তিনি ভাল পরিমাণ পারিশ্রমিকও নিতেন। কথিত আছে রোগ ভেদে তিনি মোটা অংকের টাকাও পারিশ্রমিক হিসাবে নিতেন। তথাপি দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা চিকিৎসার জন্য জীবকের কাছে আসতেন। সূত্রস্থান, বিমানস্থান, শারীরস্থান, ইন্দ্রিয়স্থান, চিকিৎসাস্থান, সিদ্ধিস্থান, কল্পস্থান এবং খিলস্থান প্রমুখ আট অধ্যায় সম্বলিত কাশ্যপ সংহিতা নামে তিনি একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাচীন ত্রিপিটকের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চরক নামে জনৈক আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী রাজা কনিষ্কের রাজবৈদ্য ছিলেন। অবশ্য চরকের জন্ম ও কর্মজীবন কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে অগ্নিবেশ তন্ত্রকে সংশোধিত করে চরক "চরক সংহিতা" নামে আর একটি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। উনি শল্য চিকিৎসায় যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন।

শল্যবিদ্যা ঃ প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে সাথে শল্য চিকিৎসারও প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। সুশ্রুত ও চরম অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক হিসাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও সুশ্রুতই শল্য চিকিৎসার জনক রূপে সমধিক পরিচিত।

শল্য চিকিৎসার গোড়ার কাজ হল নানাবিধ যন্ত্রপাতির ব্যবহারে চিকিৎসা করা। যন্ত্র ও শস্ত্র নামে দুই প্রকার প্রায় ১২১টি যন্ত্রপাতির কথা সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে। ভোঁতা মুখযুক্ত যন্ত্রপাতি যন্ত্র এবং তীক্ষ্ণ ও ধারাল যন্ত্রগুলো শস্ত্র নামে পরিচিত। সুশ্রুত বর্ণিত যন্ত্র ও শস্ত্রের

পরিচয় নীচের চিত্রে তুলে ধরা হল।



ভগন্দর, টনসিল, চোখের ছানি, ব্রণ, হার্নিয়া ইত্যাদি অস্ত্রোপচারের বিশদ বিবরণ সুশ্রুত সংহিতায় দেখতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদের আঁশ ও পশুর লোমের দ্বারা অস্ত্রোপচারের পর কাটাস্থান সেলাই করার প্রচলন ছিল। অনেকের মতে ভারতবর্ষই প্লাষ্টিক সার্জারির পথ প্রদর্শক। সমাজে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেক সময়েই অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী নাক, কান কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সুশ্রুত শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে এরূপ কাটা নাক বা কান জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছিলেন। উনার মতে প্রথমে একটি পাতাকে কাটা নাকের সমান করে কাটা হত। তারপর সেই পাতার সমান করে উক্ত ব্যক্তির গণ্ডদেশ থেকে কিছুটা চামড়া বা কলা কেটে কাটা নাকের জায়গায় বসিয়ে সেলাই করে দিলে কিছুদিনের মধ্যে কাটা নাক বা কান গজিয়ে উঠত।

এই সকল ব্যবস্থাপনার প্রথা থেকে ক্যাসটিগ লিওলি দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষেই প্রথম রিনোপ্লাষ্টি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সেই সময়ে শল্য চিকিৎসকরা সমাজে খুব সম্মানিত ব্যক্তি রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য যুগে নানা কুসংস্কার শল্য চিকিৎসাকে হীন ও ঘৃণ্য ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করায়

দ্রুত এই চিকিৎসা পদ্ধতির অবনতি ঘটতে থাকে। বৌদ্ধ যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য শাখার উন্নতি ঘটলেও তৎকালীন সময়ের শল্য চিকিৎসা তার হৃত গৌরব উদ্ধারে সমর্থ হয়নি।

উপরে বর্ণিত বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধতি ঋকবেদ ও অথর্ববেদে উল্লিখিত "ত্রিদোষবাদ" নামক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয়েছে এবং পরবর্তীকালে সমৃদ্ধও হয়েছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ এ তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষাই সুস্বাস্থ্য রূপে পরিচিত ছিল। আর কোন কারণে সমতা বিঘ্নিত হলে রোগের সৃষ্টি হত। নাভি থেকে পদতল পর্যন্ত অংশে বায়ুর অবস্থান, নাভি থেকে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পিত্তের অবস্থানও হৃৎপিণ্ড থেকে মস্তক পর্যন্ত অংশে কফের অবস্থান রূপে দেহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে এ তিন দোষই দেহকে পরিচালনা করে থাকে। তাদের তারতম্য হেতু বিভিন্ন আকৃতির মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের মানুষ আমরা দেখতে পাই। এছাড়া দেহ সাতটি ধাতুর দ্বারা গঠিত যথা — রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। এই সাতটি ধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফ দ্বারা প্রভাবিত। আয়ুর্বেদ মতে দোষ ও ধাতুর পারস্পরিক বিচারেই রোগের প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয় এবং চিকিৎসা করা সম্ভব। এছাড়া দেহকে শারীরিক ও মানসিক নামে দুই রূপে ভাগ করা হচ্ছে। ব্যাধির কারণও দুই প্রকার যেমন নিজ বা অন্তর্নিহিত এবং আগন্তুক বা বহিরাগত। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্বরের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জ্বরের অনেক কারণ সেই সময়েও জানা ছিল। জ্বরের উপর এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যে ত্রিদোষ সম্বলিত জ্বর তৎকালীন সময়েই দুরারোগ্য নামে পরিচিত ছিল। এক শ্রেণীর মেষ বা গরু এবং ইঁদুর জাতীয় প্রাণী যথাক্রমে বসন্ত ও প্লেগ রোগের বাহক হিসাবে তৎকালীন সময়েই পরিচিত ছিল বলে সুশ্রুত সংহিতায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ আছে।

এ সকল আলোচনা থেকে এটা অনুমান করা কঠিন নয় যে আজ থেকে তিন হাজার বছর আগেই প্রবর্তিত আয়ুর্বেদ হল বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা পদ্ধতির অগ্রদূত। এমনি ভাবে স্বাম্রাজ্য বিস্তার ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত শাসক ও সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে "জ্ঞান বিজ্ঞান" ও শিল্প সংস্কৃতিতে মৌর্যরা প্রায় ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছিল প্রায় সারা ভারত উপমহাদেশে। তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত কৃষি ও শিল্পসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা আধুনিক যুগের মিশ্র অর্থনীতির পূর্বসুরী রূপে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক হবে না।

খ) মৌর্যোত্তর যুগে বিজ্ঞান চর্চা

কালক্রমে মৌর্য সাম্রাজ্য বিলীন হল। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ থেকে পূর্ব ভারত, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে মৌর্যদের উত্তরসূরী ছিলেন সুঙ্গ, কাম্ব এবং সাতবাহনদের মত স্থানীয় শাসকরা। আর উত্তর-পশ্চিম ভারতে মধ্য এশীয়রা মৌর্যদের উত্তরসূরী রূপে শাসন করতে থাকল।

দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের প্রথম অর্ধে ইন্দোগ্রীক বা ব্যাকট্রিয়ানরা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে। গ্রীকদের পরে আসে শকরা। শকদের পাঁচটি গোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেও কেবলমাত্র পশ্চিম ভারতেই শক শাসন স্থায়ী হয়েছিল। শকদের উত্তর সূরী ছিলেন পার্থিয়ানরা। পার্থিয়ানদের পরে আসেন কুষাণরা। তারা 'ইউচি' নামে পরিচিত ছিলেন। তারাও পাঁচটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তবে শেষ অবধি উত্তর-পশ্চিম ভারতেই তাদের শাসন প্রায় ২৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মধ্য এশীয়দের সমসাময়িক সাতবাহনেরা দক্ষিণাত্যে ও মধ্য ভারতে এক বিশাল রাষ্ট্রের প্রবর্তন করেছিলেন। তবে সাতবাহনেরা ছিলেন দেশীয় শাসক। মৌর্যোত্তর যুগে সুঙ্গ, কাম্ব প্রমুখ দেশীয় রাজাদের এবং উত্তর দাক্ষিণাত্য ও পশ্চিম ভারতে শক শাসকদের (১০৬-১৩০ খ্রীষ্টাব্দে) পরাজিত করে গৌতমীর পুত্র সাতকর্ণি সাতবাহন রাজ্য উত্তরে মালপঃ থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। ২২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌমতী পুত্রের বংশধররা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে চোল, পাণ্ড্য ও চের বা কেরালা নামক তিনটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। অশোকের শিলালিপিতেও তাদের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে সভ্যতার আলো পৌঁছেনি বলেই ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ঐতিহাসিকরা মৃত মানুষের কবর থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে ভিত্তি করেই তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত ইতিহাস তৈরী করেছেন। এ সকল কবর বড় বড় পাথরের চাই দিয়ে ঘেরা থাকত। তাই ইতিহাসে তাদের নাম মেগালিথ। এসব কবরে নর কঙ্কালের সাথে মাটির পাত্র ও লোহার তৈরী জিনিষ পাওয়া গেছে। তবে লোহার তৈরী জিনিষপত্রের মধ্যে তীরের ফলা, বর্শারফলা, নিড়ানি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এ সকল তথ্য থেকে মনে হয় ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায় এ' উপদ্বীপ অঞ্চলের আর্যবাসীরা উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল না। লোহার ব্যবহার জানলেও তারা সাধারণতঃ পর্বতের ঢালেই বসতি স্থাপন করেছিল। ধান ও রাগীই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য শস্য। তবে সমতলে নেমে আসত না বলে চাষের জমির পরিমাণ কম ছিল না। খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকে তারা ক্রমশঃ নদী তীরে সমতল জমিতে বসতি স্থাপন শুরু করে। এ'সব অঞ্চলে ধান ও রাগী ব্যতীত তুলা ও মশলার চাষ হত। তাছাড়া পাহাড় পর্বতে বসবাসকারীদের পশুপালনও পেশা ছিল। তাই সে সময় পশমের ব্যবহাবে তারা অভ্যস্ত ছিল। ভারতীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে সভ্যতার আলো অনেক দেরীতে ফুটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে পিছিয়ে ছিল।

মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে মধ্য এশীয়, মধ্য ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সুঙ্গ, কাম্ব ও

সাতবাহন এবং প্রায় সমসাময়িক প্রথম রাজ্যগুলোর শাসনকালে প্রাচীন ভারতে ফলিত বিজ্ঞান চর্চা বা কারিগরি এবং বাণিজ্যের ইতিহাসে সবচেয়ে "সমৃদ্ধ যুগ" হিসাবে চিহ্নিত। মধ্য এশীয়দের আগমনে ভারতে বিজ্ঞান চর্চায় একটা ভিন্ন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল। তাই ভারতীয় জ্যোতিশাস্ত্রে গ্রহ তারকাদের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য এবং চলাচলে অনেক গ্রীক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় গ্রীক শব্দ হরস্কোপ থেকে সংস্কৃত শব্দ 'হরশাস্ত্রের' উৎপত্তি।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়নে উৎকর্ষতা ঃ

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিদ্যা ও রসায়নে তৎকালীন সময়ে ভারতীয়রা ছিলেন অগ্রণী। বিশেষ করে এ তিনটি বিজ্ঞানে চরক ও সুশ্রুতের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। চরম সংহিতায় এমন সব উদ্ভিদ ও গাছের পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলো থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ তৈরী হত। বিভিন্ন উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও রোদে শুকিয়ে আবার কখনও সিদ্ধ করে এসব ঔষধ তৈরী করা হত। এ থেকে মনে হয় প্রাচীন ভারতীয়রা রসায়ন বিদ্যা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এমনকি আজও গাছ গাছড়ার নির্যাস থেকে সংগৃহীত ক্ষার দ্বারা বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ তৈরী হয়ে থাকে। বর্তমানে অ্যান্টিবায়োটিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার থেকে রেহাই পেতে আজ পৃথিবীব সর্বত্র ভারতীয় ঔষধির গবেষণা ও ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। এ সকল বিশ্লেষণের আলোকে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও উদ্ভিদ বিদ্যায় 'বুদ্ধ পরবর্তী' সময়ে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল যার রেশ আধুনিক যুগেও অনুসৃত হচ্ছে।

আত্রেয়, সুশ্রুত, চরক, জীবক প্রমুখ আয়ুর্বেদ যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অবদান আয়ুর্বেদ পরবর্তী যুগেও চর্চার মাধ্যমে আরও উন্নত হয়েছিল। আয়ুর্বেদোত্তর যুগে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটে। ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে রসায়নের সংযুক্তির বহু আগেই ভারতেএরূপ সংযুক্তি ঘটেছিল। নাগার্জুন, বাণভট্ট, মাধবকর প্রমুখ আয়ুর্বেদোত্তর যুগের দিকপালগণ সুচিকিৎসক ও শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মূলতঃ চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চার মধ্য দিয়ে প্রাচীন হিন্দু রসায়নের ব্যুৎপত্তি ঘটে।

বুদ্ধ যুগে এসে চিকিৎসা শাস্ত্রে নতুন মাত্রা পায়। বুদ্ধের চত্বারি 'আর্য সত্যানি' বা চারটি মহামত যথা - ১) দুঃখ আছে, ২) দুঃখের কারণ আছে, ৩) দুঃখের নিরোধ হয়, ৪) দুঃখ নিরোধনের পথও আছে। এ চারটি সত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের রোগীর অসুস্থতার লক্ষণ, কারণ, সম্ভাব্য উপশম এবং উপশম বা সমাধানের পথ নিরূপণ — এ চারটি প্রাথমিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই বুদ্ধকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বা ভেষজগুরু বলে অভিহিত করা হয়।

এ জন্যই মানুষকে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি প্রভৃতি থেকে মুক্ত করার আহ্বানে বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শাসকরা দাতব্য চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, প্রসূতি গৃহ নির্মাণে যথেষ্ট মানবতার পরিচয় রেখেছেন। রোগীর গৃহের ধরণ, প্রসূতিভবন, শিশু চিকিৎসালয়, অস্ত্রোপচার গৃহ প্রভৃতি স্থপতি সম্পর্কে চরক ও সুশ্রুতেই দিক নির্দেশিকা দেখতে পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের বিবরণে সর্বসাধারণের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় এবং অশোকের দ্বিতীয় শিলালিপিতে চোল, পাণ্ডু, গ্রীক, পারসিক সীমান্তবর্তী অঞ্চলসহ তাঁর রাজ্যের সর্বত্র বহু দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিদর্শন পাওয়া

যায়। এসব চিকিৎসা কেন্দ্রে যোগ্য চিকিৎসক ও শুশ্রুষাকারিণীর সাহায্যে উপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদির মাধ্যমে মানুষ ও পশু উভয়ের চিকিৎসা হত।

ফাহিয়েন'র বিবরণ থেকে দেশের রাজন্যবর্গ ও ধনবান ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত দরিদ্র নিরাশ্রয়, খঞ্জ প্রভৃতি দুঃস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য পাটলিপুত্র বা অনুরূপ শহরে দাতব্য চিকিৎসালয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং তাঁর বিবরণীতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। পশুর চিকিৎসার জন্য অনুরূপ 'পশুশালা'র উল্লেখও তাঁর বিবরণীতে পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রী চরক ও সুশ্রুতের ন্যায় পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'শালিহোত্রে'র নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত 'শালিহোত্র সংহিতা' — পশু চিকিৎসার অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ। ২৮০০ শ্লোক নিয়ে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি আয়ুর্বেদ পদ্ধতিতে রচিত। আয়ুর্বেদের 'অষ্টাঙ্গের' মত ইহাতেও আটটি প্রধান অধ্যায় আছে। তবে ইহার রচনা কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন।

'শালিহোত্র সংহিতা'কে ভিত্তি করে নকুলের 'অশ্ব চিকিৎসা, জয় দত্তের 'অশ্ববৈদাক নামক আরও দুটি অশ্ব চিকিৎসা সংক্রান্ত বই রচিত হয়েছে। অপরদিকে নীলকণ্ঠ রচিত মাতঙ্গশালীও ছিল প্রাচীন ভারতীয় পশু চিকিৎসার অন্যতম গ্রন্থ।

১) মৃৎশিল্প, কাচশিল্প এবং ধাতুশিল্প সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যা এবং (২) চিকিৎসা বিদ্যা এ'দুটি পৃথক সূত্র থেকে প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের উদ্ভব বলে আধুনিক গবেষণায় প্রমাণিত। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায় খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত মৃৎপাত্র ও চীনা মাটির তৈরী পাত্র বা ধাতু শিল্পীদের গড়া অজস্র ধাতব দ্রব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে তাত্ত্বিকভাবে রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকলেও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বস্তুর সংমিশ্রণে এবং আগুনের ব্যবহারে তারা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। তাই বলা চলে তারাই হলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম রসায়নবিদ।

তারপর এল আর্য্যুবেদের যুগ। সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে রসায়ন শাস্ত্র আরও সংহত রূপ নিল। এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে আয়ুর্বেদের প্রয়োজনেই রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ ঘটতে লাগল। চিকিৎসা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান অংশের মুখ্য উদ্দেশ্য। চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় ছয় প্রকার ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার, লবণ ও ক্ষারের প্রস্তুতিও ব্যবহার এবং সম্বিত পানীয় সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। তাতে মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের জ্ঞান ও সুস্পষ্ট। তাতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এ পাঁচ প্রকার মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে যৌগিক পদার্থের উৎপত্তির কথা বলা আছে।

শোরা, সৈন্ধব, বিট, উদ্ভিদ ও সামুদ্রিক লবণ নামে পাঁচ প্রকার লবণের উল্লেখ পাওয়া যায়। "পলাশ গাছের তরুণ অংশ বা অনুরূপ অন্য গাছকে টুকরা টুকরা করে কেটে প্রথমে শুকানো হত। তারপর কখনও চুনাপাথরের সাথে মিশিয়ে বা কখনও চুনাপাথর ব্যতীত টুকরা অংশগুলো পুড়ে ছাঁই করা হত। চার/পাঁচ গুণ পরিমাণ জল দিয়ে ভাল করে গুলে কাপড়ের ছাঁকনির সাহায্যে একুশবার ছেঁকে ক্ষার তৈরী করা হত।" এ'রা পটাশ বা সোডিয়াম কার্বোনেট নামে আধুনিক

রসায়ন শাস্ত্রে পরিচিত। তীব্রতার দিক থেকে মৃদু, মধ্যম ও তীব্র এ তিন প্রকারের ক্ষার প্রস্তুতির কথাও চরক ও সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখ আছে।

চরক ও সুশ্রুত উভয় সংহিতায় সন্মিত পানীয় নামে প্রায় ৮৪ প্রকার পানীয়ের উল্লেখ আছে। এগুলো সাধারণত শস্য, ফলমূল, পুষ্প, উদ্ভিদের কাণ্ড, পত্র, শর্করা ইত্যাদি দ্রব্য থেকে প্রস্তুত করা হত। দ্রব্যের নামানুসারে এদের নাম হত। যেমন— ধান থেকে প্রস্তুত ধান্যাসব, ফল থেকে প্রস্তুত ফলাসব, পুষ্প থেকে প্রস্তুত পুষ্পাসব ইত্যাদি।

চৈনিক তুর্কীস্থানের একটি বৌদ্ধস্তূপে প্রাপ্ত খ্রীষ্টায় চতুর্থ শতাব্দীর চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি পাণ্ডুলিপিতে "নাবনীতকের" পরিচয় পাওয়া যায়। সুশ্রুত চরক সংহিতাকে ভিত্তি করে নানা প্রকার উদ্ভিদের সাহায্যে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুতির মধ্যে উনার রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু-পিত্ত-কফ এবং চক্ষুরোগে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন অনুপাতে ঔষধি মিশিয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও মলম প্রস্তুতি বিধির আলোচনার জন্য 'নাবনীতকে'র বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া তুঁতিয়া, মুস্ত, কাসীস্, কুর্মের পিত্ত, লৌহচূর্ণ, তন্তী, সহদেবা ও ভৃঙ্গরাজ সমানভাগে মিশ্রিত করে বহেড়ার তেলে সিদ্ধ করে সাদা চুল কালো করার জন্য কলপ তৈরী করার পদ্ধতিও উনার রচিত পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

ধাতব শিল্পে উৎকর্ষতা ঃ

তামা, ব্রোঞ্জ, কাংস্য, লৌহ ইত্যাদি বিবিধ ধাতু উত্তোলন, নিষ্কাশন ও শংকর ধাতু প্রস্তুতি প্রভৃতি শিল্পে প্রাচীন ভারতে প্রভূত উন্নতি ঘটেছিল। এ'ধাতুর শিল্পকে ভিত্তি করে ধাতু উত্তোলন, নিষ্কাশন এবং ধাতব দ্রব্য তৈরীতে কারিগরি বিদ্যার সাথে সংশ্লিষ্ট রসায়ন শাস্ত্রেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা যথেষ্ট বুৎপত্তির পরিচয় রেখেছেন। তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত শিল্পের কিছু কিছু নিদর্শন আজও পাওয়া যাচ্ছে। এ'সকল শিল্প দ্রব্যে ব্যবহৃত জ্ঞান আজও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় গবেষণার পাথেয় জুগিয়ে যাচ্ছে।

নেপাল সীমান্তে প্রাপ্ত ২৪.৫ ইঞ্চি লম্বা অশোক স্তম্ভের অর্গলটি খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে নির্মিত বলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন। এছাড়া সে সময়ে ব্যবহৃত নানা প্রকার তাম্রমুদ্রারও কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে। গ্রীক ও ব্যাকট্রীয় নৃপতিরা এ ধরনের তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। কুষাণ ও পরবর্তী গুপ্ত সম্রাটদের আমলেও তাম্র মুদ্রার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং এ'মুদ্রাগুলো ছিল বিশুদ্ধ তামার তৈরী। গোরক্ষপুর জেলার সাগৌড়া গ্রামে প্রাপ্ত ব্রাহ্মী হরফে লেখা তাম্রফলকটি উৎকর্ষতার অন্যতম নজির। ইহা আনুমানিক খ্রীঃ পূর্বঃ চতুর্থ শতাব্দীতে তৈরী বলে অনেকের ধারণা। মূর্তি তৈরীর কাজ ও তামার ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর জেলার সুলতানপুরে এক প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট বৌদ্ধ মূর্তিটি তৎকালীন সময়ের ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম নিদর্শন। মূর্তিটির ওজন প্রায় একটন এবং সবটাই বিশুদ্ধ তামার তৈরী। ইহা খ্রীষ্টায় পঞ্চম শতকে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন। হিউয়েন সাং এর বিবরণে নালন্দায় ৮০ ফুট উঁচু এক বিরাট তাম্র নির্মিত বৌদ্ধ মূর্তির বর্ণনা পাওয়া পাওয়া যায়। তবে আর কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিউয়েন সাং-এর বর্ণনা অনুযায়ী এর যদি কোন অস্তিত্ব থাকত, তবে এটা রোডস্ দ্বীপের অতিকায় ব্রোঞ্জ

মূর্তির সাথে অবশ্যই তুলনীয় হবে। আর এটা হবে খ্রীষ্টীয় ৭তম শতাব্দীর অন্যতম আশ্চর্য। কারো কারো মতে এ রূপ একটি মূর্তি তৈরী হলেও কোন অজ্ঞাত কারণে হয়তো এটা বিধ্বস্ত হয়েছে।

সিংহভূম, হাজারিবাগ, রাজপুতনা, নেপাল, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের তাম্রখনি থেকে তামা উত্তোলন করা হত। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনেও প্রাচীন ভারতীয়রা উৎকর্ষতার প্রমাণ রেখেছিল। সে সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

এছাড়া তামা নিষ্কাশন পদ্ধতিতেও যথেষ্ট উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয়। বল সাহেব রচিত Economic Geology of India নামক গ্রন্থ থেকে নীচের চিত্রে এরূপ একটা নিষ্কাশন পদ্ধতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।



"যে ঘরে তামা নিষ্কাশন করা হত তাকে মারুত চুল্লী ঘর বলা হত। ঘরের ভিতরটি বিশেষ পদ্ধতিতে নিষ্কাশনের উপযোগী করে তোলা হত। ঘরের মাঝখানে (১২-১৫) ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্তকার গর্ত করা হত। গভীরতায় ছিল প্রায় ২-৩ ইঞ্চি. গর্তের তলদেশে প্রথমে মিহিবালি ও পরে ছাই প্রায় সমানভাবে বিছানো হত। গর্ত ব্যতীত ঘরের বাকী মেঝেটিতে সাধারণ বালু বিছানো হত। এসব ব্যবস্থা করা হত যাতে গলিত ধাতু মেঝে গড়িয়ে নষ্ট হয় না। গর্তের মধ্যে চারটি মাটির নল ব্যবহার করা হত। তিনটি নলের মধ্যে দিয়ে তিনটি হাপরের সাহায্যে বাতাসের ঝাপটা প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা ছিল। আর চতুর্থটি হল ধাতুমলের নির্গম পথ।

গর্তের পার মাটির দ্বারা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করে ইহার উপর পরপর তিনটি মৃত্তিকা বলয় (Fire clay) বসানো হত। ব্যাস ও উচ্চতার দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। উপরের বলয়টির ব্যাস ১৫ ইঞ্চি ও উচ্চতা ১০ ইঞ্চি। উপরের বলয় দুইটি কয়েকবার ব্যবহার করা যেত।

খনি থেকে উত্তোলিত তাম্রপিণ্ড প্রথমে পাথরের হাতুড়ির দ্বারা গুঁড়ানো হত। এর সাথে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর মিশিয়ে অপর একটি চুল্লীতে জারিত করা হত। তারপর উপযুক্ত পরিমাণ কাঠ, কয়লা, জারিত তামা এবং ধাতুমল হিসাবে কিছু লৌহ মারুত চুল্লীতে সংস্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করা হত। হাপরের সাহায্যে বাতাসের ঝাপটা দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ তৈরী করে জারিত তামা থেকে বিশুদ্ধ তামা নিষ্কাশন করা হত। এরূপ একটি চুল্লীতে তিন মণ কাঠ কয়লা ও দুই মন লৌহ ধাতুমল ব্যবহার করে আড়াই মণ তামা গলানো হত।"

বিভিন্ন অনুপাতে তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ ও কাঁসা এবং তামা ও দস্তা মিশিয়ে পিতল প্রভৃতি শংকর ধাতু তৈরীতেও প্রাচীন ভারতীয়রা যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। টিনের পরিমাণে হেরফের ঘটিয়ে ব্রোঞ্জ ও কাঁসার মধ্যে পার্থক্য আনা হত। কাঁসার মধ্যে টিনের ভাগ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকত। তাতে কাঠিন্য ও গলনাঙ্কের দিক থেকে ব্রোঞ্জ ও কাঁসার মধ্যে পার্থক্য থাকত।

ভারতে ব্রোঞ্জ ও কাঁসার ব্যবহার প্রাচীন। গৃহস্থালীর নানাবিধ পাত্র, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, মূর্তি ও অলংকার নির্মাণে সিন্ধু সভ্যতার আমল থেকেই ভারতে কাঁসা ও ব্রোঞ্জ ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় হরপ্পার ব্রোঞ্জে ৪.৫১ থেকে ১৩.২১ শতাংশ টিন মিশানো হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিনের পরিমাণ সাধারণতঃ (১১-১৩) শতাংশ থাকত। ব্রোঞ্জের কাঠিন্য আনয়নে প্রয়োজনে অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক মেশানোর প্রমাণও পাওয়া গেছে। টিন, অ্যান্টিমনি ও আর্সেনিক প্রভৃতি ধাতু তৎকালীন সময়ে ভারতে উত্তোলনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাই অনুমান করা হচ্ছে এ সকল খনিজ দ্রব্য বাহির থেকে আমদানি করা হত। সম্ভবতঃ পারস্য থেকে টিন আমদানি করা হত বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তামা, ব্রোঞ্জ ও সীসক নির্মিত বাসনপত্র অলংকার, শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে তক্ষশিলার প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে। প্রাচীন ভারতে ব্রোঞ্জ থেকে নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরী করা হত। এছাড়া খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকেই ভারতে ব্রোঞ্জের মুদ্রার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। তক্ষশিলায় প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে পিতলেরও দ্রব্যও পাওয়া গেছে। বড় বড় বুদ্ধ মূর্তি, বুদ্ধবিহার, মন্দির বা অনুরূপ সৌধ নির্মাণে পিতল ব্যবহার হত বলে হিউয়েন সাং-এর বিবরণে দেখতে পাওয়া যায়।

ঋক্‌বেদের যুগ থেকে ভারতে লৌহ ব্যবহৃত হত বলে অনেকে মনে করেন। তবে অক্সিজেনের সাথে যৌগিক ক্রিয়ায় লৌহে মরিচা পড়ে বলে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত লৌহ দ্রব্যাদির খুব বেশী নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তথাপি মাদ্রাজের টিনিভেলি জেলার আদিত্য নালুরে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে ব্যবহৃত লৌহনির্মিত তরবারি, ছোরা, তীরের ফলা, বল্লমের অগ্রভাগ, লাঙ্গলের ফলা ইত্যাদি প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় যথেষ্ট পাথেয় জুগিয়ে যাচ্ছে।

প্রযুক্তিতে উৎকর্ষতা ঃ

মধ্য এশীয়দের আবির্ভাবে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে

ভারতীয়রা মধ্য এশীয়দের কাছ থেকে নতুন প্রযুক্তি ও আয়ত্ত করেন। এদের মধ্যে ট্রাউজার তৈরী ও চামড়ার দ্বারা জুতো তৈরীর প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া রোমানদের অনুকরণে কুষাণরা তামা ও স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করেন। "এ যুগে কাচ শিল্পের উপর ও বিদেশী প্রভাব পড়েছিল। কাচ শিল্পে এ'সময় ব্যাপক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।" তাছাড়া গ্রীক ভাস্কর্যের প্রভাবেই হেলেনীয় শিল্প ও পরবর্তীকালে গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটেছিল।

সাতবাহন শাসকদের ব্যবহৃত মুদ্রা এবং দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য ভারতে আবিষ্কৃত শিলালিপি থেকে সাতবাহন শাসন আমলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সম্পর্কীয় অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। মূলতঃ সাতবাহন যুগে দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় ও উত্তর ভারতীয় উপাদানের সংমিশ্রিত সংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। লোহার তৈরী নিড়ানী ও লাঙ্গলের ব্যবহার প্রমাণ করে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। দাক্ষিণাত্যের মানুষ ধান বোনার সাথে রোয়ার পদ্ধতি সম্পর্কেও অবগত ছিল। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী পাললিক অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে ধান উৎপন্ন হত। সাতবাহন রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল কৃষ্ণমৃত্তিকা সমৃদ্ধ হওয়ায় ব্যাপকহারে তুলার চাষ হত। ধান ও তুলা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হত বলে দাক্ষিণাত্যের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উন্নত গ্রামীণ অর্থনীতি গড়ে উঠে।

এছাড়া করিমগঞ্জ ও রেঙ্গুনের খনি অঞ্চলে আকরিক লৌহের প্রাধান্য হেতু লৌহ শিল্পের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। সাতবাহনরাই সম্ভবতঃ প্রথম সীসার মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁরা সাধারণতঃ সোনার মুদ্রা ব্যবহার করতেন না। তবে সোনার অলংকারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।

উত্তর ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব তৎকালীন সময়ে দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বাড়ীতে জলের জন্য কুয়োর ব্যবহার অন্যতম। তাছাড়া পোড়া ইটের দেওয়াল এবং টালির ছাদ সমৃদ্ধ বাড়ীর নিদর্শন পাওয়া গেছে করিমগঞ্জ জেলার পেন্দাবানকুরে (২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রীষ্টাব্দ) এছাড়া একই অঞ্চলে ২২টি ইটের তৈরী কুয়ো আবিষ্কৃত হয়েছে। ঢাকনাযুক্ত নর্দমার ব্যবহার এবং Plini'র বিবরণ থেকে ৩০টি দেওয়াল ঘেরা নগরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ভারতের ন্যায় মধ্য ভারতও দাক্ষিণাত্যে তৎকালীন সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটেছিল।

সমৃদ্ধ স্থপতি ঃ

নাসিকে আবিষ্কৃত তিনটি বিহার ও কৃষ্ণা গোদাবরী অঞ্চলে পাথরের তৈরী স্থাপত্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় পাথর কেটে মঠ ও মন্দির তৈরী শিল্পে সাতবাহন যুগেও উৎকর্ষতা ঘটেছিল। দেবতা ও বৌদ্ধের প্রতিকৃতি সমৃদ্ধ মন্দির তাদের ভাষায় 'চৈত্য' নামে এবং বড় হলঘর সমৃদ্ধ মঠ 'বিহার' নামে পরিচিত ছিল। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের কারনেতে ৪০ মিটার দীর্ঘ্য, ১৫ মিটার প্রস্থ এবং ১৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন আবিষ্কৃত চৈত্য এবং ইলোরা ও অমরাবতী পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহা ও স্তম্ভ ভাস্কর্য আজও ভাস্বর হয়ে আছে। তাছাড়া নাগার্জুন কোণ্ডার বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ইটের তৈরী মন্দির ও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে।

তবে মৌর্য আমল থেকে পাশ্চাত্য দেশসমুহের সহিত যোগাযোগের পরোক্ষ ফল হিসাবে গান্ধার অঞ্চলে অর্থাৎ পেশোয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যথা জালালাবাদ, বাথিয়ান, বেগ্রাম, সোয়াট উপত্যকা, ইউসুফজাই এলাকা এবং তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ শিল্পের

এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। ইহাই ইতিহাসে গান্ধার শিল্প নামে পরিচিত।

তৎকালীন সময়ে প্রচলিত বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও শিল্প, গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রতিফলনে অতিমাত্রায় প্রস্ফূটিত হয়ে উঠে। গান্ধার শিল্প কণিষ্কের সময়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করলেও কনিষ্ক পরবর্তী সময়ে তার চরম বিকাশ ঘটে। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলো, জিউস প্রভৃতি প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ছিল গান্ধার শিল্পীদের অন্যতম কীর্তি। গান্ধার শিল্পে গ্রীক ও রোমান শিল্পের প্রতিফলন ঘটলেও শিল্পীরা শিল্পের ভারতীয় নীতি থেকে সরে আসেননি। এ'সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিকের মন্তব্য উল্লেখ্য "গান্ধার শিল্পীগণ গ্রীক শিল্পীদের ন্যায়ই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের মন ছিল সম্পূর্ণ ভারতীয়।" তাই ভিন্‌দেশী প্রভাবিত গান্ধার শিল্পের উৎকর্ষতা সম্পর্কে কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত বহুল পরিমাণে অতিরঞ্জিত।



ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

সভ্যতা বিকাশের দিক থেকে দাক্ষিণাত্যের উপদ্বীপ অঞ্চল পিছিয়ে থাকলেও অর্থকরী ফসলরূপে তুলা ওগোলমরিচ জাতীয় মশলা এবং পশম উৎপাদন, হাতির দাঁত ও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত মণিমুক্তা ও খনি থেকে সংগৃহীত মূল্যবান পাথর সমুদ্র পথে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে চালান করে তারা একটা সমৃদ্ধ আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। উপদ্বীপ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সূতী ও পশমী বস্ত্র তৈরী হত। এছাড়া এসব রাজ্যে তৈরী হত সাপের খোলসের মত পাতলা মসৃণ বস্ত্র যা ইতিহাসে মসলিন বস্ত্র নামে পরিচিত। তুলা, সূতী ও পশমী বস্ত্রের ব্যবহারিক কেন্দ্র রূপে চোল রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র উরাইয়ুন প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পরমাণুবাদ ও বলবিদ্যা ঃ

পরমাণু তত্ত্ব, বস্তুর গঠন ও বলবিদ্যা মূলতঃ ফলিত বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। আলোচনায় আমরা চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন ও ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা ইত্যাদি ফলিত বিজ্ঞানে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের অবদান সম্পর্কে অবগত হয়েছি। কিন্তু পরমাণু তত্ত্ব বস্তুর গঠন বা স্বরূপ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়

গুণীজনদের ধ্যান-ধারণা নিয়ে আলোচনা না করলে ফলিত বিজ্ঞানের কৃতি বিজ্ঞানীদের অবদান একজন কারিগরের পর্যায়ে পড়ে যাবে। তবে তৎকালীন সময়ে তাত্বিক বিজ্ঞান চর্চায় ঘাটতি থাকলেও ভারতীয় দার্শনিকরা এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বৈশেষিক ন্যায়, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে পরমাণু তত্ত্ব সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে। বস্তুর গঠন, গতি, বল ও তাহার কারণ অভিকর্ষ, বিশ্ব সৃষ্টির কারণ সহ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুদের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে তৎকালীন ভারতীয় দার্শনিকদের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুর উপাদান, পরমাণুবাদ, বস্তুর জড়ত্ব, গতি ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বৈশেষিক দর্শনে বিস্তৃত আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে এ সম্পর্কে আলোচনা আরও বেশী প্রজ্ঞার দাবী রাখে। এ বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকদের আলোচনাও মৌলিকত্বের দাবী রাখে। পদার্থের মৌলিকত্ব আলোচনায় ভারতীয় না গ্রীক দার্শনিক অগ্রদূত—এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় উভয় দেশের দার্শনিকরা ছিলেন সমসাময়িক। কেননা বৈশেষিক ন্যায় সূত্রের রচনা কাল খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী, পূর্ব মীমাংসা ও বেদান্ত সূত্র (আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ২য় শতাব্দী), সাংখ্য সূত্র (১০০ খ্রীঃ পূর্ব অব্দ)। অপরদিকে অ্যারিষ্টটল, এপিকিউরাস (খ্রীঃ পূর্ব ৩৭০-২৭০) এবং সক্রেটিসের রচনাকাল (৯৮-৫৫) খ্রীঃপূর্ব। এতে এটা স্পষ্ট যে উভয় দেশের দার্শনিকরাই ছিলেন মানসিকতা ও চিন্তার দিক থেকে উন্নত প্রতিভার অধিকারী।

বৈশেষিক ন্যায়ে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু — চারিপ্রকার মৌলিক পরমাণুর কথা বলা হয়েছে। বৈশেষিক ন্যায়ের প্রশান্তপাদ, বাৎসায়ন, উদ্দ্যোতক, বাচস্পতি প্রমুখ পণ্ডিতগণ তাদের সারগর্ভ আলোচনার দ্বারা পদার্থ সম্পর্কে বৈশেষিক ন্যায় শাস্ত্রের বক্তব্যকে আরও সমৃদ্ধ করেন। এদের মধ্যে 'পদার্থ - ধর্ম সংগ্রহের' রচয়িতা প্রশান্তপাদ পদার্থের স্বরূপ সম্পর্কে কণাদের ১৭টি গুণের পরিবর্তে ২৪ গুণের উল্লেখ করেন। তাঁর রচনায় পরমাণুবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষিত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া যায়। তাছাড়া বলবিদ্যা সম্পর্কীয় তাঁর আলোচনাও মৌলিকত্বের দাবী রাখে। কারও কারওমতে তাঁর রচনাকাল ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। বাৎসায়ন, উদ্দ্যোতক, বাচস্পতি প্রমুখ ভাষ্যকারগণও পরমাণু সম্পর্কে বৈশেষিক শাস্ত্রের উপর আলোচনা করলেও মৌলিকতার দিক থেকে প্রশান্তপাদের আলোচনা অনেক বেশী উন্নত।

বায়ু ছাড়া অন্যান্য পরমাণুদের সংযুক্তির ব্যাপারে বৈশেষিক ন্যায়ে দুটি তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এক মতে পরমাণুরা দুই, তিন, চার বা আরও বেশী সংখ্যায় সংযুক্ত হয়ে দ্ব্যাণুক, ত্র্যাণুক, চতুরণুক ইত্যাদি নানাবিধ অণু তৈরী করে। অন্যমতটি হল পরমাণুবাদের স্বাভাবিক আবর্তন বা পরিস্পন্দন গতির প্রভাবে আপনা হতে একজোড়া পরমাণু মিলিত হয়ে দ্ব্যাণুক তৈরী করে, যেখানে পরমাণুর মৌলিক গুণ অব্যাহত থাকে। এমনিভাবে দ্ব্যাণুকরা তিন বা ততোধিক সংখ্যায় মিলিত হয়ে ত্র্যাণুক, চতুরণুক ইত্যাদি বড় বড় অণু তৈরী করে। প্রশান্তপাদ দ্বিতীয় মতের প্রস্তাবক বলে অনেকে মনে করেন। প্রাচীন ভারতে পরমাণুর আবর্তন বা পরিস্পন্দন আধুনিক পরমাণু বিদ্যায় বর্ণিত পরমাণুর গতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্যের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ।

রাসায়নিক সংযুক্তি সম্পর্কে বৈশেষিক ন্যায়ের ভাষ্যকার প্রশান্তপাদের ব্যাখ্যায় উত্তাপকে অপরিহার্য উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। উনার মতে উত্তাপের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার দ্ব্যাণুক

সংযুক্তির মাধ্যমে বড় বড় অণু সৃষ্ট হয়ে থাকে এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন দ্রব্যাদিরও উদ্ভব ঘটে। এ' পদ্ধতিতে সৃষ্ট এক ভৌতিক যৌগ হল একটি সহজতর উদাহরণ। তাঁর মতে এক ভূতের অন্তর্গত দুই বা ততোধিক দ্রব্য উত্তাপের প্রভাবে মিলিত হয়ে এ'রূপ যৌগ সৃষ্টি করে। এভাবে সৃষ্ট এক ভৌতিক যৌগ পরস্পরের সান্নিধ্যে আসলে উত্তাপের প্রভাবে দ্রব্য দুটির অণুরা পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং নিজেদের গুণ ও ধর্ম হারিয়ে ফেলে। পরবর্তী পর্যায়ে উত্তাপের প্রভাবে বিশ্লিষ্ট পরমাণু পুনরায় মিলিত হয়ে প্রথমে নতুন গুণ সম্পন্ন স্যাণুক ও পরে স্যাণুকের প্রভাবে বড় বড় অণু তৈরী করে। এছাড়া বৈশেষিক ন্যায় শাস্ত্র বিশারদ বাৎস্যায়ন দেখিয়েছেন দ্রব্যের অন্তর্নিহিত উত্তাপের দ্বারাও এধরনের রাসায়নিক সংযুক্তি সম্ভব। কাঠের অন্তর্নিহিত উত্তাপই ছাড়া পেলে অগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ'সম্পর্কে আরেক বৈশেষিক ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞই প্রথম বলেন সৌর উত্তাপই পদার্থের মধ্যে সঞ্চিত থাকে।

বৌদ্ধদর্শনেও পরমাণুবাদ সম্পর্কে একটা আভাস পাওয়া যায়। এ'মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু এ'চার প্রকার পদার্থ অতি ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত। এ'চার প্রকার পদার্থের পরমাণুদের গুণ ও ধর্ম ভিন্ন। তাঁদের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্ষিতি মৌলবা গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ ও স্পর্শ গুণের অধিকারী। অপমৌলরা স্বাদ, বর্ণ, স্পর্শ ও স্বাতন্ত্রী গুণের অধিকারী। তাপ, বর্ণ ও স্পর্শ গুণের অধিকারী হল তেজমৌলরা। বায়ু মৌলরা স্পর্শ ও চাপের অধিকারী। তবে "সমগুণসম্পন্ন পরমাণুরা পরস্পর মিলিত হয়ে একটি মৌল গঠন করে" বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় পণ্ডিতদের এ'তত্ত্ব ছিল পরমাণুবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এক ক্রান্তিকারী ঘটনা।

জৈনদর্শনে পদার্থের পরমাণু তত্ত্ব আরও বেশী যুক্তি গ্রাহ্যরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। জৈন দর্শনে পদার্থকে বলা হয় পুদগল। পুদগলই শক্তির একমাত্র আধার। আণবিক ও যৌগিক উভয় অবস্থায় এ'পুদগল থাকতে পারে। অণু পুদগলের ক্ষুদ্রতম অংশ। ইহা অবিভাজ্য, অনন্ত, অবিনশ্বর। একাধিক অণুর সংযোগে গঠিত পুদগলের নাম স্কন্দ। দুই অণু বিশিষ্ট স্কন্দ বা যৌগিকের নাম দ্যাণুক এবং অনন্ত সংখ্যা অণুবিশিষ্ট স্কন্দদের নাম অনন্তাণুক।

পরমাণু সম্পর্কে জৈন দর্শনের মতবাদ আধুনিক পরমাণুবাদের সাথে অনেকটা সাযুজ্যপূর্ণ। বিশেষ করে 'স্কন্দ', 'স্কন্দক' ও 'অনন্তাণুক' বর্তমান মৌল, সরলযৌগ ও জটিলযৌগ (পলিমার) এর সাথে সংগতিপূর্ণ।

এছাড়া পুদগল ধারণা বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচণেও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। এতে বলা হয়েছে "সৃষ্টির আদিতে পুদগল একই অবস্থায় বিশ্বের সর্বত্র সমানভাবে বিস্তৃত ছিল। বিবর্তন মুহূর্তে ক্রমশঃ বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন প্রকার অণুতে পরিণত হয় এবং পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার স্কন্দ উৎপন্ন করে।"

কেবল একটি রুক্ষত্ব এবং অপরটি স্নিগ্ধত্ব গুণ সম্পন্ন দুটি বিপরীত ধর্মী অণুর সংযোগের ফলেই দ্ব্যাণুক অর্থাৎ যৌগ সৃষ্টি সবসময সম্ভব নয়। অপরদিকে একটি বেশী রুক্ষত্ব এবং অপরটি তুলনামূলকভাবে কম রুক্ষত্ব গুণ সম্পন্ন অণুতে সংযোগ ঘটতে পারে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে জৈন দার্শনিক উমাস্বাতী এ' মতবাদ প্রচার করেন। আধুনিক যুগের যৌগের তড়িৎ রাসায়নিক সংযোগের সাথে এ'মতবাদের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বৈশেষিক ন্যায়ে পরমাণুদের আবর্তন ও পরিস্পন্দন গতির কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ পরমাণু সমন্বয়ে যে পদার্থের সৃষ্টি তার স্বরূপ, গতি, কারণ ইত্যাদি আবশ্যিক ব্যাপার। প্রশাস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে অবস্থার জন্য বস্তুর স্থান পরিবর্তন ঘটে, তাহাই সে বস্তুটির গতি নামে পরিচিত। তাঁর মতে গতির একটি নির্দিষ্ট দিক আছে। এছাড়া তিনি সরলগামী, ভ্রমণ ও স্পন্দন নামক বিভিন্ন ধরনের গতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

উনার মতে চাপ, অভিঘাত, স্থিতিস্থাপকতা ইত্যাদি হল বস্তুতে সৃষ্ট গতির প্রথম কারণ। আবার প্রযত্ন, গুরুত্ব, অদৃষ্ট ইত্যাদি হল বস্তুতে সৃষ্ট গতির দ্বিতীয় কারণ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়—

১) চাপের প্রভাবে ঠেলা চলা, দণ্ডাঘাতে কুম্ভকারের চাকার আবর্তন সৃষ্টি ইত্যাদি বস্তুতে গতি সৃষ্টির প্রথম কারণ।

২) প্রাণী দেহের অঙ্গ সঞ্চালন হল প্রযত্ন। গাছ থেকে পাতা পড়া হল গুরুত্ব। ঢালু জায়গা দিয়ে তরলের নির্গমন হল দ্রবত্ব।

চুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডের গতি লাভ হল অদৃষ্ট। এরূপ অদেখা কারণগুলো বস্তুতে গতি সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ রূপে পরিগণিত।

বৈশেষিক ন্যায় শাস্ত্র অনুযায়ী বলা যায়, বলই হল গতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। এমনকি গুরুত্বের কারণেও যে পৃথিবীর আকর্ষণ এবং আকর্ষণের জন্যেই ভারী বস্তু উপর থেকে নীচে পড়ে। ঐ সত্যটিও বৈশেষিক যুগেই জানা ছিল। উপর থেকে নীচে পড়ার বিভিন্ন মুহূর্তে বস্তুতে সৃষ্ট গতির স্বরূপ নিয়ে বৈশেষিক ন্যায় শাস্ত্রে বিশদ আলোচিত হয়েছে। তবে কোন পরীক্ষালব্ধ ফলের উল্লেখ নেই। অথচ বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে গ্যালিলিওর বস্তুর গতি সম্পর্কীয় ফলাফল বৈশেষিক শাস্ত্রের উত্তরসূরী।

আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতগণ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, ধাতুর্বিদ্যা, পরমাণুবাদ ও বল বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞান চর্চায় যথেষ্ট বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। মৌর্যোত্তর যুগে বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তিতে যে উৎকর্ষতা ঘটেছিল তাদের সংক্ষিপ্তকার আমরা নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারি।

এক — ভারতের সর্বত্র লিপির ব্যবহার। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির অধিক ব্যবহার।

দুই — অনুশাসন রূপে শিলালিপির ব্যবহার।

তিন — জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ও তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি।

চার — পঁচাত্তরটি পেশার মধ্যে প্রায় চৌষট্টিটি পেশায় শ্রমজীবীর তথ্য প্রমাণ প্রাপ্তি।

পাঁচ — ভারতের সর্বত্র কারুশিল্প, মৃৎশিল্প, কাষ্ঠশিল্পের প্রসার।

ছয় — লোহা, তামা, সীসা সহ বিভিন্ন ধাতু শিল্পের উৎকর্ষতা ও প্রয়োগ বৃদ্ধি।

সাত — কৃষিকাজে লোহার লাঙ্গল, নিড়ানী ব্যবহার এবং রোয়া পদ্ধতি, সেচ ব্যবস্থা প্রয়োগে শস্য উৎপাদনে ব্যাপক উন্নতি। তুলা, মশলা প্রভৃতি অর্থকারী ফসলের উৎপাদনে নতুন মাত্রা সংযোগ।

আট — পাথরের পুঁতি ও স্বর্ণলংকারের ব্যবহার।

নয় — শিল্পের পুনরাবির্ভাব।

দশ— সূতী বস্ত্র, পশমী বস্ত্র ও মসলিন বস্ত্র ব্যবহারে ব্যাপকতা বৃদ্ধি।

এগার — নগরায়নের পত্তন, পোড়া ইট, টালি প্রভৃতির ব্যবহার, দেওয়াল যুক্ত নগর বা বাড়ী ও বাড়ীতে কুয়োর ব্যবহার এবং ঢাকনাযুক্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সুস্থ স্বাস্থ্য চেতনা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার প্রমাণ করে।

বার— চোল রাজা কারিকোল কর্তৃক কাবেরী নদীর উপর ১৬০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ এবং বাঁধের জলসেচ কার্যে ব্যবহার আধুনিক হাইড্রেন বাঁধের পূর্বপদক্ষেপ।

তের — ক্রীতদাস প্রথার প্রবর্তন, কারিগর ও শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংঘ পরিচালনা— আধুনিক পেশাগত সংস্থার পূর্বসূরী।

চৌদ্দ — অজন্তা ইলোরা, অমরাবতীতে দেশী ও বিদেশী স্থপতির সংমিশ্রণ প্রভৃতি তৎকালীন সময়ের ফলিত বিজ্ঞান।

পনের — আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের প্রবর্তন।

ষোল — সড়ক ও সমুদ্র পথের উন্নতি এবং প্রযুক্তির উৎকর্ষতা আজও বহন করে চলেছে। আলোচনা দেখা যাচ্ছে বৈদিক যুগে লুপ্ত প্রায় বিজ্ঞান চর্চা বৌদ্ধ ও বৌদ্ধ পরবর্তী সময়ে এসে পুনরায় সঞ্চালিত হতে শুরু করে। অনুকূল পরিবেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বী আচার্যরাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। গোঁড়া হিন্দু বা গোঁড়া বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় আচরণে বাড়বাড়ন্ত থাকলেও বিজ্ঞান চর্চায় সার্বজনীন রূপ পেয়েছিল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকলেও গঠনমূলক প্রতিযোগিতার ফলে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ফলে একদিকে যেমন কৃষি, শিল্প, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা, আয়ুর্বেদ বিদ্যার পরীক্ষা ভিত্তিক সাফল্য এসেছিল তেমনি সে সময় থেকেই আধুনিক পরমাণুবিদ্যার তাত্ত্বিকচর্চার সূত্রপাত। এমনিভাবে প্রাচীন ভারতে ম্রিয়মান বিজ্ঞানচর্চা বৌদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ে এসে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার অগ্রণী দূতরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

সংশ্লিষ্ট সারণীগুলোতে সিন্ধু সভ্যতা থেকে মৌর্যোত্তর যুগ পর্যন্ত সমাজ বিকাশে বিজ্ঞান চর্চা ও উৎকর্ষতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হল।

সমাজ বিকাশের সারণী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পবিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনেব তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
সিন্ধু সভ্যতা	মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি	নতুন নতুন কাজে মস্তিষ্ক অর্জিত অভিজ্ঞতার ব্যবহার ।	পোড়ামাটি, সার্বজনীন স্নানাগাব, গোলাঘব, প্রাচীর সহ ইটের তৈরি বাড়ি ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবহাব । তামা ও ব্রোঞ্জের ন্যায় সংকর ধাতুব ব্যবহার । সূতা কাটা ও কাপড় বোনা শুরু । সোনা রূপা ও পাথরের অলঙ্কাব ব্যবহার। যোগাযোগে গাধা, ঘোড়া ও নৌকার ব্যবহার। লিপি রূপে বিভিন্ন ছবির ব্যবহার। হিসাব নিকাশের প্রচলন। বৈদেশিক বাণিজ্যেব প্রবর্তন।	গোষ্ঠীপতি পুরোহিত এবং সাধারণ সিন্ধুবাসী নামক তিন শ্রেণীর সম্মিলিত সমাজব্যবস্থার উদ্ভব । সাধারণ সিন্ধুবাসীরাই কারিগব, শিল্প ও সাধারণ শ্রমিক অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তিরূপে পরিচিত।	যান্ত্রিক সভ্যতাব ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে লাগল । ফলে আরও উন্নত সভ্যতায় উত্তরণের সূচনা হল ।	সমকালীন ব্যবিলনীয়, মিশরীয় বা মেসোপটেমীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিল । সমসাময়িক কোন সভ্যতা এত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তার লাভ করেনি । তৎকালীন সময় সিন্ধুসভ্যতার শহরগুলির মত এত বৃহৎ শহর ও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। পরিকল্পনা মাফিক পয়ঃ প্রণালী সম্পন্ন এত উন্নত পোড়া ইটের ব্যবহার কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। কারো কারো মতে একমাত্র ক্রেটে সিন্ধুর ন্যায় উন্নত সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। সার্বিক বিচারে সমসাময়িক সভ্যতাগুলির মধ্যে সিন্ধুসভ্যতা ছিল নগরায়ন সভ্যতার অন্যতম পথিকৃৎ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
পূর্ববর্তী বৈদিক যুগ আনুমানিক ১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ (আর্যদের আবির্ভাব ও ঋক্‌বেদের আত্মপ্রকাশ।)	আনুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আল্পস পর্বতের পূর্বদিকের ইউরোপীয় অঞ্চল থেকে আর্যরা ভারতে আসে। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত আর্যরা পেশী শক্তিতে স্থানীয় ভারতীয়দের তু লনায় অধিক বলবান ছিলেন।	ঘোড়া ও রথের ব্যবহার, কাঠের তৈরী লাঙ্গলের ফলা আবিষ্কার ও কৃষি কাজে তার ব্যবহার।	ঘোড়ার টানা রথ ব্যবহার। শস্য বোনা, কাটা ও মাড়াই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। তুলনামূলকভাবে উন্নত মানের সুতী বস্ত্র বোনা ও ও ব্রোঞ্জের নিপুণ দ্রব্যাদির ব্যবহার।	গোষ্ঠী পরিচয়ই ছিল সমাজের বড় পরিচয়। 'জনপদ' ও ভিস শব্দেও গোষ্ঠীর প্রাধান্যই বুঝায়। 'গৃহ' শব্দের দ্বারা এক পরিবারের লোকদের বুঝানো হত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রাধান্য থাকলেও সামাজিক কাজে মহিলাদের অধিকার ছিল। তবে বিবাহের রীতিনীতি বা বৈবাহিক জীবনের দিক থেকে আদিম আচরণ থেকে মুক্ত ছিল না। আর্যরা মূলতঃ যোদ্ধা, পুরোহিত ও সাধারণ মানুষ-এ তিন শ্রেণীতে	যোগাযোগের ক্ষেত্রে চাকার ব্যবহার। কৃষি ব্যবস্থার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি। বুনন শিল্পের উৎকর্ষতা লাভে বস্ত্র ব্যবহারে ব্যাপকতা বৃদ্ধি। নিপুণ ধাতব বস্তুর ব্যবহারের মাধ্যমে কারিগরদের দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিময় পণ্য হিসাবে গরুর ব্যবহার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক ক্রান্তিকারী ঘটনা।	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পবিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পবিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
				বিভক্ত ছিল। ভারতে আর্যদের দ্বারা পরাজিতরা 'দাস' ও দস্যু নামে অভিহিত হত। পরবর্তী পর্যায়ে তারাই 'শূদ্র' শ্রেণীরূপে চিহ্নিত হল তবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাগ প্রকট ছিল না। জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে সকলকেই কাজ করতে হত। এ সময়ের শেষের দিকে ঋক্‌বেদের আবির্ভাবে মানুষ দেবদেবীর পূজা অর্চনায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমাজে পেশা ভিত্তিক বিভাজন সৃষ্টি হতে থাকে।		

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
পরবর্তী বৈদিক যুগ (১০০০-৬০০) খ্রীঃ পূর্বাব্দ	চর্চার মাধ্যমে বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রুতি ও স্মৃতি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় শক্তিশালী হতে থাকে।	লৌহ বা কৃষ্ণ আয়াস, গরু টানা লাঙ্গল।	রাজস্থানের ক্ষেত্রিতে লৌহাব আকরিক এবং নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকারী ঘটনা। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উৎকর্ষতা লাভ।	ঋকবেদ ব্যতীত সামবেদ, অর্থব বেদ, যজুর্বেদ রচিত হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এ'চারটি ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। দেবদেবীর আরাধনা, চাষাবাদ ও যাগ্-যজ্ঞে ও বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য। আব বৈশ্যেবা কৃষিকাজ, কারিগরি কাজ ও বাণিজ্যে মগ্ন থাকে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা উপনয়নেব মাধ্যমে পৈতা ধারণ করতে পারতেন। শূদ্রদের এ'অধিকার ছিলনা। সমাজে শূদ্ররা অস্পৃশ্যরূপে পরিগণিত হতে লাগল।	লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে সভ্যতা ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলল। লোহার ফলক যুক্ত গরু টানা লাঙ্গল ব্যবহারে কৃষি কাজে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে আর্যরা ক্রমশ কৃষি নির্ভব স্থায়ী জীবিকা গ্রহণ করতে শুরু করে।	ঋতু পরিবর্তনের সাথে সংগতিপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নেব জন্য প্রাচীন ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষচর্চা সমকালীন মিশরীয়, ব্যবিলনীয় ও চৈনিক বিজ্ঞান চর্চার সাথে যুক্ত। ইন্দো ইউরোপীয়দের আচার অনুষ্ঠানগুলির সাথে বৈদিকদের আচার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকবণাদি	আবিষ্কাব বা স্বতঃস্ফূর্ত পবিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
জৈন ও বুদ্ধ যুগ (৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)	জৈন ও বুদ্ধ ধর্মের উদারতার আহ্বানে বৈদিক যুগে অনুসৃত বা লব্ধ প্রথা বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে মাংসাশীরা পুনরায় শাকাশীতে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে দেহে মাংসজাত প্রোটিনের ঘাটতি স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।	বলিদান প্রথা বন্ধকরণ ও আন্তঃরাজ্য দ্বন্দ্বের অবসান। ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি। আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে অনীহা।	বলিদান প্রথা বন্ধ হওয়ায় পশুর সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং জীবিকা হিসাবে পশুপালনে উৎসাহ বৃদ্ধি পেল। মবিচা বর্জিত উন্নত লৌহ যন্ত্রপাতির আবিষ্কার। ধর্মীয় আচরণেব ক্ষেত্ররূপের বিহার বা মন্দিরের আবির্ভাব। গরুব স্থলে সোনা, রূপা ও তামার ধাতব মুদ্রাব আবির্ভাব।	প্রাচীন ভারতে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি বুদ্ধ যুগেই একটা সুসংহত রূপ নিয়েছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে কবেন। কৃষিকাজে লৌহ যন্ত্রপাতির ব্যবহারে কৃষিভিত্তিক এক অর্থনীতির জন্ম নেয়। গ্রাম ভারতের পরিধি বাড়তে থাকে। উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভাবতে দ্বিতীয় নগবায়নের সূচনা কবে। অপরদিকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থ বজায় রাখার তাগিদে সমাজে বর্ণ প্রথা বজায় থাকে। কৃষি কাজ বা ব্যবসা	সিংভূম ময়ূরভঞ্জ থেকে আহৃত আকরিক লৌহ দিয়ে যন্ত্রপাতি বানাতে গ্রামীণ কারিগররা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন করল। এ সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বাসযোগ্য ও আবাদি জমির পবিমাণ দিন দিন বাড়িয়ে তুলল। ফলে প্রাণী ও কৃষি অর্থনীতির দিন দিন বিকাশ ঘটতে লাগল। এ বিকাশমান কৃষি অর্থনীতি ভারতে ২য় পর্যায়ে নগরায়নের যাত্রা শুরু করল। কুটীর শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন মাত্রা পেল। এ যুগে বিভিন্ন কারুকার্য সম্বলিত চক্‌চকে ও মসৃণ মৃন্ময় পাত্রাদির	এ সময়ে ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা ও গ্রীক, চৈনিক এবং আরব্য বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
				বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈশ্যদেব অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় হলেও শূদ্রদেব সামাজিক বা আর্থিক কোন দিকেই পবিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। এ সময়েই উৎপন্ন পণ্যের একটা অংশ রাজারা রাজস্ব হিসাবে আদায় করত। কোথাও কোথাও সমাজতান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা প্রবর্তন ছিল এ যুগের ক্রান্তিকারী পরীক্ষা-নিরীক্ষা।	ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ইতিহাসে এ যুগ PAINTED GREY WARE (PGW) যুগ নামে পরিচিত।	
বুদ্ধ পরবর্তী যুগ (মৌর্যযুগ)	জৈবিক দিক থেকে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। তবে	দক্ষিণ বিহারে ব্যাপক আকরিক লৌহ প্রাপ্তি, ইস্পাত তৈরী প্রক্রিয়া আবিষ্কার। বৈশ্য ও	খোদাই করা মুদ্রার ব্যবহার, পোড়া ইটের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাপক সংখ্যায় নগরায়ন।	বুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে মৌর্যযুগ ইতিহাসে এক সমৃদ্ধশালী যুগ রূপে পরিচিত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	লৌহ নির্মিত লাঙ্গলের ফলা ব্যবহারে ব্যাপকতা লাভে আবাদী জমির পরিমাণ দিনদিন বাড়তে	এসময় সিরিয়ার গ্রীক সেলুকাস বংশের রাজত্বকাল থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও হেলেনীয় সভ্যতা পারস্পরিক

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
	কৌটিল্যের ন্যায় রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও অর্থনীতিতে দক্ষ ব্যক্তিত্ব বিরল ছিল।	ব্যবসায়িকদেব রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠ পোষকতা লাভ। সড়ক পথের উন্নতি। যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তিদের বন্দী করে ক্রীতদাস রূপে কৃষিতে নিয়োগ। ফলে কৃষি মজুরীর পবিমাণ হ্রাস।	লৌহাব তৈবী খাপে ভরা কুঠার, কাস্তে এবং লাঙ্গলের ফলার ব্যবহারে ব্যাপকতা লাভ। বাড়ীতে জলের জন্য কুয়োর ব্যবহার। বড় বড় খুঁটি পুঁতে বন্যার জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা। ইস্পাত তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার। ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণ হয় ভাবতে বিজ্ঞানের যাত্রা পুনরায় অপ্রতিহত গতিতে এগোতে থাকে।	এ যুগের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমান কেরালা, তামিলনাডু ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অংশ ছাড়া গোটা উপমহাদেশ মৌর্য শাসনের অধীনে ছিল। অর্থাৎ এক সংঘবদ্ধ ভারত তৈরী হয়েছিল। চাণক্যের ন্যায় এক বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রভাবে আধুনিক নগরায়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরে পয়ঃপ্রণালী, জন্ম মৃত্যু নথিভুক্তকরণ, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল মৌর্য শাসন ব্যবস্থার জনহিতকর দিক। তবে মৌর্য	থাকে। ফলে মৌর্যরাজাদের বাজত্ব বাড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। আর্দ্র আবহাওয়া এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির কাঠামোর পরিবর্তে বাড়ী তৈরীতে পোড়া মাটির ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। বৈশ্য ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আধিক্য হেতু নতুন নতুন বাণিজ্য অঞ্চল ও নতুন নতুন নগরের পত্তন হতে থাকে। খুঁটি ও মাটির সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কৃষিকাজে নতুন মাত্রা সংযোগ করে। বাড়ীতে কুয়ো খনন করে গার্হস্থ্য কাজে ও পানীয় হিসাবে জলের ব্যবহার পরবর্তী উন্নত প্রথায় জল	সংযুক্তিতে উভয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। চিকিৎসা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি চর্চায় গ্রীকের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠে। কারও কারও মতে এ সময় ইউরোপ হতে যান্ত্রিক জ্ঞান ও ভারতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিস্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
				শাসকরা বিশেষ করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন একনায়কতন্ত্রী শাসক। কলিঙ্গ যুদ্ধে নবহত্যা অশোক ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের পরবাজ্য গ্রাস থেকে বিরত থাকতে মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। সমাজে বুদ্ধধর্ম প্রাধান্য পেতে থাকে। বিভিন্ন দেশে এ'ধর্ম বিস্তার লাভ কবে এবং ধর্মপ্রচারে মিশনারী প্রথার প্রবর্তন হয়।	সংগ্রহের যাত্রা সূচিত করে।	
মৌর্যত্তর যুগ (২০০ খ্রীঃ পূঃ ২০০ খ্রীষ্টাব্দ)	পেশী বলে বলীয়ান বিদেশী যাযাবর গোষ্ঠী উত্তর ও পশ্চিম ভারত অধিকারে সমর্থ। যদিও পূর্ব, মধ্য	বলবান অশ্ব এবং উন্নত মানের অশ্বারোহীব অধিকারী। ভারতে বিদেশী শিল্পায়ন ও স্থাপত্যের অনুপ্রবেশ।	গৃহ নির্মাণে টালি ও সুরকির ব্যবহার, উন্নত মুদ্রাব ব্যবহার। বাড়ীতে ইটের তৈরী পাকা কুয়ো নির্মাণ, লাল রংয়ের মৃৎ-	বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও গ্রীক শক, পার্থিয়ান এবং কুষাণরা ধীরে ধীরে ভাবতীয় সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েন। যোদ্ধা	গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার প্রভাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার উৎকর্ষতা লাভ। জামা, ট্রাউজার, লম্বাকোট, বুটজুতা	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
	ও দক্ষিণ ভারতে মৌর্যদের উত্তর সূরীই প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন।	গ্রীক জ্যোতিষ বিজ্ঞানের প্রভাব। ধানের চারা রোপণসহ লৌহ ও ধাতব শিল্পে উৎকর্ষতা লাভ। কাপড়ে রং করা, কুটির ও হস্তশিল্পের ব্যাপকতা লাভ। টেরাকোটার পুনঃ উত্থান। স্থল ও জল পথে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রাধান্য বিস্তার, নগর উপনিবেশের ব্যাপকতা বৃদ্ধি, স্থাপত্য শিল্পে পাথরের ব্যবহার, জুতা ও ট্রাউজারের ব্যবহার।	শিল্পের প্রবর্তন। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার গ্রীক ভাবধারায় প্রভাব এবং গ্রীক শব্দ হরস্কোপের প্রচলন। চিকিৎসা বিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভ। পাগড়ী, জামা, ভারী কোট, ট্রাউজার ও বড় বুট জুতার প্রবর্তন। কাচ শিল্পে বিদেশী প্রভাব। মঠ, স্তম্ভ ও মন্দির স্থাপত্যে পাথরের ব্যবহার এবং ভারতের প্রায় সর্বত্র এরপ্রভাব বিস্তৃত হয়। গ্রীক ও রোমানদের প্রভাবে হেলেনীয় ও গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি, হস্তশিল্প কুটির শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যাপকতা বৃদ্ধি।	হিসাবে তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। তাই তারা ক্ষত্রিয় রূপেই চিহ্নিত। তবে ভারতীয় আদি শাস্ত্রকারদের মতে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষত্রিয়। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ের প্রচলিত ভারতীয় সমাজের প্রভাবে স্থায়ী ভারতীয় রূপেই রয়ে গেছেন। সমাজে বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণের সাতবাহনরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করতেন। বুদ্ধধর্মের প্রভাব আচ্ছন্ন থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়	ব্যবহারে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোষাকে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পোষাকে বিলাসিতার প্রাদুর্ভাব। জমিতে ধানের চারা রোপণের ফলে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন থেকে দেখা যায় পোড়া মাটির তৈরী ইট ও টালির ব্যবহার উত্তর ভারতের প্রায় একশ বছর আগে শুরু হয়েছিল। তার সাথে ছিল সুরকির ব্যবহার। কুয়ো এবং ঢাকনা যুক্ত নর্দমা ব্যবহার স্বাস্থ্য সচেতনতার পরিচায়ক। পাথরের স্থাপত্য নির্মাণের কৌশল আয়ত্তকরণ এবং	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পরিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
				বাড়ন্তের ঘাটতি ছিল না। কৃষ্ণ বাসুদেব প্রমুখ দেবদেবীর পূজার্চনায় বিস্তৃতি লাভ করে। দক্ষিণ ভারতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কারিগরি শিল্প উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও ক্ষেত মজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবীদের ন্যায় সমাজে উৎপাদিকা শক্তির অন্যতম বৃহৎ অংশরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বহির্বাণিজ্যের উন্নতি হওয়ায় বেনিয়া বা পুঁজিপতির বিকাশ লাভ ঘটতে থাকে। সমাজে জুতা, ট্রাউজার সহ বিভিন্ন	হেলেনীয় ও গান্ধার শিল্পের প্রভাবে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতিতে নতুন যুগের সূচনা হল। মন্দির বা মঠগুলো বিদ্যাচর্চায় ব্যবহৃত হত। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির ফলে ভারত থেকে রান্নার মশলা, মসলিন কাপড় মূল্যবান পাথর, অলঙ্কার লোহার তৈরী মসৃণ ছুরি, মধ্য এশিয়ার দেশ সমূহ এবং রোমে রপ্তানি হত। চীন থেকে ভারত হয়ে রেশম রপ্তানী হত। অপর দিকে রোম থেকে সুরা, কারুকার্য খচিত মাটির পাত্র, সীসা প্রভৃতি আমদানি করা হত। বৈদেশিক	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
যুগ	জীবের দেহগত পরিবর্তন	পবিবর্তন ঘটাতে সহায়ক উপকরণাদি	আবিষ্কার বা স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তন	সমাজ ব্যবস্থা	আবিষ্কার বা পরিবর্তনের তাৎপর্য	সমসাময়িক সভ্যতার সাথে সম্পর্ক
				বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।	বাণিজ্য প্রসারের ফলে ভারতের বন্দরগুলো এবং বহু নগরীর ও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে।	

(গ) গুপ্তযুগে বিজ্ঞান চর্চা

শুরুতে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম এ'বলে যে আমার সাক্ষীতে কৃতি সন্তানরূপে কোন রাজা-রাণীর কথা এসে গেলে তাঁদের কৃতিত্ব নিয়ে আমি অবশ্য আলোচনা করব। তাই এমনি কিছু কীর্তিমান রাজা সম্পর্কে আমার সাক্ষীতে আপনারা জানতে পাবেন। সেদিক থেকে গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৩৩৫-৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতে কিছু কিছু রাজা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার যে কৃতিত্ব রেখে গেছেন অতীতের সাক্ষী হিসাবে সে সম্পর্কে আপনাদের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে আর একটি সাম্রাজ্যের পত্তন হল। অনেকের মতে গুপ্তরা উত্তরপ্রদেশে কুষাণদের সামন্ত রাজা ছিলেন। কুষাণদের পতনের পর উত্তর ভারতের কুষাণদের রাজ্যগুলো দখল করে নিতে তাদের বেশী সময় লাগেনি। শুধু উত্তর ভারত নয়, দক্ষিণ ভারতেও সাতবাহনদের পরাজিত করে গুপ্তরা তাঁদের রাজ্য বিস্তৃত করেছিল। সমুদ্র গুপ্তের সময় সর্বাধিক বিস্তৃতি ঘটে। সাম্রাজ্য জয়ই ছিল সমুদ্রগুপ্তের নেশা। তাই তাকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়। ৩৩৫-৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ ভারত গুপ্ত শাসনের অধীনে ছিল।

শুধু কেবল সাম্রাজ্য বিস্তৃতির দিক থেকে নয়, সে সময় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি প্রায় সব ক্ষেত্রে ভারতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ'সব কারণে গুপ্তযুগকে ভারতের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ঃ এলাহাবাদ জেলায় আবিষ্কৃত ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি অংক ও জ্যোতির্বিদ্যায় গুপ্তযুগে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ যুগে অঙ্ক শাস্ত্রে ক্রান্তিকারি যে বইটির পরিচয় পাওয়া যায় তার নাম 'আর্যভট্টীয়'। কুসুমপুর নিবাসী আর্যভট্ট নামক এক বিশ্ববিশ্রুত গণিতজ্ঞ কর্তৃক এ বইটি রচিত হয়েছে। সেকালে কুসুমপুর ব্যতীত উজ্জয়িনী এবং দাক্ষিণাত্যের মহীশূর গণিত চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। এর মধ্যে আর্যভট্ট যেমন কুসুমপুরের অধিবাসী ছিলেন তেমনি বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য উজ্জয়িনীর এবং মহাবীর বা মহাবীরাচার্য মহীশূর ঘরাণার সাথে যুক্ত ছিলেন। আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচার্য প্রমুখ গণিতজ্ঞদের জন্য উক্ত তিনটি স্থান শুধু প্রাচীন ভারতে নয় বিদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সংখ্যাতত্ত্ব, দশমিক পদ্ধতি এবং শূন্যের ব্যবহারে প্রাচীন ভারত শুধু বুৎপত্তিই অর্জন করেনি বিশ্বকে শেখাতেও অগ্রণী ছিল। পিঙ্গল কর্তৃক প্রবর্তিত ছন্দসূত্রে প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্যভট্ট প্রণীত আর্যভট্টীয় তিনটি খণ্ড আর ভূমিকা সম্বলিত। প্রথম খণ্ডের তিনটি অংশ দশগীতিকা, প্রস্তাবনা আর গণিতপদ — যার বিষয়বস্তু গণিত। কাল, ক্রিয়াপদ, সময় আর গ্রহ পরিচিতি নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে গোলক, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে।

আর্যভট্টই ভারতীয় গণিতে শূন্যকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। প্রথমখণ্ডে আর্যভট্ট পাটীগণিতে এক, দশ, শত, সহস্র, অযুত, নিযুত, কোটি, অর্বুদ, বৃন্দ ইত্যাদি স্থানীয় মানের প্রচলন করেন। প্রথম সংখ্যাটিকে দশ দিয়ে গুণ করলেই তার পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। এটা মূলতঃ বর্তমান

দশমিক পদ্ধতিরই পূর্বসূরী। বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি প্রাক্ আর্যযুগে প্রচলিত থাকলেও ঘনমূল নির্ণয় পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে আর্যভট্টের। ত্রিরাশিক, বহুরাশিক, সুদকষা ইত্যাদি পাটীগণিতের নানা বিষয় নিয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

সুদকষার প্রশ্নে দ্বিঘাত সমীকরণের কথা এসে যায়। তাতে এটা স্পষ্ট সরল সমীকরণ বা দ্বিঘাত সমীকরণ ইত্যাদির সাহায্যে আর্যভট্ট অজ্ঞাত রাশি নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। সব কিছু বিবেচনা করে এটা বলা চলে যে, আর্যভট্টই বীজগণিতের প্রথম প্রবক্তা। এছাড়া অনির্ণয় সমীকরণের সমাধান, π (পাই) এর মান নির্ণয় এবং ত্রিকোণমিতির আলোচনায় সাইন তালিকার প্রস্তুতি — গণিতের এ তিনটি ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি পথিকৃৎ। আর্যভট্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানেও প্রথম গণিতের ব্যবহার করেন। প্রাচীন ব্যাবিলন পদ্ধতিতে তাঁর উদ্ভাবিত গণিতের সাহায্যে সমৃদ্ধ করে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থিতি নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণও আবিষ্কার করেছিলেন। উনার গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণেয় ভূ-পৃষ্ঠের পরিধির মান আজও বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত। আর্যভট্টই প্রথম ঘোষণা দিয়েছিলেন যে সূর্য স্থির। পৃথিবী তার চারপাশে প্রদক্ষিণ করে।

খ্রীষ্টায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির নামে অপর এক ভারতীয় পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের কিছু সমস্যা সমাধানে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বললেন, পৃথিবী সূর্যের চারপাশে এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বরাহমিহিরের অবদান, বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রহ্মগুপ্ত নামে জনৈক বিজ্ঞানী গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন। অধ্যাপক সার্টনের মতে তিনি ছিলেন "One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time"। উজ্জয়িনী ছিল তাঁর জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। মাত্র ত্রিশ বৎসরে বয়সে তিনি 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত' রচনা করেন। তাঁর এ গ্রন্থ রচনায় সূর্য সিদ্ধান্ত ও আর্যভট্টীয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও ইহাতে তাঁর নিজস্ব বহু গাণিতীয় ও জ্যোতিষীর আবিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে। এছাড়া খণ্ড খাদ্যক ও উত্তর খণ্ড খাদ্যক নামক জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কীয় আরও দুটি বই রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে বইগুলো পার্সী ও আরবী ভাষায় অনুদিত হয়।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে তিনি বৈদিক ধারণার দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেবতাদের প্রভাবে গ্রহের গতি পরিবর্তন এবং দিনের যেকোন সময় গ্রহদের সঠিক গতি ও অবস্থান নির্ণয়ে উনার গণনা পদ্ধতিতে তিনি মৌলিক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

গণিতেও ব্রহ্মগুপ্তের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ সমাধানের নিয়ম আবিষ্কার করেন। বীজগণিতের সাহায্যে জ্যামিতির ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিমাপ নির্ণয়ে তাঁর পদ্ধতি আর্যভট্টের পদ্ধতির চেয়ে সাবলীলতার দাবী রাখে। এদের মধ্যে পিরামিডের ফ্রাস্টামের আয়তন এবং ত্রিভূজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কল্পে তাঁর উদ্ভাবিত সূত্রগুলো আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পিরামিডের ফ্রাস্টামের আয়তন —

$$V= \frac{1}{3} h (S_1^2+S_2^2+S_1S_2)$$

S_1S_2 = ফ্রাসটামের বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য

h = উচ্চতা

ত্রিভুজের নির্ভুল ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে তিনি সূত্র প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন। এ সূত্র অনুযায়ী Δ = S(S-a) (S-b) (S-c) এখানে S = ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা।

a. b. c = ত্রিভুজের তিনটি বাহু। কারণ আর্যভট্ট প্রণীত সূত্রটি কেবলমাত্র সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

ভারতীয় জ্যোতিষচর্চায় গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাবের ব্যাপকতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ভারতীয় ও গ্রীক জ্যোতিষের সংমিশ্রণে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ নামে একটি নতুন শাখার জন্ম হয়। তবে এতে তথ্য বিন্যাসে, আলোচনায় বা গণনা পদ্ধতিতে প্রচলিত ভারতীয় জ্যোতিষ চর্চা তার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উন্নত মতবাদের দ্বারা ভারতীয় পণ্ডিতরা জ্যোতিষ চর্চায় উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছিলেন।

সিদ্ধান্ত বলতে বিশেষ কোন গ্রন্থ বুঝায় না। জ্যোতিষ চর্চায় উন্নত কোন গ্রন্থকেই ভারতীয় জ্যোতিষাচার্যরা 'সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ' নামে অভিহিত করতেন। এরূপ প্রায় ১৮টি জ্যোতিষ সিদ্ধান্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা —

"সূর্য সিদ্ধান্ত	কাশ্যপ সিদ্ধান্ত	লোমশ (রোমক) সিদ্ধান্ত
পিতামহ সিদ্ধান্ত	নারদ সিদ্ধান্ত	পৌলিশ সিদ্ধান্ত
ব্যাস সিদ্ধান্ত	গর্গ সিদ্ধান্ত	চ্যবন সিদ্ধান্ত
বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত	মারীচি সিদ্ধান্ত	যবন সিদ্ধান্ত
অত্রি সিদ্ধান্ত	মনু সিদ্ধান্ত	ভৃগু সিদ্ধান্ত
পরাশর সিদ্ধান্ত	অঙ্গিরা সিদ্ধান্ত	শৌনক সিদ্ধান্ত"

তাদের মধ্যে সূর্য সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ চর্চার দিক থেকে অনেক বেশী উন্নত ও সমৃদ্ধশালী। ভারতীয় বহু পণ্ডিতদের গবেষণায় আদি সূর্য সিদ্ধান্ত নানাভাবে পরিবর্তিত, সম্প্রসারিত ও সংশোধিত হয়ে বর্তমান রূপে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত দেখিয়েছেন আর্যভট্টের "অর্ধরাত্রিকা" থেকে গৃহীত জ্যোতিষ ধ্রুবকগুলো ব্যবহার করে বরাহমিহির সূর্যসিদ্ধান্তের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

যাই হউক, "(১) গ্রহদের মধ্যম গতি (২) গ্রহদের প্রকৃত অবস্থান (৩) দিক দেশ ও কাল (৪) (৫) ও (৬) চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ (৭) গ্রহদের সংযোগ (৮) ও (৯) নক্ষত্র (১০) চন্দ্রের উদয়াস্ত, উচ্চতা (১১) সূর্য ও চন্দ্রের কয়েকটি দোষ (১২) ব্রহ্মাণ্ড লোক, ভূগোল সৃষ্টির ব্যাপ্তি, (১৩) অখিলারী গোলক ও কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি এবং (১৪) কাল নিরূপণের বিভিন্ন উপায় প্রভৃতি মোট ১৪টি কাল নিরূপণের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ নিয়ে বর্তমান সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত।"

বর্তমান অংশে আধুনিক জ্যোতিষ চর্চার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কিছু বিশেষ বিশেষ তথ্য ও তত্ত্বের

আলোচনা করা হল।

মহাযুগে গ্রহদের ভগন কাল, গ্রহদের নক্ষত্র বৎসর, যুতিকাল ইত্যাদি নিয়ে সূর্য সিদ্ধান্তের মতামত ও তার সাথে আধুনিক ইউরোপীয় জ্যোতিষীর সাথে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নের দুটি সারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী-ক

গ্রহ	এক মহাযুগে ভগন সংখ্যা
সূর্য	৪,৩২০,০০০
চন্দ্র	৫৭,৭৫৩,৩৬৬
বুধ	১৭,৯৩৭,০৬০
শুক্র	৭,০২২,৩৭৬
মঙ্গল	২,২৯৬,৮৩২
বৃহস্পতি	৩৬৪,২২০
শনি	১৪৬,৫৬৮
চন্দ্রযুতির ভগন	৫৩,৪৩৩,৩৩৬
চন্দ্রের অনভূ	৪৮৮,২০৩
চন্দ্রের পাত	২৩২,২৩৮
মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত সাধাবণ দিন	১,৫৭৭,৯১৭,৮২৮
মহাযুগের অন্তর্ভুক্ত চান্দ্র দিন	১,৬০৩,০০০,০৮০

সারণী - খ

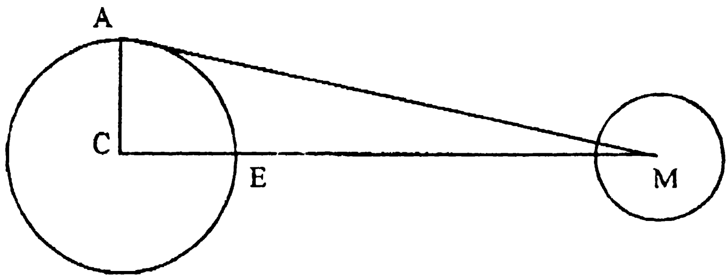
	নাক্ষত্রিক ভগন কাল		যুতিকাল	
গ্রহ	সূর্যসিদ্ধান্ত	হার্শেলের জ্যোতিষ	সূর্যসিদ্ধান্ত	উডহাউসের জ্যোতিষ
পৃথিবী	৩৬৫.২৫৮৭৫	৩৬৫.২৫৬৩৬১২		
চন্দ্র	২৭.৩২১৬৭	২৭.৩২১৬৬১৪	২৯.৫৩০৫৮৬	২৯.৫৩০৫৮৮
বুধ	৮৭.৯৬৯৭	৮৭.৯৬৯২৫	১১৫.৮৮	১১৫.৮৭৭
শুক্র	২২৪.৬৯৭৯২	২২৪.৭০০৭৮৬৯	৫৮৩.৯	৫৮৩.৯২
মঙ্গল	৬৮৬.৯৯৭৫	৬৮৬.৯৭৯৬৪৫৮	৭৭৯.৯২৪	৭৭৯.৯৩৬
বৃহস্পতি	৪৩৩২.৩২০৬	৪৩৩২.৫৮৪৮২১২	৩৯৮.৮৯	৩৯৮ ৮৬৭
শনি	১০৬৭৫.৭৭৩	১০৭৫৯.২১৯৮১৭৪	৩৭৮.০৮	৩৭৮.০৯

সমরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থের সৌজন্যে সারণী দুটি উদ্ধৃত হল ।

ক নং সারণী মূলতঃ পৌলিশ সিদ্ধান্তের সংশোধিত রূপ আর খ নং সারণীতে সূর্য সিদ্ধান্তের সাথে ইউরোপীয় জ্যোতিষের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

"সূর্য সিদ্ধান্তের মতে পৃথিবীর ব্যাস ১৬০০ যোজন। সূর্য সিদ্ধান্তের অন্যতম পণ্ডিত ভাস্করাচার্যের মতে পৃথিবীর ব্যাস ১৫৮১ যোজন। এক যোজনা = ৫ মাইল ধরলে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল এবং ভাস্করাচার্যের মতে ইহা ৭৯০৫ মাইল। তাতে এটা স্পষ্ট ভাস্করার্যের পদ্ধতিতে ব্যাস পরিমাপ এত নিখুঁত যে আধুনিক পরিমাপের সাথে ইহা অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সূর্যসিদ্ধান্ত অনুযায়ী চন্দ্রের লম্বনের পরিমাপ ৫৩.৬৮০'



উপরের চিত্রানুযায়ী পৃথিবী হল E , M চন্দ্র, C ভূ-কেন্দ্র এবং A ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত একটি বিন্দু।

তাহলে AMC কোণের নাম চন্দ্রের লম্বন। AC অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। AMC কোণের পরিমাপ অর্থাৎ লম্বন জানা থাকলে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব সহজে বের করা যায়। এ'পদ্ধতিতে নির্ণেয় পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব, এবং চন্দ্র কক্ষের পরিধি যথাক্রমে ৫১,৫৬৬ যোজন ও ৩,২৪,০০০ যোজন। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্তী বলে এ'পদ্ধতিতে দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ। পৃথিবী থেকে দূরবর্তী গ্রহদের লম্বনের পরিমাপ ছোট বলে এ'পদ্ধতিতে পৃথিবী থেকে অন্যান্য গ্রহদের দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ ছিল না। তবে গ্রহ কক্ষের পরিধি এবং গ্রহদের নাক্ষত্রিক ভগন কাল জানা থাকলে গ্রহদের বেগ পরিমাপ করা সহজ ছিল।

$$\text{"অর্থাৎ বেগ} = \frac{\text{গ্রহ কক্ষের পরিধি}}{\text{গ্রহের নাক্ষত্রিক ভগন কাল}} = \text{যোজন / দিন}$$

$$\text{এ' হিসেবে চন্দ্রের বেগ হল } \frac{\text{গ্রহ কক্ষের পরিধি}}{\text{গ্রহের নাক্ষত্রিক ভগন কাল}} = \frac{৩,২৪,০০}{২৭,৩২১}$$

$$= \text{১.১৮৫৯ যোজন / দিন।"}$$

আলোচনায় এটা স্পষ্ট সূর্যসিদ্ধান্ত প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষ চর্চার অন্যতম পাথেয় রূপে চিহ্নিত। তবে আর্যভট্ট, বরাহমিহির এবং ব্রহ্মগুপ্তের আলোচনায় এ'রূপ জ্যোতিষচর্চা আরও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এছাড়া ব্যাবিলনীয় ও গ্রীক জ্যোতির্বিদদের মতামতের বিনিময়েও ভারতের প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ চর্চা পরিপূর্ণতা পায় যা অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

ধাতব শিল্পের উৎকর্ষতা ঃ

লৌহ ও ব্রোঞ্জ প্রযুক্তিতেও গুপ্তযুগের কারিগররা দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত ব্রোঞ্জের বুদ্ধ মূর্তিগুলো তৎকালীন সময়ে ধাতব শিল্পের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। লৌহ প্রযুক্তিতে জ্ঞানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। মেহেরউলিতে আবিষ্কৃত লৌহস্তম্ভ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসেও দেখা যায় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে নির্মিত লৌহস্তম্ভটির গায়ে একটুকুও জং ধরেনি। নিঃসন্দেহে এটি গুপ্ত কারিগরদের অসাধারণ কৃতিত্ব।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যজয়কে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে নির্মিত লৌহ স্তম্ভের উৎকর্ষতা আজ বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু রূপে পরিগণিত। স্তম্ভটির উচ্চতা ২৪ ফুট, ব্যাস নীচে ১৬৪ ইঞ্চি এবং উপরে ১২ ইঞ্চি, ওজন ৬ টনের বেশী। চন্দ্রগুপ্তের নির্দেশে ইহা মথুরার বিষ্ণুপদ পাহাড়ে স্থাপিত হয়েছিল। ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গপাল ইহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। M.S. Krishna রচিত Iron ores of India. (Indian Association for cultivation of Science, Calcutta) বই থেকে দেখা যায় হ্যাডফিল্ড নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে তথ্যগুলো পেয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

স্তম্ভে ব্যবহৃত লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৮১ (বিশুদ্ধ লোহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৭.৮৫) ইহার সহিত মিশ্রিত পদার্থগুলো হল ঃ

কাবণ	=	শতকরা	০.০৮০	লৌহ	শতকবা ৯৯.৭২০
সিলিকন	=	"	০.০৪৬	নাইট্রোজেন	শতকবা ০.০৩২
ফসফরাস	=	"	০.১১৪	ম্যাঙ্গানিজ	————
গন্ধক	=	"	০.০০৬	তামা	শতকরা ০.০৩৪

স্তম্ভে লৌহের সাথে ব্যবহৃত গন্ধকের স্বল্পতা, ম্যাঙ্গানিজের অনুপস্থিতি, ফসফরাসের আধিক্য প্রভৃতি স্তম্ভটিকে আজও মরিচাহীন রাখছে বলেই আধুনিক সময়ের বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে ৮০ পাউণ্ড কি অনুরূপ ওজনের ছোট ছোট লোহার তাল পৃথক পৃথকভাবে ঢালাই করে এমনভাবে জোড়া দেওয়া হয়েছে যে স্তম্ভটি দেখলে সমগ্র স্তম্ভটি একটি অখণ্ড স্তম্ভ বলে মনে হয়।

পরিশেষে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় প্রাচীনকালে ভারতীয়রা ধাতববিশারদ ও রসায়নবিদ হিসাবে যথেষ্ট পারদর্শিতার প্রমাণ রেখেছেন।

কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এ সমৃদ্ধ ধাতব প্রযুক্তি গুপ্ত পরবর্তী যুগে ধরে রাখা যায়নি। বুদ্ধমূর্তি ব্যতীত পাথর কেটে মূর্তি বসানো স্তূপ বা বেদী তৈরীতেও গুপ্ত শিল্প কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি ব্যতীত বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য হিন্দু দেবতাদের ব্রোঞ্জ মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। বহু জায়গায় সর্বদেবতার মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বিষ্ণু, শিব এরূপ কোন এক দেবতাকে প্রধান দেবতা ধরে তার চার পাশে কম গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের বসানো হত। মূলতঃ

দেবতাদের এরূপ বিন্যাস ছিল তৎকালীন সময়ের সামাজিক স্তর বিন্যাস বা শ্রেণী ভেদের প্রতীক।

স্থাপত্য শিল্প ও সাহিত্য চর্চা ঃ

ভারতীয় শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের এক অতিসুন্দর অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায় গুপ্তযুগের স্থাপত্য নিদর্শনে। ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাকে আশ্রয় করে গুপ্তযুগের শিল্পীগণ পাথরে হিন্দু ও বুদ্ধ সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই তাঁদের শিল্প কুশলতার পরিচয় রেখেছেন। সাসারামে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের শিল্পকলা নিপুণতার দিক থেকে যথেষ্ট উৎকর্ষতার দাবী রাখে।

অজন্তার চিত্রকলা এ'যুগের সর্বোত্তম নিদর্শন। পাহাড় কেটে গুহামন্দির নির্মাণ সুনিপুণ শিল্প কৌশলের পরিচায়ক। এ'গুহা চিত্রগুলোর মধ্যে "মাতা ও পুত্র (যশোধরা ও রাহুল), রাজকুমারীর মৃত্যু, চীনা ভিক্ষু সমভিব্যবহারেহ বৌদ্ধ সভা" প্রভৃতি বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

ধাতুশিল্পের ও গুপ্তযুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। দিল্লীর নিকট চন্দ্রগুপ্তের লৌহ স্তম্ভ ও উহার কারুকার্য আজও দর্শকদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। লৌহ স্তম্ভটির বিশেষত্ব হল এতে জং না ধরার কৌশল আবিষ্কার। অজন্তার চিত্রকলা এ যুগের সর্বোত্তম নিদর্শন। অজন্তার শিল্পকর্মের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল রঙের ব্যবহার, যা আজও বিন্দুমাত্র মলিন হয়নি।

এ থেকে প্রমাণিত বং তৈরীতেও সে সময় কারিগরগণ যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় রেখে ছিলেন, যেমনটা হয়েছিল লৌহস্তম্ভে জং না ধরার রাসায়নিক কৌশল আবিষ্কার।

গুপ্ত যুগে সাহিত্যেও যথেষ্ট উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' পৃথিবীর অন্যতম সাহিত্য সৃষ্টি। গুপ্তযুগেই রামায়ণ ও মহাভারত সংকলিত হয়েছিল। পাণিনি ও পতঞ্জলি নির্ভর সংস্কৃত ব্যাকরণও গুপ্তযুগেই রচিত হয়েছে। অমরসিংহ রচিত "অমর কোষ' এ'যুগের আর একটি অন্যতম কীর্তি। গুপ্তযুগে এভাবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি বিজ্ঞানচর্চায়ও লিপিবদ্ধকরণের পথ সুগম হয়েছিল।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট গুপ্ত যুগের রাজারা জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ করে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যায় ও উৎকর্ষ লৌহশিল্প বিকাশে ভারতের মর্যাদা পৃথিবীর সর্বত্র বিকশিত করতে পেরেছিলেন। শিল্প সংস্কৃতি বিকাশেও তারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত যেমন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় সমকালীন পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন অনুরূপভাবে বলা যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় উদ্ভাবিত মরিচাবিহীন লৌহের ব্যবহারের রাসায়নিক তাৎপর্য আজও রসায়নবিদ ও ধাতু বিশারদদের গবেষণার পথ উন্মুক্ত করছে। আবার কালিদাস, পাণিনি, অমরসিংহ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের রচনাও গুপ্তযুগকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে সকল দিক বিচার করে বলা যায় যে গুপ্তযুগে উত্তর ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় নবজাগরণ এসেছিল। ঐতিহাসিকদের মতে গুপ্তযুগ ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের যুগের সাথে তুলনীয়।

(ঘ) প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোর আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রাচীনকাল থেকেই এক সুনিয়ন্ত্রিত ও সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মূলতঃ পরবর্তী বৈদিক যুগকেই শৃঙ্খলিত জ্ঞানচর্চার ভোরের সূর্যরূপে চিহ্নিত করা যায়। সে সময়ে লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তথাপি ঋষিরা নিজে নিজে জ্ঞান চর্চা করতেন এবং মুখে মুখে শিষ্যদের (ছাত্র) জ্ঞান বিতরণ করতেন। তাই এ পদ্ধতিটি শ্রুতি নামে আজও আমাদের মধ্যে পরিচিত হয়ে আছে। আস্তে আস্তে এ ব্যবস্থাপনাটাই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। পণ্ডিতগণ নিজ নিজ আশ্রম তৈরী করে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করতেন। কপিল নামে জনৈক মুণি ঐ ব্যবস্থাপনার পথিকৃৎ রূপে দর্শনে উল্লেখ আছে। শ্রুতি পদ্ধতিতে উনার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফলশ্রুতি রূপে যে বৈদিক দর্শনের সৃষ্টি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে ইহাই আদি দর্শন রূপে পরিচিত। নাম ঋকবেদ।

সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মজবুত হতে লাগল। রাজ মহারাজগণ ভূমিদান ও অন্যবিধ উপায়ে পণ্ডিতদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে লাগলেন। ফলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নতুন যাত্রা শুরু হতে লাগল। তবে এ ব্যবস্থাপনার বিদ্যাদান ছিল পণ্ডিতদের ধর্মাচরণের একটি প্রধান অঙ্গ। ফলে তৎকালীন সময়ে একাধিক আশ্রম মিলে কোন বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল। তাই দেখা যায় তক্ষশিলা ও কাশীতে সহস্র ব্রাহ্মণের সহস্র ক্ষুদ্র বিদ্যালয় বা আশ্রম। ব্রাহ্মণ্যবাদের বাড়বাড়ন্তে এবং পণ্ডিতদের ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার ফলে এ ধরনের আশ্রমে ধর্মশাস্ত্র এবং ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয় বিষয় এবং ধনুর্বিদ্যা ব্যতীত অন্য বিষয়ে কোন চর্চা একেবারে বাদ হয়েই গিয়েছিল। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে বুদ্ধ ধর্ম প্রসারের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদে কঠোরতম আঘাত আসতে থাকে এবং বিজ্ঞান চর্চার নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব ঘটে। বৌদ্ধ আমলেই ভারতে প্রথম সঙঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের মাধমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রথম দিকে বুদ্ধ বিহারগুলোতেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনা হত। মূলতঃ অশোকের সময় থেকেই এরূপ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে এ বিহার বা সংঘগুলো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিক্ষা নিকেতনে পর্যাবসিত হয়। প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে এগুলো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তক্ষশিলা, নালন্দা, বলভি প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলতঃ এক একটি বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ যুগে এরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও স্থাপন প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

বৌদ্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু শিক্ষাব্রতী রাজন্যবর্গ ও মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে তৎপর হয়ে উঠেন। এব্যাপারে 'অগ্রহার গ্রামগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এব্যবস্থাপনায় হিন্দুরাজারা বিদ্যাচর্চার জন্য গ্রাম দান করতেন এবং গ্রামগুলো নিষ্কর ছিল। এরাই ইতিহাসে 'অগ্রহার' নামে পরিচিত। তবে 'অগ্রহার' গ্রামে মন্দিরকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনে দক্ষিণ ভারতই বিশেষ কৃতিত্বেই পরিচয় দিয়েছে। তাদের মধ্যে সালোৎসি, এন্নরিয়ম, তিরুমুক্কুদল প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরগুলোকে ঘিরে সুশৃঙ্খলিত ও উন্নত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

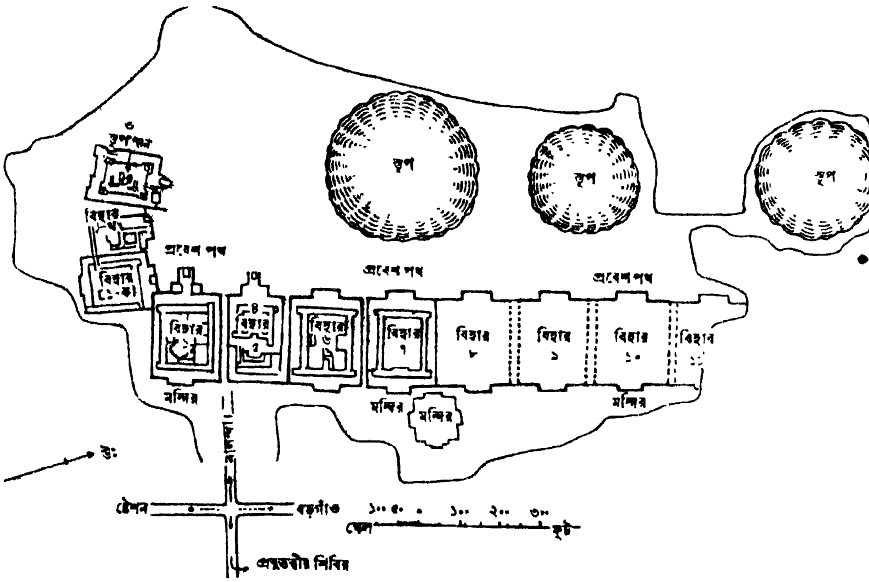
এখন আমরা প্রাচীন ভারতের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করব। এদের মধ্যে তক্ষশিলা, নালন্দা, বলভি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তক্ষশিলা ঃ গান্ধার প্রদেশের রাজধানী, জনপদের প্রাচীনত্ব ও সুশৃঙ্খলিত শিক্ষাকেন্দ্র রূপে "তক্ষশিলা" ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে তক্ষশিলা পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহা ভারত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কাশী, মিথিলা, উজ্জয়িনী, রাজগৃহ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান থেকে শিক্ষানুরাগী এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন। "ধনুর্বিদ্যা" ও "চিকিৎসা শাস্ত্রে" অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় তক্ষশিলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। একশ জন যুবরাজ ও রাজপুরুষ এক সঙ্গে ধনুর্বিদ্যার অধ্যয়ন করতে পারতেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। খ্যাতনামা আর্য়ুবেদ চিকিৎসক আত্রেয় এখানে চিকিৎসা শাস্ত্রে অধ্যাপনা করতেন। জীবক, কোমারভচ্চও এ'প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র এবং পরবর্তীকালে সুচিকিৎসক রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। শিক্ষকদের যোগ্যতা অনুযায়ী ২০ থেকে ৩০ জন ছাত্র এক একজন শিক্ষকের কাছে অধ্যয়ন করতেন। শতাধিক ছাত্রের শিক্ষকের কথাও অনেক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। ছাত্র সংখ্যার উল্লেখ থেকে তক্ষশিলাকে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিগণিত করতে চাইছেন। কুষাণ শাসনের শেষভাগ পর্যন্ত (আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) শিক্ষাজগতে তক্ষশিলার তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে তক্ষশিলার পরিদর্শনে এসে ইহার প্রাচীন গৌরব ও প্রাধান্যের অবলুপ্তিই দেখতে পান।

নালন্দা ঃ নালন্দাকে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে ভারতের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিহারের রাজগীরের সাত মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামক এক গ্রামে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থপতি শক্রাদিত্য (৪১৪-৫৪) "আদি বিহার" নামে যে বিরাট বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তাকেই ভিত্তি করে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। শক্রাদিত্যের পর তথাগত গুপ্ত, বালাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত ও বজ্র প্রত্যেকে আদি বিহার সংলগ্ন আরও কতগুলো বিহার নির্মাণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন সম্পূর্ণ হয়। ক্রমান্বয়ে ইহা একটি বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে পারে।

এখানকার অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য, শিক্ষা ব্যবস্থার সুনাম, অতুলনীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি এশিয়া মহাদেশের সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণের সাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও গবেষণার সাজুয্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। খননের পর প্রাপ্ত কয়েকটি কলেজ, কয়েকটি সুবৃহৎ আগার, গ্রন্থাগার, মানমন্দির, শ্রমণ, অধ্যাপক ও ছাত্রদের আবাসসহ বিচিত্র সৌধশালা হিউয়েন সাং-এর বিবরণের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিচ্ছে। তাছাড়া তিনটি নবতল বিশিষ্ট বিরাট বিরাট অট্টালিকায় হিউয়েন সাং-এর বিবরণ অনুযায়ী তিনটি গ্রন্থাগারের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র, সমাজ গুহ্য ও বহুবিধ মূল্যবান গ্রন্থ 'রত্নোদধি' নামক গ্রন্থাগারে রক্ষিত থাকত। ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থের জন্য 'রত্নসাগর' ও 'রত্নরঞ্জক' নামক দুইটি গ্রন্থাগার ছিল। নালন্দায় অবস্থিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গগণস্পর্শী উচ্চতা দর্শক ও পর্যটকদের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। হুইলির রচনা ও যশোবর্মণ তৈরী শিলালিপিতে দেখা যায় নালন্দা বিহারের চূড়া মেঘলোক স্পর্শ করত। বৌদ্ধ দর্শন বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের আলোচনা ও চর্চার

জন্য নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষত্ব হলেও এখানে বেদ, ব্রাহ্মণ, সাহিত্য, হেতুবিদ্যা, ব্যাকরণ, সাংখ্যদর্শন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান ও আলোচনা হত। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে এখানে আসতেন তদ্রূপ এশিয়ার অন্যান্য দেশ বিশেষ করে তিব্বত ও চীন থেকেও বহু ছাত্র এখানে অধ্যয়ন করতে আসতেন। বিদেশী কৃতী ছাত্র ও বিদ্যানুরাগীদের মধ্যে ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং, ইৎসিং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এখানের পঠনপাঠন এতবেশী জ্ঞানগর্ভ ছিল যে সকল উৎসাহী ছাত্রের পক্ষেই প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই এখানে অধ্যয়ন করা যেত। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরাও তদ্রূপ জ্ঞানীগুণী ছিলেন। অধ্যক্ষদের মধ্যে ধর্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরপতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও শীলভদ্র বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত রূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।



বলভি ঃ পূর্ব ভারতের গুপ্ত সম্রাটদের ন্যায় পশ্চিম ভারতে মৈত্রক নৃপতিগণও (৪৭৫-৭৭৫) জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় সুযোগ সম্প্রসারণে জমি, অর্থ প্রভৃতি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় মৈত্রক রাজ্যের রাজধানী বলভি নামক স্থানে বেশ কয়েকটি বড় বড় বিহার সম্বলিত নালন্দার ন্যায় একটি বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। এখানকার শতাধিক সঙ্ঘরামে প্রায় ছয় সহস্র শ্রমণ ও বিদ্যার্থী অবস্থানকরতেন। মূলতঃ হীনযান বৌদ্ধ দর্শনের চর্চাও ব্যাখ্যার কেন্দ্র রূপে বলভি গড়ে উঠলেও ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয় অধীত হত বলে হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বিবরণে উল্লেখ আছে। পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের দুই প্রান্তে অবস্থিত 'নালন্দা ও 'বলভি' বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎকর্ষতার শীর্ষে

উঠেছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন। এমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বৌদ্ধবিহার ও দেবতার মন্দিরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। আর সম্রাট অশোক ছিলেন ভারতে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রদূত। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে "অশোকের সময়ই সমগ্র ভারতে ৮৪,০০০ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সক্রিয় ছিল।" তবে এখানে বিদ্যালয় বলতে সেসব বুদ্ধবিহারের কথা বলা হয়েছে যেখানে ধর্মাচরণের সাথে সাথে বিদ্যাভ্যাসও করা হত।

ললিত বিস্তার, কাদম্বরী ও রামচন্দ্রের টীকা থেকে নালন্দা ও বলভি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। ললিত বিস্তারে উল্লিখিত পাঠ্য বিষয়গুলোর কিছু বিবরণ নীচে দেওয়া হল ঃ

"গণনা, সংখ্যা, বেদ (কাদম্বরী মতে ধর্মশাস্ত্র), ইতিহাস, পুরাণ, নিঘন্টু, নিরুক্ত, নিগম, শিক্ষা, ছন্দ, জ্যোতিষ ব্যাকরণ, যজ্ঞকল্প, সাংখ্য, যোগ বৈশেষিক, বার্হস্পত্য (বৃহস্পতি চার্বাকের অথবা লোকায়ত দর্শন), হেতুবিদ্যা, অর্থবিদ্যা, কাব্য গ্রন্থ রচিতম্, আখ্যাতম (গল্প বলার বিদ্যা), হাস্যম (কৌতুক রস বিতরণ বিদ্যা)। এছাড়ানগর পরিকল্পনা, বাস্তুনিবেশ, নগর মানম, বস্ত্ররাগ (কাপড় রং করা), মণিরাগ, রসবাদ (পারদ সংক্রান্ত বিদ্যা), গন্ধবাদ (গন্ধ সংক্রান্ত বিদ্যা) ও ধাতুবাদ (ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা)" প্রভৃতি বিষয়গুলো পড়ানো হত। ললিত বিস্তারের বিষয়বস্তু, অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্য আর ছাত্রের মেধা, অধ্যয়ন সংক্রান্ত আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রভৃতি থেকে এটা অবশ্যই অনুমেয় যে বিশ্ববিদ্যালয় দুটি সত্যই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে আছে।

কারিগরি বিদ্যার প্রসার ঃ

সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নতির সাথে সাথে কৃষি সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। লৌহ আবিষ্কারে পর কৃষি সংশ্লিষ্ট লৌহ সম্বন্ধীয় কারিগরি বিদ্যার উৎকর্ষতার সাথে সংগতি রেখে তৎকালীন সময়ে নৌ-বিদ্যা, কৃৎশিল্প, ধাতু নিষ্কাষণ প্রভৃতি প্রযুক্তিতেও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এ সম্পর্কীয় প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রের অপ্রতুলতা বা আশানুরূপ তথ্যের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। সাধারণত বেদ, ব্যাকরণ সংখ্যা, যোগ জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাশাস্ত্র সম্পর্কীয় বিষয়গুলোই বৌদ্ধবিহার বা মন্দিরভিত্তিক বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হত। কারিগরি বিদ্যা অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার যথেষ্ট সুযোগ ছিল না। ফলে কারিগরি বিদ্যার কোন তত্ত্ব বা ব্যবহারিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ হয়নি।

তৎকালীন সময়ে মূলতঃ কারিগরি বিদ্যা অভিজ্ঞতা ভিত্তিক চর্চা হত। শিক্ষানবিশকে অভিজ্ঞ কারিগরের তত্ত্বাবধানে নির্দিষ্ট বিদ্যা হাতেকলমে শেখার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হত। শিক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষানবিশ উপযুক্ত গুরুদক্ষিণার পর স্বাধীনভাবে অধীত বিদ্যার দ্বারা জীবিকা অর্জনের সুযোগ পেত। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে শিক্ষানবিশ গুরুগৃহ ত্যাগ করলে তার শাস্তি হত। তবে গুরুদেরও কিছু নিয়মনীতি মেনে চলতে হত। ছাত্রের জন্য গুরুকে উপযুক্ত বাসস্থান, আহার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হত। গুরু শিক্ষানবিশকে কখনও মজুর হিসাবে খাটাতেন না। এমনিভাবে প্রাচীন ভারতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কারিগরি বিদ্যার চর্চা চলে আসছিল।

ভাগবৎ পুরাণ, মহাকাব্য, দশকুমার চরিতম, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য থেকে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৪টি শিল্পকলার বিস্তৃতি ঘটেছিল। প্রায় প্রতিটি শিল্পকলাকে কেন্দ্র করে এক একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল। তবে ললিত বিস্তার, জাতকমালা প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে এ সংখ্যাটি ৭২ বা ৮৬ বলে উল্লেখ আছে। সংখ্যা যাহাই হউক তৎকালীন সময়ে প্রয়োজনের তাগিদে অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বিকশিত অতিপ্রয়োজনীয় শিল্পের নাম নীচে লিপিবদ্ধ হল।

"১) বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ	২) ধাতু নিষ্কাশন
৩) ধাতু ও ভেষজ সংযুক্তিকরণ	৪) ক্ষার নিষ্কাশন
৫) ধাতু যৌগ প্রস্তুতিকরণ	৬) পুকুর ও কূপ খনন
৭) জমি সমতলকরণ	৮) উপকরণ ক্রিয়া যন্ত্রবিদ্যা
৯) নৌ ও রথযান তৈরীকরণ	১০) রত্ন সংক্রান্ত বিদ্যা
১১) কৃত্রিম স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রস্তুতকরণ	১২) কাচ শিল্প
১৩) জলসেচ বিদ্যা	১৪) লৌহ অস্ত্রাদি নির্মাণ।"

উপরের বিষয়গুলো আলোচনায় দেখা যায় এ'সব বিষয়ে চর্চার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক 'জ্ঞান চর্চার' প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোন তত্ত্ব লিপিবদ্ধ না হলেও পরবর্তী সময়ে এসব শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তা থেকেই তত্ত্বগতভাবে কারিগরি ও ভৌতবিদ্যা সমৃদ্ধি লাভ করেছে এবং বর্তমানে বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি শাখার উদ্ভব ঘটেছে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, এরূপ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক কারিগরি বিদ্যা ও শিল্পোন্নতির ব্যাপারে তৎকালীন সময়ের শাসন কর্তারা যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করতেন। রাজারা তাদের প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি সম্পন্ন শিল্প কারখানা স্থাপন করতেন। এবং সেখানে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারিগরদের নিযুক্ত করতেন। কারখানাগুলো পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রধান বা অধ্যক্ষ থাকত। যেমন টাকশালের অধ্যক্ষের নাম ছিল কোষাধ্যক্ষ, বস্ত্রশিল্পের অধ্যক্ষের নাম সূত্রাধ্যক্ষ, ধাতু শিল্পের অধ্যক্ষের নাম লৌহাধ্যক্ষ, কৃষিবিদ্যার অধ্যক্ষের নাম সীতাধ্যক্ষ ইত্যাদি। তবে অর্থশাস্ত্রের সময় থেকে ভারতে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির যে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল তা পরবর্তী সময়েও অধিক বিকশিত হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু অর্থশাস্ত্রের ন্যায় অনুরূপ কোন তথ্যের অভাবে অর্থশাস্ত্রের পরবর্তী প্রাচীন ভারতের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিদ্যা সমৃদ্ধ উৎকর্ষ অর্থনীতি সম্বন্ধে আমাদের জানার সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের উপর ভিত্তি করেই আমাদের প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানচর্চা সম্বন্ধে অবহিত হতে হচ্ছে। তাই বলা যায় আপনাদের আর্যরক্তের অহমিকা অনেকটাই সারশূন্য। বিরাট ঘাটতি ঘটে গেল ঐতিহাসিক দলিল রচনা ও সংরক্ষণের ব্যবহারে। এমনকি কৌটিল্যে পরবর্তী সময়ে ইউরোপের এগ্রিকোলার বা বিরিংগুচ্চিয়ের মত কোন লেখকের আবির্ভাব ঘটলে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাস অন্যরকমও হতে পারত।

(ঙ) পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে সভ্যতার বিস্তার

গুপ্তযুগে সমগ্র উত্তর ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও পূর্ব ভারত বা সুদূর দাক্ষিণাত্যে সভ্যতার অগ্রগতি সম্পর্কে আপনাদের ঐতিহাসিক বন্ধুরা আশানুরূপ তথ্য আজও আবিষ্কার করতে পারেননি। তাই আমি এ'অধ্যায়ে ভারতের এ দুটি অঞ্চলের উন্নয়নের সাক্ষী দিচ্ছি।

আগেই বলেছি ৪র্থ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের আগে পর্যন্ত পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ ও আসাম সম্পর্কে কোন লিখিত উপাদান পাওয়া যায়নি। তবু এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, এসব অঞ্চলে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের বিভিন্ন শিলালিপি থেকে বোঝা যায় ৪র্থ ও ৭ম খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এখানে উন্নত গ্রামীণ অর্থনীতি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সামাজিক শ্রেণী কাঠামো গড়ে উঠেছিল।

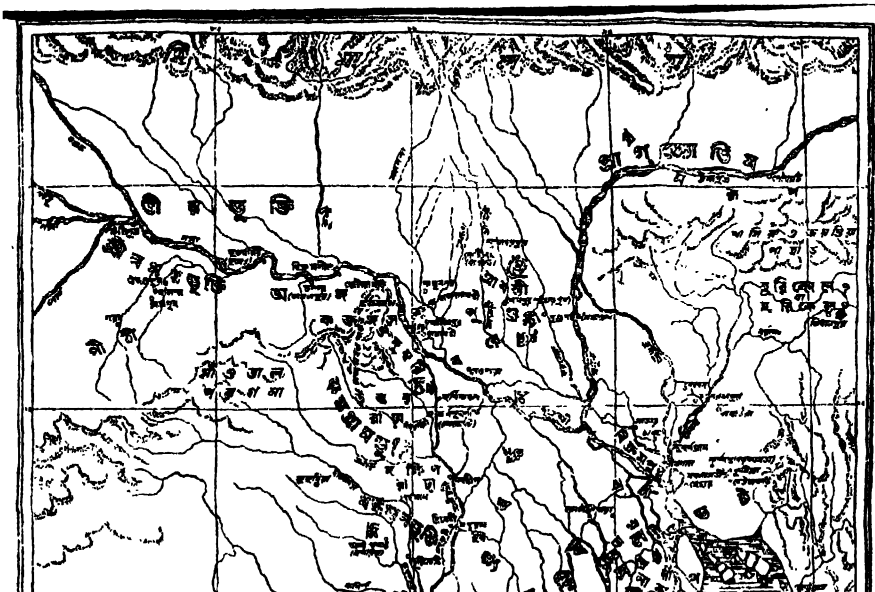
কৃষ্ণা, মহানদী, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদী ও অসংখ্য খাল বিল ও অনুকূল আবহাওয়া সম্বলিত পূর্ব মধ্য প্রদেশ, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ ও আসামের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি ধান চাষে খুব সমৃদ্ধ ছিল। কালিদাসের কাব্যে বাংলায় ধানের রোয়া রোপণের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাছাড়া নদী জল প্লাবিত নদীতট আখচাষেও সমৃদ্ধ ছিল।

আর এ'উন্নত কৃষি ব্যবস্থাকে যোগান দিতে গড়ে উঠেছিল সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারিগর গোষ্ঠী। তাই সমাজে পেশাগতভাবে কর্মকার, কুমোর, কাঠমিস্ত্রি প্রমুখ কারিগর গোষ্ঠী গড়ে উঠে। উন্নত কৃষি পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত অর্থনীতি। এ'অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষিভিত্তিক ছিল বলে গ্রামাঞ্চলে জনবসতি দ্রুত সম্প্রসারণ হতে লাগলো। এসব অঞ্চলে ব্যবহৃত স্বর্ণমুদ্রা অঞ্চলের মজবুত অর্থনীতির পরিচায়ক।

তবে এ'উন্নত অর্থনীতি গড়ার পেছনে যে প্রয়োজনীয় কারিগরি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় তা এসব অঞ্চলেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। অপরদিকে সমসাময়িক গুপ্ত সাম্রাজ্যের সাথে এসব অঞ্চলের রাজন্যবর্গের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। উত্তর বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিম উড়িষ্যা গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ফলে গুপ্ত সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগে পূর্ব মধ্যপ্রদেশসহ ভারতের পূর্বাঞ্চলে জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটা ছিল স্বাভাবিক। এসব অঞ্চলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা, বৈদিক অনুশাসন বা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রসার লাভ করেছিল। তাই ফলিতবিজ্ঞানের মৌলিক চর্চায় ঘাটতি দেখা দেওয়া স্বাভাবিক হয়ে যায়। অপর দিকে মন্ত্রের প্রভাব, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আধিক্য দেখা যায়। একসময় বঙ্গদেশ সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হয়। বাংলার পলিমাটি সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, ছোটনাগপুরের মালভূমি, উড়িষ্যা ও পূর্ব মধ্যপ্রদেশের উর্বর ভূমি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি কৃষিকাজে অনুকূল এবং খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজা, সামন্তশ্রেণী ও বণিককূলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক। এহেন অবস্থায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসব অঞ্চলে দেরীতে হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারত আবার বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। পাঁচশ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে শ্বেত হূনদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে

থাকার সাথে সাথে অন্যান্য অঞ্চলে সামন্ত রাজারা প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। এমনকি একে অপরের রাজ্যগ্রাসেও তৎপর ছিলেন। এমনি এক সামন্ত রাজ্য হলেন হর্ষবর্দ্ধন। তাঁর শাসনকাল ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। হর্ষের সভাকবি 'বাণভট্টের' লেখা 'হর্ষচরিত' এবং চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর বিবরণে হর্ষের রাজত্বকাল এবং তৎকালীন উত্তর ভারতের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা সম্পর্কীয় নানা তথ্য পাওয়া যায়। বিবরণ দুটো ব্যক্তি হর্ষকে ভারতের শেষ মহান হিন্দু সম্রাট বলে অভিহিত করলেও তা ছিল মূলতঃ আংশিক সত্য। বর্তমান রাজস্থান, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এ চারটি অঞ্চলে এবং আর কিছু ছোট ছোট অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও দক্ষিণ ভারতে নর্মদা নদী তীরের চালুক্যরাজ পুলকেশীর হাতে তাঁর বিজয় প্রতিহত হয়। তাছাড়া কাশ্মীর ও তাঁর রাজ্যের বাহিরে ছিল। তবু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থেকে তিনি এক বিশাল ভারত প্রতিষ্ঠায় সামর্থ অর্জন করেছিলেন।



সভ্যতা বিকাশের দিক থেকে তৎকালীন সময়ে নালন্দা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কিছু বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা ভিন্ন তার কোন মৌলিক বিজ্ঞান চর্চার তথ্য পাওয়া যায় না। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র বিষয়ে অধ্যয়ন হত। দেশবিদেশের বহু জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানলাভে এখানে পড়তে আসতেন। হিউয়েন সাং ছিলেন তাদের একজন। তবে ফলিত বিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব বা তথ্যের কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও হর্ষবর্দ্ধনের সাহিত্য প্রীতির যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে। মূলতঃ ভেঙ্গে পড়া উত্তর ভারতকে একত্রিত রাখাই ছিল হর্ষবর্দ্ধনের মূল কীর্তি। সমগ্র উত্তর

ভারতে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সামর্থ অর্জন করেছিলেন। তবে গৌড়রাজ শশাঙ্ক প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্দ্ধনের চেষ্টা ব্যর্থ করে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন সামন্তরাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পূর্ব ভারতে গৌড়রাজ তথা বঙ্গদেশে শক্ত ভিত পত্তনে সমর্থ হয়েছিলেন।

৬০৬ অব্দে পূর্ব ভারতে গৌড় তথা বঙ্গদেশে শশাঙ্ক যে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা মূলতঃ ১২০২ সালে বখ্তিয়ার খিল্জী কর্তৃক নদীয়া আক্রমণের মধ্য দিয়ে গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা সূর্যের অস্তগমন শুরু হয়। যদিও এর বেশ কিছু দিন আগেই মুহাম্মদ ঘুরির নির্দেশে কুতুবউদ্দিন আইবেক দিল্লীতে সুলতানী বংশের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আর্য ভারতে ইসলাম শাসনের প্রায় স্থায়ী অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যে বেশ কিছুদিন অরাজকতা বিরাজ করতে থাকে। শেষ অবধি গোপাল নামে (৭৫০-৭৭০) পালবংশীয় এক রাজা গৌড় তথা বঙ্গদেশে সুষ্ঠু প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করেন এবং কেশবদেব নামক দেববংশীয় রাজার শাহ্জালাল কর্তৃক পরাজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন বঙ্গের পতন ঘটে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

কৃষি ঃ পূর্ববর্তী পরিচ্ছদে আমরা দেখছি বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুই এ অঞ্চলটিকে সুজলা সুফলা কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। তাই কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিই হল গৌড় তথা বঙ্গদেশের উন্নতির সোপান।

এখনকার ন্যায় তখনও ধানই ছিল প্রধান খাদ্য। চাষ প্রণালীও অনেকটা বর্তমানেরই সামিল। রোয়া ও বোনা উভয় পদ্ধতিতেই চাষ হত। তবে বর্তমানের ন্যায় উন্নত যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন সুযোগ না থাকায় গরু টানা লাঙ্গল বা কোদালের সাহায্যে সমস্ত চাষবাস করা হত। দ্বিতীয় প্রধান ফসল ইক্ষু। পর্যাপ্ত ইক্ষু থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় উৎপন্ন হত। অনেকের মতে 'গুড়' শব্দ থেকেই গৌড় নামের উৎপত্তি। সে যাই হউক ধান, ইক্ষু ব্যতীত তুলা, সরিষাও এখানে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হত। আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু প্রভৃতি ফলে সমৃদ্ধ ছিল বঙ্গভূমি। পানের বরজও ছিল অনেক।

তবে জমিতে চাষীর স্বত্ত্ব সম্পর্কে কোন সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। মনে করা হচ্ছে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এখানেও জমি ভোগের শর্ত হিসাবে রাজাকে নির্দিষ্ট পরিমাণে কর দিতে হত। তবে রাজারা ব্রাহ্মণদের বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিষ্কর ভূমি দান করতেন। এ সকল জমিগুলো গ্রহীতারা বংশানুক্রমে নিষ্করভাবেই ভোগ করত।

শিল্প ঃ পূর্বে বলা হয়েছে বঙ্গদেশের উন্নত কৃষি অর্থনীতি সহায়ক হিসাবে সমাজে তন্তুবায়, কামার, কুমোর, কাঠমিস্ত্রি প্রমুখ কারিগর গোষ্ঠী গড়ে উঠে। তাদের মধ্যে তন্তুবায়দের কথা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকুল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক নামক চার শ্রেণীর বস্ত্রের উল্লেখ আছে।

শনের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড় বা ক্ষৌম কাশী ও উত্তরবঙ্গে নির্মিত হত। দুকুল হল মিহি

সূতার তৈরী কাপড়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী "বঙ্গদেশীয় দুকূল শ্বেত ও স্নিগ্ধ, পুণ্ড্রদেশীয় শ্যাম ও মনির ন্যায় স্নিগ্ধ"। মগধ ও উত্তরবঙ্গে রেশমের ন্যায় একপ্রকার কীটের লালায় তৈরী বস্ত্র পত্রোর্ণ নামে পরিচিত। এছাড়া কার্পাস তুলার তৈরী সূতা থেকে যে বস্ত্র তৈরী হত তা কার্পাসিক নামে পরিচিত। এ'সকল মিহিবস্ত্রের মধ্যে 'মস্‌লিন বস্ত্র' উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগৎ বিখ্যাত

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির থেকে এটা অনুমেয় যে সে সময়ে বঙ্গদেশ মৃৎশিল্পে যথেষ্ট উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল। প্রস্তর ও ধাতুশিল্পেও যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেছিল। তাছাড়া স্বর্ণলঙ্কার তৈরীতেও কারিগররা নৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছে।

উন্নত কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করে কারিগররা বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী উৎপাদনে মৌলিকত্বের প্রমাণ না রাখতে পারলেও প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। যার ফলে গ্রামেগঞ্জে বহু শিল্প কারখানা গড়ে উঠে। এবং বিভিন্ন কারুশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের মধ্যে সংঘবদ্ধ জীবনের কিছু কিছু পরিচয়ও পাওয়া যায়। বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বারেন্দ্র শিল্পী গোষ্ঠী চূড়ামণি নামে এক শিল্প গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। কালক্রমে 'শিল্প গোষ্ঠী' এত ব্যাপকতা লাভ করে এ'সকল শিল্প গোষ্ঠী ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এ'ঘটনাকে সাম্প্রদায়িকতার আঁতুর ঘর বলে অভিহিত করলেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মুদ্রা ঃ খৃষ্টপূর্ব (৪র্থ-৫ম) অব্দ থেকেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাংলায় মুদ্রার প্রচলন হয় বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। কারণ ভারতেব সর্বপ্রাচীন ছাপকাটা মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া গেছে। তাছাড়া কুষাণযুগের অল্প কয়েকটি মুদ্রা প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলায় মুদ্রা প্রচলনের কাল সম্পর্কে অনুমান করা যায়। প্রাচীন লিপিতে দীনার ও রূপক নামক দুই প্রকার মুদ্রার কথা জানা যায়। স্বর্ণমুদ্রা দীনার নামে এবং রৌপ্য মুদ্রা রূপক নামে পরিচিত ছিল। ১৬টি রূপক এক দীনারের সমান ছিল।

গুপ্তযুগের অবসানের পর বাংলার রাজারা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। তবে এ'মুদ্রাগুলো ছিল অতি নিকৃষ্টমানের এবং এতে খাদের পরিমাণ বেশী ছিল। একদিকে একটি বৃষ ও অপরদিকে তিনটি মাছ খচিত পাহাড়পুড়ে প্রাপ্ত তিনটি তাম্র মুদ্রা পালযুগের প্রথমদিকের মুদ্রা বলে কেহ কেহ মনে করেন। এছাড়া 'শ্রীবিগ্র' নামে কতকগুলো তামা ও রূপার মুদ্রা এবং বিগ্রহ দ্রুন্ম নামে মুদ্রা ব্যতীত পাল যুগে ব্যবহৃত কোন উল্লেখযোগ্য মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। অপ্রতুল মুদ্রা আবিষ্কার পাল যুগের রাজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জটিলতাই সৃষ্টি করে। 'পুরাণ' ও 'কপর্দকপুরাণ' নামক মুদ্রার কোন সন্ধান মেলেনি। অনেকের মতে পুরাণ ও কপর্দক পুরাণ নামে দুই প্রকার মুদ্রার কথা সেন যুগের লিপিতে উল্লেখ আছে। মীনহাজুদ্দিন লক্ষ্মণ সেনের দানশীলতার কথা বলতে গিয়ে কৌড়ির উল্লেখ করেছেন। ইহা থেকে কেহ কেহ অনুমান করেন কৌড়ি হয়ত কড়ির আকারে নির্মিত এক প্রকার মুদ্রা। তবে আজ অবধি এ'রূপ কড়ির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অপর দিকে 'পুরাণ' বা 'কপর্দক পুরাণ' নামক মুদ্রারও কোন সন্ধান মেলেনি। অনেকের মতে 'পুরাণ' ও 'কপর্দক পুরাণ' হল নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়ি বুঝানোর সজ্ঞা।

সে যাই হউক পাল ও সেন যুগে ব্যবহৃত মুদ্রার অপ্রতুলতা কৃষি নির্ভর উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থার একটা দুর্বলতা। এ'দুর্বলতার কারণের পেছনে আজও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়নি। তদুপরি মুদ্রাগুলো বাংলায়ও তৈরী হত না ভারতের অন্য কোন রাজ্যে তৈরী হত অর্থাৎ বাংলায় টাকশাল ছিল কিনা বা মুদ্রা বানানোর দক্ষ কারিগর ছিল কিনা — এ'সম্পর্কে কোন সঠিক উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ব্যবসা বাণিজ্য ঃ উন্নত কৃষি অর্থনীতি বিকাশের সাথে সংগতি রেখে বাংলায় শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যেরও উন্নতি হতে থাকে। এ'কারণে বাংলার নানা স্থানে হাট, গঞ্জ ও নগর গড়ে উঠে। নদী ও সমুদ্র পথে পণ্য যাতায়াত হত বলে বিভিন্ন অনুকূল পরিবেশে নদী বা সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠে। তৎকালীন সময়ে স্থল পথেও পণ্য সরবরাহ হত। এ'সব কারণে প্রাচীন নগরগুলোও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। রমেশ চন্দ্র মজুমদার উল্লিখিত "হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিফ প্রমুখ কর্মচারীদের নাম থেকে বুঝা যায় যে শিল্প ও ব্যণিজ্য হতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইত।"

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা শুধু ভারতেই পণ্য সরবরাহ করত না। বহির্বাণিজ্যে বাংলাদেশ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। সমুদ্র পথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে ব্যবসা বাণিজ্য চলত। দুর্গম হিমালয় পথেও নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সাথে ব্যবসা চলত। সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা এবং নানা ধরনের গাছগাছরা বাংলাদেশ থেকে চালান করা হত। এভাবে আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যে বাংলা সমৃদ্ধি অর্জন করে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের উল্লেখ বাংলার উন্নত ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচায়ক। তাছাড়া পেরিপ্লাস, ঈশানবর্মার হরহ লিপি, চিধেন্যগুপ্তের ঘুনাইখর লিপি, কালিদাসের রঘুবংশ প্রভৃতিতে বাংলাদেশের নৌবল ও নৌবাণিজ্যের প্রশংসনীয় উল্লেখের দ্বারা আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের উৎকর্ষতার দাবী রাখে ।

পূর্ব ভারতে সভ্যতা বিকাশের সমসাময়িক অর্থাৎ প্রায় ৩০০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিন্ধ্য পর্বতমালার দক্ষিণাঞ্চলে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা হল। তামিলনাড়ুর উত্তরাংশ, দক্ষিণ কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল এবং গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রায় কুড়ি পঁচিশটি রাজ্যের পত্তন হল। তাদের মধ্যে কাঞ্চিতে পল্লভ রাজ্য, বাদানীতে চালুক্য রাজ্য এবং মাদুরাইয়ের প্রাণ্ড্য রাজ্য উল্লেখযোগ্য।

উপদ্বীপ অঞ্চলের এ দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছরের ঐতিহাসিক অধ্যায়ে শিল্প, স্থাপত্য, বাণিজ্য নগরায়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। তবে এ বিকাশ সাড়ে তিনশ বছর ব্যাপী একরকম ছিল না। প্রথম দিকে শিল্প, স্থাপত্য ও নগরায়নের বিকাশ ঘটলেও শেষের দিকে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি হেতু শহরের সম্প্রসারণের পরিবর্তে গ্রামের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। এটা অবশ্যই গুণগত পরিবর্তন।

প্রথম অধ্যায়ে অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে বুদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটলেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সারা উপদ্বীপ অঞ্চলে রাজাদের মধ্যে বৈদিক অনুশাসন ও বলিদান প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ফলে শিব বিষ্ণু প্রভৃতি বৈদিক দেবতার পূজার্চনা বৃদ্ধি পেল এবং প্রায় সর্বত্র দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এ' ঐতিহাসিক অধ্যায়ের শেষদিকে দক্ষিণ ভারত হয়ে দাঁড়াল মন্দিরের দেশ। আজও দক্ষিণ

ভারতের প্রায় সর্বত্র মন্দিরের আধিক্য বিরাজমান। অপরদিকে রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণদের করমুক্ত জমিদান প্রথা উজ্জীবিত হল। এ'সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা কেবলমাত্র পল্লব রাজাদের জমিদান সংক্রান্ত ১০৮টি সনদ আবিষ্কার করেছেন। ফলে গ্রামের সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটতে লাগল। করমুক্ত ভূমিদান প্রথার ফলে ব্রাহ্মণরা ও ক্রমশ বিত্তবান হয়ে উঠলেন। আবার সামন্তরাজারা তাদের সৈন্যবাহিনী রাজস্ব ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষি অর্থনীতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। ফলে কৃষকদের উপর রাজাদের চাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকল। মধ্যসত্বভোগী সামন্ত প্রভুরা কর আদায়ে বাড়াবাড়ি করত। কৃষকরা তাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হত। মূলতঃ মধ্যসত্বভোগীরা ছিল পরগাছার মত। বিনা পরিশ্রমে এরা কৃষকদের উৎপাদন ভোগ করত। তাদের এ আয়ের একটি অংশ রাজাকে দিত। একটি অংশ নিজেরা রেখে দিত। তা দিয়ে তারা অত্যাচারী বাহিনীও তৈরী করত। প্রয়োজনে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেও দ্বিধা করত না।

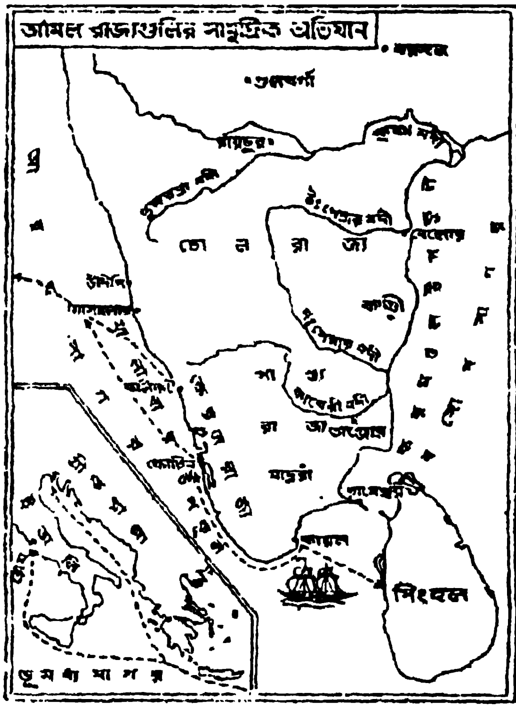
সামন্ত যুগে জমির মালিকানাই সমাজের মর্যাদার মাপকাঠি ছিল। ফলে সামন্ত প্রভুরা শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ছিল না। কারিগরদের অত্যন্ত অচ্ছ্যুৎ মনে করত। প্রয়োজনের তাগিদে তাদের দিয়েই অন্য ভোগ্য সামগ্রী তৈরী করত। ফলে সামন্ত যুগে গ্রামগুলোর অর্থনীতি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এটি বন্ধ্যা অর্থনীতি নামে পরিচিত। তবে সীমাবদ্ধ এলাকায়ও কৃষি অর্থনীতির তাগিদে কুটির শিল্প গড়ে উঠে। এরূপ সামন্ত প্রভু বা ব্রাহ্মণকূল দ্বারা রাজন্যবর্গ ব্যতীত সমস্ত কৃষক 'শূদ্র' রূপে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য ও বণিককূলও রয়ে গেল। এভাবে সমাজ মূলতঃ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, সামন্ত প্রভুদের অত্যাচারে সমাজের বৃহত্তর অংশ শোষিতে পরিণত হল। ফলে সমাজের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে পড়ল। ব্যক্তিগত উদ্যম, পরিশ্রম করে কিছু করার প্রয়াসও রাষ্ট্রের জন্য মমত্ববোধ লোপ পেতে লাগল। লোকে অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ে। সমাজের বৃহত্তর শ্রেণী উদ্যমহীন অদৃষ্টবাদী ও রাষ্ট্রের প্রতি মমত্বহীনে পরিণত হওয়ায় ভারতের রাজন্যবর্গ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে কোন শক্তিশালী শাসককুলের অভাবে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করা প্রায়শই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তৎকালীন গ্রামগুলোও তিনভাবে বিভক্ত ছিল। এদের নাম ছিল 'উর', 'সভা' এবং নগরম্। প্রথমটিতে সাধারণ কৃষকরা বাস করতেন। এরা সাধারণত মিলিতভাবে সাধারণ জমিতে চাষ করত এবং গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে রাজার কাছে উৎপাদিত শস্যের একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে পাঠাত। ভূমিদান প্রথার মধ্যে গড়ে উঠা গ্রামকে 'সভা' বলা হত। এখানে ব্রাহ্মণরা মিলিতভাবে কাজ করলে জমিতে নিজেদের অধিকার বহাল থাকত। "নগরম" গ্রামে বাস করত ব্যবসায়ী ও বণিককূল। মূলতঃ ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়ায় ব্যবসায়ীরা একসময় গ্রাম অভিমুখী হয়েছিল।

উপরে বর্ণিত গ্রাম ব্যবস্থাপনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। 'উর' হল যৌথ খামার ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। 'সভা' হল বর্তমান সমবায় ব্যবস্থাপনার নিদর্শন। প্রয়োজনের তাগিদেই এরূপ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে একটা উন্নত কৃষি অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল।

কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নের স্বার্থে লৌহজাত কৃষি যন্ত্রপাতির চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে 'নগরম' অঞ্চলে লৌহ কারিগর অর্থাৎ কর্মকারদের বসতি বিস্তার লাভ স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে

থাকল। তাদের চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কুটির শিল্পের প্রসার লাভ স্বাভাবিক হলেও এ'সম্পর্কে সঠিক তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি অস্বীকার করা যায় না। কৃষিভিত্তিক উন্নত অর্থনীতি মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এ'হেন অবস্থায় শিল্পের বিকাশ না ঘটলেও শিল্প সামগ্রীর বাজার বৃদ্ধি পাওয়াটাও অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক।



বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচিত হয়েছে। গুপ্তোত্তর যুগেও এ'বাণিজ্যিক সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ রাজ্য সমুদ্র উপকূলবর্তী হওয়ায় সমুদ্র পথে বহির্বাণিজ্যের অনুকূল হয়ে উঠে। "পেরিপ্লাস" নামক গ্রন্থে বাংলার ন্যায় দক্ষিণ ভারতেও অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র বা বন্দরের পরিচয় পাওয়া যায়। মুজিরিস, কারয়ল, কোরকাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গ্রীস ও রোমান গ্রন্থে চোল, চের ও পাণ্ড্য দেশগুলোর সমৃদ্ধ আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাবেরী পদিনম্ ছিল চোল রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য বন্দর। অপরদিকে করিরুল ছিল পাণ্ড্য রাজাদের শ্রেষ্ঠ বন্দর। দক্ষিণ ভারতীয় বণিকগণ এ'সকল বন্দর থেকে সওদাগরী জলযানে আরব সাগর অতিক্রমকরে আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি আরব রাজ্যে এবং মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করতে যেতেন। দক্ষিণ ভারতীয় বাণিজ্যপোত থেকে চীন ও জাপানেও বাণিজ্য চলত। তাছাড়া দাক্ষিণাত্যে বহু সংখ্যক রোমান মুদ্রার আবিষ্কারে এটা স্পষ্ট অনুমেয় যে রোম রাজ্যের সাথেও এ'সকল বাণিজ্যপোত থেকে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হত। তৎকালীন

সময়ে পাণ্ড্যদেশ থেকে রোম সম্রাট অগষ্টাসের সভায় দূত প্রেরণ বহির্বিশ্বের সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির অদান-প্রদানের একটা অন্যতম নজির।

জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ঃ হর্ষোত্তর যুগে গুর্জর প্রতিহারদের দ্বারা উত্তর ভারতে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে বিকাশের কাজ থমকে দাঁড়ায়। এ'অবস্থায়ও পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে সভ্যতার সূর্য ভোরের আলোর মত তার ছটা বিকশিত করে চলেছিল। তবে মৌলিক বিজ্ঞান বিকাশে কিছুটা ঘাটতি দেখা দিলেও প্রয়োজনের তাগিদে তাকে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, ঔষধি বিষয়ক রসায়ন বা প্রচলিত শিল্প প্রযুক্তি চর্চা অব্যাহত রাখতে হয়েছে। ফলে বিজ্ঞানের এ'শাখাগুলো অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন ও স্থাপত্য শিল্প উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। তার সাথে চলতে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রমও।

এ'সকল প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা তথা সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি চর্চার সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চাও অব্যাহত থাকে। নীচে বিষয় ভিত্তিক গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

বিদ্যাচর্চা ঃ এ' ঐতিহাসিক সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রাধান্যের ফলে বৈদিক অনুশাসন ও পূজার্চনার মাত্রা বেড়ে যায়। তাই স্বাভাবিকভাবে বৈদিক গ্রন্থের অনুশীলনের প্রয়োজনে সংস্কৃত চর্চার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত পণ্ডিতরা নিজস্ব বিদ্যালয় বা টোল খুলে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। তাতে সমাজে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে সৃজনশীল কবি সাহিত্যিক দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট রচিত 'হারলতা' পিতৃদায়িত --- গ্রন্থদুখানি হিন্দু ধর্মবলম্বীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও নিত্যকর্ম নিয়ে আলোচিত। বল্লালসেন নিজে 'ব্রতসাগর' 'আচার সাগর' 'প্রতিষ্ঠা সাগর, দান সাগর ও 'অদ্ভূত সাগর' নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষণ সেনের সভাসদ্ ও সূহৃদ বট্‌দাসের পুত্র শ্রীধরদাসের ১২০৬ সালে 'সহৃদ কর্ণাসৃত' নামে সংস্কৃত কবিতার সংকলনটি একটি মনোজ্ঞ কবিতা সংকলন। পুরুষোত্তম রচিত ভাষাবৃত্তি ত্রিকাণ্ডশেষ, হারাবলী, বর্ণদেশনা ও দ্বিরূপকোষ' প্রভৃতি কোষ ও ব্যকরণ গ্রন্থ সাহিত্য চর্চায় পথ নিদের্শক।

কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে রয়েছে। গীতগোবিন্দের 'কোমল কাণ্ড পদাবলী' কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের নহে সাহিত্য রস পিপাসুদের চিত্তে চিরদিনের আনন্দ দান করবে। গ্রন্থটি সংস্কৃত থেকে অপভ্রংশ বাংলা ও মৈথেলী ভাষায় রচিত। বাংলার পাল ও সেন রাজারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি সাহিত্যিকদের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের মহিমা ও বৈদিক আচরণের বিধিই প্রাধান্য পেয়েছে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ব্রাহ্মীলিপিকেই সংস্কৃত ভাষার পূর্বসূরী বলে অভিহিত করা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা থেকে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ হয়ে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার পরিণত হয়েছে বলে লিপি ও ভাষাবিদগণ মনে করেন। সে প্রেক্ষিতে কবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য না থাকলেও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে সংগৃহিত বৌদ্ধ চর্যাপদ বা বৌদ্ধচর্যা গীতির অবলম্বনে 'চর্যাপদ' বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম

গ্রন্থরূপে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মলগ্ন সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও অষ্টম থেকে দ্বাদশ এ পাঁচশ বছর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম যুগ হিসাবে চিহ্নিত। 'গীত গোবিন্দে'র ন্যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি জনপ্রিয় সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে বাংলা ভাষায় একটি মজবুত লৌকিক সাহিত্য সম্ভার গঠিত হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন। তবে এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নিদর্শন বা গ্রন্থদির ঘাটতি আছে।

৬ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতেও পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত বর্ণমালা দুটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। পশ্চিম ভারতে সিদ্ধ মাতৃকা বর্ণমালা ক্রমশ বিবর্তনের মাধ্যমে নাগরীতে পরিণত হয় এবং পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত বর্ণমালা অবশেষে বাংলা বর্ণমালায় রূপান্তরিত হয়।

বাংলার স্থানে স্থানে টোল বা সংস্কৃত চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্রে পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা অনস্বীকার্য। মহারাজা ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন বিহারে ১০০ জন পণ্ডিতের জন্য ১০০টি অনুরূপ শিক্ষামন্দির গড়ে উঠে। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ছয়টি মন্দির একত্রিত হয়ে বিক্রমশিলা বা বড়গাঁও বা পাথরঘাটা পাহাড়ের উপরে একটি সম্মিলিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। ইহাই পরবর্তীকালে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া জগদ্দল ও ওদন্তপুরীতেও অনুরূপ দুটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে।

বিক্রমশিলাকে অনেকেই নালন্দার ছোট সংস্করণ রূপে মেনে নিয়েছেন। তবে জগদ্দল ও ওদন্তপুরী দুটি প্রতিষ্ঠান নালন্দা বা বিক্রমশিলার মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন না হলেও এখানকার কয়েকজন আচার্যের পাণ্ডিত্য ও কর্মজীবনও ছিল গৌরবময়।

দক্ষিণ ভারতেও প্রায় একই সময়ে মন্দির ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠে। মূলতঃ বাংলা তথা উত্তর ভারতে বৌদ্ধ বিহার ব্যবস্থাব প্রতিযোগী সংগঠন হিসাবে বেদবিশ্বাসী দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজারা মন্দির ভিত্তিক শাস্ত্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ফলে হিন্দু মন্দিরগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেতে থাকে। কালক্রমে এরূপ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায়ও কোথায়ও বড় আকারে রূপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং বাংলা বা উত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানগুলোর ন্যায় ধর্মশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য বিষয়বস্তুও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা ঃ উত্তর ভারতে আর্যভট্টের পূর্বসূরী রূপে গণিত চর্চায় যিনি স্বকীয়তার দাবী করতে পারেন তিনি হলেন ব্রহ্মগুপ্ত। ব্রহ্মগুপ্ত সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

দক্ষিণ ভারতে ব্রহ্মগুপ্তের পূর্বসূরী রূপে খ্রীষ্টীয় নবম শতকে গণিত চর্চায় যিনি পারদর্শিতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন তিনি হলেন মহাবীর। "গণিত সার" সংগ্রহের (আনুমানিক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) রচয়িতা রূপে মহাবীরের নাম ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে ভাস্কর হয়ে আছে। এ'গ্রন্থে গুণোত্তর প্রগতি, দ্বিঘাত সমীকরণের তিন প্রকারের সমাধান, উপবৃত্ত, ভগ্নাংশ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় মহাবীর স্বকীয়তার দাবী রাখে।

নবম শতাব্দীর অপর একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ হলেন মুঞ্জাল। উনার কর্মক্ষেত্র

ছিল উজ্জয়িনী। আনুমানিক ৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জাল "লঘুমানস" নামে জ্যোতিষের একটি করণ গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতীয় জ্যোতিষে অয়ন চলন, অয়ন-চলনের বেগ ও ইহার তাৎপর্য সর্বপ্রথম আলোচনা করার জন্যই মুঞ্জালের নাম সমাধিক খ্যাত। কেননা মুঞ্জালের পূর্বে এ সম্পর্কে আর কেহ আলোচনা করেছিল বলে কোন প্রমাণ নাই। পরবর্তীকালে ভাস্করও অয়ন গতি বর্ণনায় মুঞ্জালকেই অনুসরণ করেছেন।

দশম শতাব্দীতে শ্রী পতি নামে জনৈক গণিতজ্ঞ গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে যথেষ্ট বুৎবত্তির পরিচয় রেখেছেন। তিনি সম্ভবতঃ ভাস্করের পূর্ববর্তী ছিলেন। তাঁদের রচিত 'জ্যোতিষ রত্নমালা' 'ধী কোটি' 'সিদ্ধান্তশেখর' গ্রন্থাদি জ্যোতিষ চর্চায় অন্যতম পাথেয়রূপে স্বীকৃত। তবে সিদ্ধান্তশেখর গ্রন্থটি আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। যদিও উহার টীকাকারদের রচনা থেকে এ'গ্রন্থটি সম্পর্কে অনেক তথ্য আজ প্রচলিত আছে।

সুবীকর দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে "ন্যায়-কন্দলীর" প্রণেতা গণিতজ্ঞ শ্রীধরের জন্মস্থান দক্ষিণ রাঁড়ের ভূরি সৃষ্টি বা ভূর সুট গ্রামে। ১০২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'গণিতসার' বা 'ত্রিশতিকা শ্রীধরের শ্রেষ্ঠ অবদান। গণিতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনশত শ্লোকে সংকলিত বলিয়া এ'গ্রন্থটি 'ত্রিশতিকা' নামে পরিচিত।

অধ্যাপক সার্টনের মতে শূন্যের (০) তাৎপর্য সম্পর্কে সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীধরের আলোচনা অবশ্যই স্বকীয়তার দাবী রাখে। উনার মতে এত সহজ ও প্রাঞ্জল আলোচনা এর আগে কোথায়ও পাওয়া যায় না।

$ax^2 + bx + c = 0$ এ'রূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

এবং ইহার বীজদ্বয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সহজ, সরল আলোচনার জন্য শ্রীধর আজও সমধিক পরিচিত। ১০৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'ভাস্বতী' গ্রন্থের প্রণেতা শতানন্দ গণিত শ্রীভাস্করাচার্যের পূর্বসূরী। টীকাকার যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে বরাহমিহিরের সূর্য্য সিদ্ধান্তের সংস্কার করে শতানন্দ "'ভাস্বতী" প্রণয়ন করেছেন।

প্রাচীন ভারতের শেষলগ্নে আগত গণিতজ্ঞ ভাস্করাচার্য ভোরের সূর্যের ন্যায় স্নিগ্ধ দীপ্তি ছড়িয়ে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রকে আজও অম্লান করে রেখেছেন। প্রাচীন ও মধ্য ভারতের যুগ সন্ধিক্ষণে প্রাচীন ভারতে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার ম্রিয়মানতাকে তিনি অস্বাভাবিক জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। তারই প্রমাণ মেলে অধ্যাপক সর্টেনের উক্তিতে। "দ্বাদশ শতাব্দীর এই হিন্দু গণিতজ্ঞ কেবল কুশলী ব্যাখ্যাকারই ছিলেন না। তিনি অনেক নতুন জিনিসের মৌলিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বীজগণিতে যেরূপ সুসম্বন্ধ জ্ঞানের পরিচয় দেন অন্য কোন গণিতজ্ঞের মধ্যে তাহা দৃষ্ট হয় না। দুঃখের বিষয়, ভাস্কর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন ইউরোপে তখন জ্ঞান বিজ্ঞানের নবজন্মের উষাকাল এবং ভারতবর্ষে প্রদোষ কাল, যদিচ অতি উজ্জ্বল প্রদোষ কাল, প্রায় আমাদের

কাল পর্যন্ত ভাস্কর তাঁহার জাতির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ।"

নাসিক থেকে ৭০ মাইল দূরে চালিস খাঁ নামক স্থানে ভাউদাজী আবিষ্কৃত তাম্রফলক থেকে জানা যায় আধুনিক বিজাপুরে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কানাড়া ব্রাহ্মণ ঘরে ১১১৪ সনে ভাস্করের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম চূড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়।

মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে প্রকাশিত 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' পুস্তকটি তৎকালীন সময়ের ভারতীয় গণিতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ'গ্রন্থ রচনার প্রায় ৩৩ বছর পর 'করণ কুতহল' নামে তিনি একটি করণ গ্রন্থও রচনা করেন। এছাড়া "সর্বতোভদ্র যন্ত্র" নামে কাল পরিমাণ বিষয়ক গ্রন্থটিও ভাস্করের অন্যতম কীর্তি।

"সিদ্ধান্ত শিরোমণি"— লীলাবতি, বীজগণিত, গ্রহগণিতধার ও গোলাধ্যায় এ চারটি খণ্ডে বিভক্ত। ভাস্করের পাটীগণিত "লীলাবতি" নামে জগৎখ্যাত। এ'নাম নিয়ে অনেক কিংবদন্তী থাকলেও সঠিক তথ্যের অভাবে বর্তমানে টীকাকাররা একে কাল্পনিক নামেই অভিহিত করেছেন।

"দুইটি ঋণাত্মক রাশির গুণফল একটি ধনাত্মক রাশি, একটি ধনাত্মক রাশি ও একটি ঋণাত্মক রাশির গুণফল একটি ঋণাত্মক রাশি।"

এ'সম্পর্কগুলো ভাস্কর অত্যন্ত যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠা করেন। অজ্ঞাত রাশি প্রকাশে দেবনাগরী বর্ণমালার ব্যবহারে তিনি প্রথম প্রস্তাবক।

বিভিন্ন প্রকার দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে চক্রকার পদ্ধতিরও তিনি উদ্ভাবক। তবে ভাস্করের পূর্বেও ব্রহ্মগুপ্ত ও শ্রীপতি দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধানে অনুরূপ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন।

"সমকোণী ত্রিভুজ ও সুষম বহুভুজের পারস্পরিক সম্পর্কের বিচারে তিনি π (পাই) এর মান ৩৯২৭/১২৫০= ৩.১৪১১৬৬ নির্ণয় করেন। এ'কাজে তিনি ৩৮৪ বাহু বিশিষ্ট একটি সুষম বহুভূজ ব্যবহার করেছিলেন। একইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত করে তিনি গোলকের তল ও ঘন নির্ণয় করেন।" তাঁর এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ ব্যবস্থাপনা বর্তমানের সমাস (Integral Calculas) গণিতের অনুরূপ। নিউটন ও লাইবনিৎজের প্রায় পাঁচশ বছর আগেই ভারতে সমাস গণিতের আভাস পাওয়া যায়। আবার গ্রহের তৎকালীন গতি নির্ণয়ে ব্যাস গণিতের (Differential Calculas) মূলতত্ত্ব প্রয়োগে ভাস্করই প্রথম কৃতিত্বের অধিকারী।

গ্রহের তৎকালীন গতি নির্ণয়ে অতি ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ এক সেকেণ্ডের প্রায় চৌত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করতে সমর্থন হয়েছিলেন। ইহাকে তিনি ত্রুটি নামে অভিহিত করেন। ভাস্করের ব্যবহৃত পদ্ধতি যে ব্যাস গণিতের পূর্বাভাস এ সম্পর্কে বাপুদের শাস্ত্রীয় উক্তিকে স্পটিসউড কর্তৃক অতিরঞ্জনের অভিযোগের উত্তরে ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। 'ইউরোপীয় গণিতজ্ঞগণও ব্যাস-গণনার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দ্বারা যে স্থূলমান নির্ণয় সম্ভবপর সে বিষয়ে অভহিত ছিলেন না। ইহা তাহারা বুঝতে পরেন অনেক পরে।"

ত্রিকোণমিতিতে প্রাচীন সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের মতে প্রাপ্ত সাইন ও কোসাইনের সূক্ষ্মমানের চেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মান নির্ণয়ে ভাস্কর গাণিতিক প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন।

"সাইন ১°= ১৩/৫৭৩

কোসাইন ১°= ৬৫৬৫/৬৫৬১" এ রূপ মান নির্ণয় সম্ভব।

ভাস্কর বৃত্তের ব্যাস, পরিধি, জ্যা ও চাপ-এর মধ্যে একটি গাণিতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছিলেন। সম্পর্কটি নিম্নরূপ —

$$" C = \frac{4da\,(p - a)}{\frac{5}{4}\,p^2 - a\,(p - a)}$$

এখানে d = ব্যাস। p = পরিধি। a = চাপ । c = জ্যা।"

অয়ন-চলন ঃ অয়ন চলন সম্পর্কীয় প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞান সূর্যসিদ্ধান্তের তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ থেকে ১২ নং শ্লোক উল্লেখ্য।

"ত্রিংশৎ কৃত্যো যুগে ভানাং চক্রং প্রাক্ পরিলম্বতে।
তদ্‌গুনাদ্‌ভূদিনৈর্ভক্তাৎ দ্যুগণাৎযদবাপ্যতে।। ৯।।
তদ্দোস্ত্রিঘ্না দশাপ্তাংশা বিজ্ঞেয়া অয়নাভিধাঃ।
তৎসংস্কৃতাদগ্রহাৎ ক্রান্তিচ্ছায়া চরদলাদিকম্।
স্ফুটং দৃক্‌তুল্যতাং গচ্ছেদয়নে বিষুবদ্বয়ে।। ১০।।
প্রাক্ চক্রং চলতিং হীনে ছায়ার্কাৎ করণাগতে।
অন্তরাংশৈ রথাবৃত্য পশ্চাচ্ছেষৈস্তথাধিকে।। ১১।।
এবং বিষুবতিচ্ছায়া স্বদেশে যা দিনাদ্ধজা।
দক্ষিণোত্তররেখায়াং সা তত্র বিষুবৎপ্রভা।। ১২।।"

এ'শ্লোকগুলোর বিশ্লেষণে আমরা সংক্ষেপে যা জানতে পারি তা হল "মহাবিষুব একটি স্থির বিন্দুর (ইহা মীন নক্ষত্রের নিকট) পূর্বপশ্চিম দিকে দোলকের ন্যায় দুলিয়া থাকে। উভয়দিকে এ দোলনের সীমা ২৭ ডিগ্রী এবং দোলন সম্পূর্ণ করিতে এক মহাযুগের (৪৩,২০,০০০ বৎসর) ৬০০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৭২০০ বৎসর সময় লাগে। এ হিসাবে বৎসরে অয়নাংশের মাত্রা দাঁড়ায় ৫৪ "সেকেণ্ড"। আধুনিক জ্যোতিষ মতে এর মান ৫০ '২৫ সেকেণ্ড।

অয়নাংশ নিয়ে প্রাচীন ভারতে জ্যোতিষী চর্চার যথেষ্ট আলোচনা আছে। অয়ন চলন সম্পর্কে ৯২৮ সালে স্বামী পৃথ্‌দকের আলোচনাও বলিষ্ঠ। এছাড়া দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রধানত মুঞ্জালকে অনুসরণ করে ভাস্কর অয়ন চলন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মুসলমান জ্যোতির্বিদ্‌গণও অয়নের এরূপ দোলনগতিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং নবম শতাব্দীতে থাবিত ইবন্ কুরা কর্তৃক অয়নের এরূপ দোলন গতি সম্পর্কীয় আলোচনা তৎকালীন সময়ে মুসলমান বিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেছেন।

চিকিৎসা ও রসায়ন বিদ্যা ঃ পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে নাবনীতক, ১ম ও ২য় নাগার্জুনের ন্যায় চিকিৎসা ও রসায়নবিদদের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কীয় আলোচনায় আমরা আত্রেয়, সুশ্রুত, চরক ও জীবকের উদ্ভাবনাগুলোকে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের পূর্বসূরী রূপে চিহ্নিত করেছি। তাদের সাথে এখানে ৩য় নাগার্জুনের উদ্ভাবনী নিয়ে আলোচনা করা হবে। 'লৌহশাস্ত্র', 'কক্ষপুট তন্ত্র', 'রসরত্নকর', 'আরোগ্য মঞ্জুরী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা গুর্জরের রসায়নবিদ্ নাগার্জুনই হলেন তৃতীয় নাগার্জুন। অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে লৌহ ধাতুবিদ্যা, পারদঘটিত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার দ্বারা নাগার্জুন প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছেন। নাগার্জুন সম্পর্কে আল্‌বেরুনীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। উনি লিখেছেন " এই বিদ্যার একজন বিখ্যাত প্রতিভূ হইলেন সোমনাথের নিকটবর্তী দাইহকের অধিবাসী নাগার্জুন। তিনি এই বিদ্যার পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং ইহার সকল দিক আলোচনা করিয়া যে মৌলিক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন তাহা এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। আমাদের প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন।" তবে ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল প্রমুখ ব্যক্তিদের মতে উল্লিখিত তিন নাগার্জুন একই ব্যক্তি। তাই সুশ্রুতের নাগার্জুন, লোহাশাস্ত্রের নাগার্জুন এবং মাধ্যমিক সূত্রবৃত্তের নাগার্জুন তিন ব্যক্তি বা একই — এ' সম্পর্কে যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্রে বৃদ্ধ ত্রয়ী বলতে আত্রেয় সুশ্রুত বাগ্‌ভট্ট বা চরক -সুশ্রুত-বাগ্‌ভট্টকে বুঝায়ে থাকে। অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্রের দিকপাল হিসাবে আত্রেয় সুশ্রুত, চরকের পরেই যার নামটি সর্বাগ্রে চলে আসে তিনি হলেন বাগ্‌ভট্ট। ডঃ হোয়র্ণলে এবং ডঃ সার্টন উভয়ে প্রথম বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্টকে ইৎসিং-এর রচনা সাপেক্ষে ৭ম শতাব্দীর লোক বলে চিহ্নিত করেছেন। উনি আয়ুর্বেদের আটটি শাখাকে একত্র করে "অষ্টাঙ্গ-সংগ্রহ" শীর্ষক একটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে দ্বিতীয় বাগ্‌ভট্ট 'হৃদয় সংহিতা' নামক আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলতঃ ইহা অষ্টাঙ্গ সংগ্রহের অবলম্বনে শ্লোকাকারে রচিত।

তবে গ্রন্থ দুটিতেই সুশ্রুত ও চরক বর্ণিত উন্নত শারীরবিদ্যা তুলনায় নিম্নমানের। তবে সমাজে শল্য চিকিৎসার ঘাটতির জন্যই গ্রন্থ দুটিতে শারীরবিদ্যা ও শল্য চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষীণ আলোচনা হয়েছে। এ'সম্পর্কে কোন ভিন্নমত থাকতে পারে না।

ইন্দুকরের পুত্র মাধবকর চিকিৎসা শাস্ত্রে উনার অর্জিত অভিজ্ঞতা নিয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন তার নাম মাধব নিদান বা নিদান। উনার সময়েই বৃন্দ নামে এক চিকিৎসক ও রসাযনবিদের পরিচয় পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম "সিদ্ধযোগ"। অনেকের মতে মাধব কর বা বৃন্দ একই ব্যক্তি। উনি খ্রীষ্টীয় অষ্টম বা নবম শতাব্দীর লোক।

গৌড়েশ্বর নরপালের রন্ধনশালার প্রধান নারায়ণের পুত্র চক্রপানিদত্ত একাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় বৈদ্য ও রসায়নবিদ। তিনি "চিকিৎসা সার সংগ্রহে"র প্রণেতা। গৌড়েশ্বর নরপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গদেশে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছিল। "সিদ্ধযোগের" অবলম্বনে লেখা "চিকিৎসা সার সংগ্রহ" শীর্ষক গ্রন্থটি চক্রপানিদত্তের অন্যতম কীর্তি। এছাড়া চক্রপানিদত্ত রচিত 'ভানুমতী' চক্রতত্ত্বদীপিকা' ও 'মুক্তাবলী' শীর্ষক গ্রন্থগুলোও চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যতম দলিল। চক্রপানিদত্ত একজন অন্যতম রসায়নবিদও। পারদ গন্ধক ঘটিত লবণ (মারকারি সালফাইড) কজ্জলী সম্ভবতঃ

তিনিই আবিষ্কার করেন। তবে এ'আবিষ্কার সম্পর্কে বৃন্দের নামও উল্লেখ্য। প্রাচীন ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সুচিকিৎসক তৃতীয় নাগার্জুন, বাগ্‌ভট্ট, বৃন্দ ও চক্রপানিদত্ত মহোদয়গণ রসায়ন শাস্ত্রেও যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় রেখেছেন।

ধাতুবিদ্যার পারদঘটিত যৌগিক সম্পর্কীয় জ্ঞান ও নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণার দ্বারা নাগার্জুন প্রাচীন ভারতীয় রসায়নকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাগ্‌ভট্ট রসায়ন শাস্ত্রেও সুশ্রুত ও চরককেই অনুসরণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর কোন মৌলিক অবদানের পরিচয় পাওয়া যায় না। বাগ্‌ভট্ট তাঁর রচনায় এক জায়গায় লিখেছেন "সম পরিমাণ পারদ ও সীসকের সহিত সমান ওজনের রসাঞ্জন ও কর্পূর মিশাইয়া কজ্জল তৈয়ারী করা হয়" — কেবল এ উক্তি দ্বারা পারদ ও পারদ ঘটিত যৌগিক সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। তবে ঔষধ প্রস্তুতিতে 'অন্ধমুষা' নামক ঢাকনি দেওয়া একপ্রকার মুষার উল্লেখে তাঁর ব্যবহারিক ভেষজবিদ্যা সম্পর্কীয় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই একথা বলা অত্যুক্তি হবে না বাগ্‌ভট্টের সময় থেকেই ঔষধ হিসাবে খনিজ ধাতব দ্রব্যাদি ব্যবহার ক্রমশঃ প্রাধান্য পেতে থাকে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে 'সিদ্ধযোগ' বৃন্দের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহাতে পর্বটি তাম্র, রসামৃত চূর্ণ প্রভৃতি পারদঘটিত যৌগের প্রস্তুত প্রণালী এবং লবণ, তুঁতিয়া ও মারিত তাম্র সম্বলিত ১৪টি উপাদান যোগে একটি কজ্জল নির্মাণ কৌশলও বর্ণিত আছে।

চক্রপানিদত্ত একজন রসায়নবিদ ছিলেন। উনিও চিকিৎসা শাস্ত্রে ধাতব উপকরণ ব্যবহার করেছেন। ঔষধ প্রস্তুতির স্বার্থে তিনি তাম্র, লৌহ, রৌপ্য প্রভৃতি নানাবিধ ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে যৌগ প্রস্তুত প্রণালী উদ্ভাবন করেছেন। চক্রপানিদত্তের প্রস্তুত কজ্জলীটি যদিও বৃন্দের রসামৃত চূর্ণের ন্যায় তথাপি এ'যৌগ প্রস্তুতিতে তিনি পারদ শোধনের এক স্বতন্ত্র প্রণালী ব্যবহার করেছেন। এছাড়া রৌপ্য গন্ধকের যৌগ প্রস্তুতিও চক্রপানিদত্তের স্বকীয় উদ্ভাবনা।

সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বাগ্‌ভট্ট, বৃন্দ, চক্রপানিদত্ত মহোদয়গণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ভারতীয় ভেষজ বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্রও ভেষজকে কেন্দ্র করে ধাতব যৌগের ব্যবহারের মাধ্যমে যখন ভারতীয় "রসায়ন শাস্ত্রের" যাত্রা বিজ্ঞান সম্মতভাবে এগিয়ে চলছিল, ঠিক সে সময়ে বিশেষ এক ধর্ম সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকরা ভারতীয় রসায়ন গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ'তন্ত্রসাধকদের সৃষ্ট রসায়নবিদ্যা পরিশেষে "ভারতীয় কিমিয়া" নামে প্রকাশ পায়। তার সম্পর্কে পরবর্তী পর্যায়ে বিশদ আলোচনার অঙ্গীকার রেখে আমার এ'পর্যায়ে সাক্ষ্যের আপাতত সমাপ্তি ঘোষণা করছি।

স্থাপত্য শিল্প ঃ

পূর্ব ভারত

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অভাবে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কীয় তথ্যাদি আপনাদের বহু ঐতিহাসিকদের অজানা রয়ে গেছে। তবে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাংয়ের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলো থেকে আপনারা বাংলার স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে অনেক